শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

বর্তমান সমাজতন্ত্র ও সদ্যস্বাধীন দেশসমূহ

সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে ফরাসী কমিউনিস্টরা

পর্তুগালে এপ্রিল বিপ্লবের পঞ্চম বার্ষিকী

ভিয়েৎনাম : মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সার্বজনীন সত্য ও বিপ্লবের প্রয়োগ-কর্মের সমন্বয়

চীনের আধিপত্যবাদ ও বৃহৎ শক্তিসুলভ নীতি

বিজ্ঞানিকের দায়িত্ব ও আজকের বিশ্বগ্রাসী সমস্যাবলী

বর্ষ এপ্রিল ১৯৭৯ ৪র্থ সংখ্যা

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

৭ম বর্ষ : এপ্রিল, ১৯৭৯ : ৪র্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গঠন এবং বিশ্বের অগ্রগতি : আন্তর্জাতিক তত্ত্বগত সম্মেলন

মেয়ার ভেলনার : আন্তর্জাতিকতাবাদ : সর্বোচ্চ নীতি ৩

Meir Vilner : Internationalism : The Supreme Principle ; W. M. R

পল কুর্তেউ : সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে ফরাসী কমিউনিস্টরা ৮

Paul Courtieu : The French Communists in the Struggle for Socialism ; W. M. R

য়নেল সটো প্রীয়েটো : ঐক্যের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ১২

onel Soto Prieto : Objective Need for Unity ; W.M.R

রায়ণ কে. কৃষ্ণান : বর্তমান সমাজতন্ত্র ও সদ্যস্বাধীন দেশসমূহ ১৮

rayana K. Krishnan : Existing Socialism and the Newly Free Countries ; W. M. R

সফা আরেগাহেগ্নে : ইথিওপিয়ার বিপ্লবের অবিচল অগ্রগতি ২১

fa Aregahegne : The Ethiopian Revolution's Steady Advance ; W. M. R

: সম্মেলনের সমাপ্তি ২৪

: Conclusion of the Seminar ; W.M.R

পার্টির অভিজ্ঞতা

রো কুনহাল : এপ্রিল বিপ্লবের পঞ্চম বার্ষিকী ৩০

o Cunhal : Fifth Anniversary of the April Revolution ; W. M. R

মতামত

দিন কিয়ানৌরি : গণ-বিপ্লবে নতুন জোয়ার ৪৭

rreddin Kianouri : Start of a New Stage of the People's Revolution ; W. M. R

জন পিটম্যান : আধিপত্যবাদ এবং বৃহৎশক্তিসুলভ নীতি ৫৬
John Pittman : Hegemonism and Great Power Policy ; W. M. R

জোস লাভা,
ভসিভোলদ রিবাকভ : ভিয়েতনাম : মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সার্বজনীন সত্য ও বিপ্লবের প্রয়োগ-কর্মের সমন্বয় ৭০
Jose Lava
Vsevolod Rybakov : Vietnam : Harmonising the Universal Truths of Marxism-Leninism and the Practice of Revolutiou ; W. M. R

বিজ্ঞান সংস্কৃতি ভাবাদর্শ

ব্লাদিমির এঙ্গেলগার্ত : বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব এবং আজকের বিশ্বগ্রাসী সমস্যাবলী ৮৫
Vladimir Engelgardh : The Scientists' Responsibility and Global Problems of our day ; W.M.
: ডায়েরী
: Diary ; W. M. R

P 36245

সম্পাদক : জ্যোতি দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

সম্পাদকীয় দপ্তর
৪/৩এ, ওরিয়েন্ট রো
কলকাতা-১৭
৪৪-৮৭৬৬

মূল্য : ১·০০ [এক টাকা]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস ৩০/৬, বাউতলা রোড কলিকাতা-১৭, অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত।

"সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গঠন এবং বিশ্বের অগ্রগতি"

আন্তর্জাতিক তত্ত্বগত সম্মেলন*—১

আন্তর্জাতিকতাবাদ ঃ সর্বোচ্চ নীতি

মেয়ার ভেলনার

ইসরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির

সাধারণ সম্পাদক

আজ আমরা যখন সমাজতন্ত্রের শক্তির কথা বলি, তখন সবার আগে আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আদর্শগত ও সামরিক শক্তির কথা মনে পড়ে। আমরা যখন বলি সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তি, জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দুর্গ, তখন এই কথাগুলো নিছক অর্থহীন শব্দ থাকে না। এটা হচ্ছে বাস্তব অবস্থার এক বৈজ্ঞানিক সূত্রায়ন, যা বাদ দিয়ে আজ বিশ্বের শক্তিসমূহের ভারসাম্য বা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ধারা অনুধাবন করা যায় না। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা অপ্রতিহত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সি পি এস ইউ-এর লেনিনবাদী নীতি, বিশ্ব শান্তির জন্য তাদের গভীর উদ্বেগ বোধ ও জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির জন্য সংগ্রামরত সমস্ত জাতিকে তাদের মহান আন্তর্জাতিকতাবাদী সাহায্যকে ধন্যবাদ জানাই।

সাম্রাজ্যবাদীরা খুবই সচেতন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং তারা সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে। এ কারণেই, এটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয় যে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ প্রধানত সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে পরিচালিত।

বিশ্ব-রণনীতি কার্যকর করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ চীনা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মৈত্রী করতে প্রস্তুত এবং তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কমিউনিস্ট ও

---

* ফেব্রুয়ারি '৭৯, সংখ্যায় শুরু হয়ে বর্তমান সংখ্যায় শেষ হলো।

ওয়ার্কার্স পার্টিগুলো, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক শক্তি ও শান্তির শক্তিগুলোর আস্থা খর্ব করতে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

অধিকন্তু, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সুদৃঢ় করতে ও বিপজ্জনক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে যখন সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও সুপ্রতিবেশী-সুলভ সম্পর্কের পরিবেশ সৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন, তখন কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেই একদল লোক সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে অবিশ্বাসের বীজ বপন করছে।

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণে আমাদের শ্রেণীশত্রু যে-কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারে। বিশ্ব শক্তিসমূহের ভারসাম্য সমাজতন্ত্রের অনুকূলে পরিবর্তিত হওয়ায়, সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মানব অধিকার ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে সমাজতন্ত্রবিরোধী প্রচার জোরদার করছে। এই সমস্ত প্রচার ভণ্ডামী ও বক্তৃতাবাজীতে পূর্ণ। এর লক্ষ্য আমরাও অর্থাৎ ইসরায়েলী কমিউনিস্টরাও। আমাদের শ্রেণী ও মতাদর্শগত বিরোধীরা বলেন, "দেখুন, কমিউনিস্টরাও স্বীকার করছেন আপনাদের সমাজতন্ত্র মানব অধিকার লঙ্ঘন করছে।" আর সিদ্ধান্ত বোধ হয়: পুঁজিবাদ দীর্ঘজীবী হোক। এর চেয়ে আর সত্যের বিকৃতি কি হতে পারে। দুঃখের কথা, সমাজতন্ত্রের শত্রুদের এই আবিষ্কার বিশ্বাস করে এই লোকগুলো তরুণদের, শ্রমিকদের এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মন বিষিয়ে তুলতে সাহায্য করছে। এভাবে তারা নৈরাশ্যের বীজ বপন করছে এবং উন্নততর ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাকে ভেঙে দিচ্ছে। ইতিহাস এই শিক্ষা দেয় যে, যে যেমন কাজ করে তাকে তেমন ফল ভোগ করতে হয়। আমরা বিশ্বাস করি কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে কমরেডসুলভ আস্থা ও পারস্পরিক মর্যাদার সম্পর্ক কমিউনিস্ট আচরণের একটি প্রাথমিক রীতি।

আমাদের দেশ ১৯৬৭ সাল থেকে প্যালেস্টিনীয় ও অন্যান্য আরব ভূখণ্ডের ওপর ঔপনিবেশিক জবরদখল বজায় রেখেছে। জবরদখলকারী কর্তারা নিষ্ঠুর অত্যাচারের নীতি অনুসরণ করছে, স্কুলের শিশু ও ছাত্রদের বিক্ষোভের বিরুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনীকে ব্যবহার করছে এবং আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা বিচার ছাড়াই মানুষকে জেলে পুরছে। ইসরায়েলেই জাতিবৈষম্যের নীতি অনুসৃত হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে এত কিছু থাকা সত্ত্বেও, চক্ষুলজ্জার বালাই না রেখেই উগ্র ইহুদীবাদী শাসকচক্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য স্থানে মানব অধিকার লঙ্ঘন ও জাতিবৈষম্য নিয়ে প্রচারাভিযান সংগঠিত—

করে। আমাদের দেশে সোভিয়েত বিরোধিতা সবচেয়ে বিষাক্ত বিষ; এমনকি আরববিরোধী উগ্র জাতীয়তা ও জঙ্গীবাদের চাইতেও ভয়ঙ্কর। সমাজতন্ত্র ও শান্তির বিরুদ্ধে এটাই প্রতিক্রিয়ার প্রধান অস্ত্র এবং সোভিয়েত-বিরোধী কুৎসায় প্রভাবিত কমিউনিস্টদেরও তারা ব্যবহার করে।

অতি কঠিন অবস্থায় আমাদের দীর্ঘ সংগ্রাম প্রমাণ করেছে যে নীতিনিষ্ঠ দৃঢ়তা নিয়ে ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব রক্ষা করে আমরা পার্টির আন্তর্জাতিকতাবাদকে হেয় করার জন্য শত্রু ও দলত্যাগীদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে পেরেছি। এ ভাবে আমরা আমাদের পার্টিকে আদর্শগত ও রাজনৈতিকভাবে ইস্পাত-দৃঢ় করেছি, আমাদের সভ্য সংখ্যা বাড়াতে পেরেছি এবং নেসেৎ (পার্লামেন্ট), ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (হিসতাদ্রুৎ) ও পৌর নির্বাচনে অন্যান্য রাজনৈতিক মহলের সঙ্গে আমরা গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ি। আমাদের আদর্শগত বিরোধীদের মধ্য থেকে বাস্তববাদী মানুষদের সঙ্গেও, বিশেষ করে শান্তি সম্পর্কে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি করার দিকে ইসরায়েলের সরকারি নীতি বদলের প্রশ্নে, আমরা সহযোগিতা গড়ে তুলছি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির ভিত্তিতে আমাদের পার্টি ও আরব দেশগুলোর কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মধ্যে খাঁটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের নীতিনিষ্ঠ ও অবিচল নীতির ফলে আমাদের পার্টি ও প্যালেস্টিনীয় আরব জাতির প্রগতিশীল, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের জাতিসমূহের শান্তি ও স্বাধীনতার স্বার্থ এতে সিদ্ধ হচ্ছে।

একটি জাতির ভাগ্য কেবল শ্রেণী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা ও ফলাফলের দ্বারা নিরূপিত হয় না। আন্তর্জাতিক অবস্থাও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে আন্তর্জাতিক অবস্থা প্রায়শই সংগ্রামের ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে; সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা না থাকলে সংগ্রাম সাফল্য লাভ করতে পারে। বাস্তবিকই, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো, বিশেষ করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিমত্তা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া কিউবা, ভিয়েতনাম, অ্যাঙ্গোলা, ইথিওপিয়া, আফগানিস্তান, দক্ষিণ ইয়েমেন ও অন্যান্য দেশের বিজয় কি সম্ভব হত? লেনিনীয়,

ভাবনা অনুযায়ী প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের আলোকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সক্রিয় থাকতে প্রস্তুত। লেনিন লিখেছেন, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের শর্ত হচ্ছে "একটি দেশ যে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করছে, আন্তর্জাতিক পুঁজিকে উৎখাত করার জন্য তাকে সর্বাধিক জাতীয় আত্মত্যাগ করতে সমর্থ ও আগ্রহী হওয়া উচিত" (কালেক্টেড ওয়ার্কাস, খণ্ড ৩১, পৃঃ ১৪৮)।

এটা অবশ্য বিপ্লব রপ্তানির আহ্বান নয়। একটি দেশের শ্রমজীবী জনগণই, বিপ্লব করে, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। এসব সত্ত্বেও, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের নীতি ও আন্তর্জাতিকতাবাদী সহযোগিতা সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ; এর ফলে জাতিসমূহের পক্ষে সংগ্রামকে বিজয়ী লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

তাই আমরা তথাকথিত ইউরোকমিউনিজমকে গ্রহণ করতে পারি না। কমিউনিজম সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শ ও বিশ্ববীক্ষা। ইউরোপীয় ও এশীয়, আফ্রিকেয়, আমেরিকান বা অস্ট্রেলীয় কমিউনিজম বলে কিছু নেই। ইউরোপীয় কমিউনিজম পরিভাষাটি মূলত শ্রেণীবর্জিত, মার্কসবাদবিরোধী উক্তি। এর মধ্য দিয়ে এক ধরনের ঔদ্ধত্যের প্রকাশ পায়, বিভিন্ন মহাদেশের শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনীর মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করার আগ্রহ এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতে যখন সমাজতন্ত্রের ধারণা সবেমাত্র ইউরোপে জন্ম নিয়েছে, তখনও কি মার্কস, কি এঙ্গেলস কেউই কোনো 'ইউরোপীয় সমাজতন্ত্র' বা 'ইউরোপীয় কমিউনিজমের' কথা বলেন নি। বরং, তাঁদের শ্লোগান ছিল "দুনিয়ার মজদুর এক হও"। তাঁরা বিশ্বাস করতেন এটাই সমাজতন্ত্রের অন্তরাত্মা।

প্রত্যেক দেশের প্রকৃত অবস্থা পুরোপুরি অবহেলা করে ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর ওপর একটি সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ ধরনের ধাঁচ চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা হচ্ছে 'ইউরোপীয় কমিউনিজম'।

বিশ্বের এই অঞ্চলের সবকটি কমিউনিস্ট পার্টি সর্বসম্মতভাবে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির বিরোধী। এই চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তিকে ঠেকিয়ে দেবে। বাগদাদ শীর্ষ সম্মেলনে মিশর ছাড়া সমস্ত আরব রাষ্ট্রের এটাই ছিল অবস্থান। ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলো সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি জারি করেছে। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির ফলে এই

বিস্ফোরক অঞ্চলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ও বাস্তব শান্তির পরিকল্পনার পরামর্শ দিয়েছে। দুঃখের বিষয়, ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত একটি দেশ এতে সই দেয় নি। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব রণ-নীতিকে সমাজতন্ত্রকেই একটি সুসংহত বিশ্বব্যাপী পলিসির দ্বারা মোকাবিলা করতে হবে, বিশেষ করে যখন বিশ্ব বিপর্যয়ের আশঙ্কা আছে। অভিজ্ঞতায় আরো দেখা যায়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো, কমিউনিস্ট পার্টিগুলো ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলোর সংহতিতে ফাটল ধরলে শান্তি ও প্রগতির অভিন্ন সংগ্রাম ও অতঃপর প্রত্যেক জাতির স্বার্থসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যাই হোক, আমরা আন্তর্জাতিক প্রশ্নগুলোর কথা বলছি, কোনো দেশ বা পার্টির অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীর কথা বলছি না। নিঃসন্দেহে প্রতিটি পার্টি সঠিক কারণেই তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপকে প্রতিহত করে। কিন্তু তার মানে তার নিজেরও অন্যান্য পার্টির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। আন্তর্জাতিক বিষয়ের গতিপ্রবাহ বিশ্বের সমগ্র অঞ্চলের, মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে। তাই এক্ষেত্রে সমন্বয় ও সংহতি থাকতেই হবে। এই সমস্ত প্রশ্নে এমন কোনো পরিস্থিতি থাকা উচিত নয় যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের মত করে সব ঠিক করে নেবে। সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাখ্যা অনুসারে এটাকে আমরা অধিকতর স্বাধীনতার চিহ্ন বলে মনে করি না। প্রত্যেক সময় সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের মধ্যে অসংহতির চিহ্ন দেখলেই সাম্রাজ্যবাদীরা আনন্দিত হয়। আমরা একে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংহতিকে খাটো করে দেখা মনে করি। শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে এটাই সর্বোচ্চ নীতি।

এই কারণেই স্বাধীন দল হিসেবেই আমরা সমাজতন্ত্র ও শান্তির শত্রুদের আদর্শগত বা রাজনৈতিক চাপ বাতিল করে দেই। কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলো এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির আন্তর্জাতিক সংহতি কমিউনিস্ট পার্টি বা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অংশের স্বাধীনতার বিরোধী নয়। বরং, এ প্রত্যেক পার্টিকে স্বাধীনতা বজায় রাখতে ও শ্রেণী-শত্রুদের আদর্শগত ও রাজনৈতিক আক্রমণ প্রতিহত করতে সাহায্য করে এবং এভাবে আমাদের আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা কাঙ্খিত আদর্শগুলো অর্জনে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে।

সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে ফরাসী কমিউনিস্টরা

পল কুর্তেউ
ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ডাব্লু-এম-আরের
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির নীতির সর্বোপরি ভিত্তি হচ্ছে আজকের দুনিয়ার বর্তমান বাস্তবতাসমূহ, আমাদের যুগের অবস্থার বিশ্লেষণ। বিশ্বের শক্তিসমূহের ভারসাম্য (সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অস্তিত্ব ও শক্তিবৃদ্ধি, পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন—এই তিনটি অঙ্গ বিশিষ্ট বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার কারণে) বদল হয়েছে সামাজিক মুক্তি, জাতীয় স্বাধীনতা ও শান্তির জন্য সংগ্রামরত জাতিসমূহের পক্ষে। সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট অসুবিধাগুলোর ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জটিল থাকা সত্ত্বেও আমাদের যুগ দৈতাত ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অগ্রগতির দ্বারা বিশিষ্টতা লাভ করেছে। স্বাভাবিক কারণেই সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির পথে ও প্রতিটি দেশের সমাজতন্ত্রের রূপের ওপর এর প্রভাব রয়েছে।

ফরাসী কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করেন সমাজতন্ত্র প্রতিটি দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের ফল। আমাদের পার্টির গৃহীত নীতি সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের দেশ ও জনগণের অবস্থা, শর্ত ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

এই সঙ্গে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র কোন্ রূপ লাভ করবে তা নির্ণয়-কালে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতন্ত্র গড়ার আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রাখে। মোটের ওপর, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বিকাশের ঝোঁক ইতিবাচক। নিরস্ত্রীকরণ, শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা তাদের অবদানের প্রশংসা করি। কোনো সৎ লোকই তাদের তর্কাতীত সাফল্যগুলোকে অস্বীকার করবেন না এবং এ সমাজতন্ত্রের জন্যই সম্ভব হয়েছে। অবশ্য, সি পি এস ইউ-এর ২০তম কংগ্রেসের পর আমরা জেনেছি সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ড ভ্রান্তিমুক্ত নয়, গুরুতর পরিণামবাহী নাটকীয় ঘটনামুক্ত নয়।

আমরা বিশ্বাস করি ফরাসী দেশে সমাজতন্ত্রের পথ গণতান্ত্রিক হবে।

সংকট ত্রাণের ইতিবাচক পথ বের করা অর্থাৎ বৃহৎ পুঁজির আধিপত্যের অবসান ঘটানো, জনগণকে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি পরিচালনার সুযোগ দেওয়া, দেশের সরকারে শ্রমজীবী মানুষের বক্তব্যকে স্থান দেওয়ার বাস্তব অর্থ সমাজের গণতন্ত্রীকরণ।

আমাদের তত্ত্বে ও কর্মে আমরা এই ধারণা পুরোপুরি বর্জন করেছি যে হঠাৎ মৌলিক পরিবর্তন গোটা সমাজকে উল্টেপাল্টে দিতে পারে। সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমরা সুনির্দিষ্ট স্বাধীন গণতান্ত্রিক পথের সুপারিশ করেছি। এই পথই হচ্ছে **মৌলিক সংস্কারের, গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রে বিকশিত করার পথ।** প্রতিটি ক্ষেত্রে—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সংগ্রামের বিভিন্ন রূপ প্রয়োগ করে কী ভাবে এটা এগিয়ে নেওয়া যায় সেটাই প্রশ্ন। এই পথে কিছু করা মানে অধিকতর মৌলিক পরিবর্তনের দিকে এক ধাপ অগ্রগতি। এভাবে, ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপে, আমাদের জনগণের গতিশীলতার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা প্রয়োজনীয় সংস্কার লাভ করব এবং গণতান্ত্রিক পরিবর্তন অর্জন করব। আমাদের মতে, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিজয়ের পর গণতন্ত্রের বিকাশ রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়, সমাজতন্ত্রের পরিবেশে তা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

আমরা বিশ্বাস করি, ফরাসী দেশে আমরা যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রত্যক্ষ করতে চাই তা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ওপর নির্মিত স্বশাসিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ হতে হবে। আমরা ২২তম কংগ্রেসে জোর দিয়ে বলেছি: "সমাজতন্ত্রের অর্থ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নিরবচ্ছিন্ন গণতন্ত্রীকরণ; এর অর্থ 'শেষ অবধি' গণতন্ত্র।"*

শ্রমজীবী মানুষের কাছে এর অর্থ সর্বোপরি শোষণের অবসান, তাদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলোর সম্পূর্ণ পরিপূরণ এবং তাদের অধিকার ও স্বাধীনতাগুলো: কাজের অধিকার, সংস্কৃতির ওপর দখল, অবসর-যাপন ও বিশ্রামের অধিকার ইত্যাদির যথেষ্ট প্রসার, স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্রমবর্ধমান সুযোগ-সুবিধা।

আমরা বিশ্বাস করি আমাদের দেশে আমাদের জনগণের ইতিমধ্যে অর্জিত সমস্ত স্বাধীনতা, সে চিন্তার স্বাধীনতা হোক, সভা-সমাবেশের বা

---

* ২২ কংগ্রেস দু পারতি কমিউনিস্তে ফ্রাঙ্কইস, **কাহিয়ার্স দু কমিউনিজমে**, ফেবরিয়ার-মারস, ১৯৭৬, পৃঃ ৩৭৭

সমিতি গড়ার স্বাধীনতা হোক, দেশ-বিদেশে চলাফেরার স্বাধীনতা, ধর্মের বা ধর্মঘটের স্বাধীনতা হোক, সমাজতন্ত্রে সুনিশ্চিত হওয়া উচিত, সেগুলো বিকশিত ও প্রসারিত হওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকার বদলের সম্ভাবনা সহ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ক্ষেত্রেও এ প্রযোজ্য ; সমস্ত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকবে ; ট্রেড ইউনিয়নসমূহ স্বাধীন ও অবাধ কার্যকলাপ করতে পারবে ; স্বাধীন বিচারব্যবস্থা থাকবে ; কোনো সরকারি দর্শনকে বর্জন করার অধিকার থাকবে ; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রমজীবী জনগণের অধিকার প্রসারিত হবে এবং এছাড়া অন্যান্য অধিকার।

আমরা ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রের রাস্তাকে এমন একটা প্রক্রিয়া হিসেবে দেখি যার প্রতিটি স্তরই গণতান্ত্রিক পরিবর্তন। সমাজতন্ত্রই জনগণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছার ফল। তাই, আমাদের নীতি রূপায়ণের সঙ্গে ব্যাপক মৈত্রী গড়ার কর্মধারা যুক্ত।

২২-তম কংগ্রেসে আমরা ঘোষণা করেছি, এ নীতিনিষ্ঠ পলিসি, আমাদের রাজনৈতিক রণনীতির এটাই মূল অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্তমানে আমরা বামপন্থী শক্তিগুলোর দৃঢ়তর ও অধিকতর স্থায়ী মৈত্রী-জোট পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাই কারণ এর ফলে আমরা ফ্রান্সকে সংকট থেকে বের করে আনতে ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে একটি নতুন নীতি পরিচালনা করতে সমর্থ হব।

আমাদের রণনীতিতে এই শর্ত নির্দিষ্ট রয়েছে যে অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সম অধিকার ও কর্তব্যের ভিত্তিতে কমিউনিস্টরা সরকারে অংশগ্রহণ করবে এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় সংস্কার রূপ দেওয়ার জন্য দেশ পরিচালনার ব্যাপারে তাদের বক্তব্য থাকবে। পরিবর্তনের এটাই নিয়ামক শর্ত।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ১৯৭৯ সালের মে মাসে আমাদের পার্টির যে ২৩তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তা আরো সার্থকভাবে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন ও পরিবর্তনের আন্দোলনের সাফল্য সূচিত করার উপযোগী শক্তিরূপে আমাদের পার্টিকে তৈরি করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

আন্তর্জাতিকতাবাদী সংহতিকে আমাদের সংগ্রামের প্রধান ও সদা-বিরাজমান উপাদান বলে আমরা মনে করি। ২২তম কংগ্রেসে জর্জ মার্সাই দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করেন : "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা ও শান্তির পক্ষে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের পক্ষে সংগ্রামরত সমস্ত জাতি, সমস্ত

গণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক শক্তির প্রতি আমরা সংহতি প্রকাশ করেছি ও ভবিষ্যতেও করব।*

কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মধ্যে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পার্থক্য ও দ্বিমত রয়েছে, এর কিছু কিছু সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রভৃতির মত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে। আমরা বিশ্বাস করি মূল্যায়নের পার্থক্য ও দ্বিমত পার্টিগুলোর স্বাভাবিক সম্পর্কের পথে বা তাদের অভিন্ন মহান লক্ষ্য-সমূহে অবাধ ও স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নয়। আমরা বিশ্বাস করি এই ধরনের সহযোগিতা এই পার্থক্যগুলো স্বীকার করে নেওয়ার মধ্য দিয়েই লাভবান হয়।

মূল্যায়নের পার্থক্য ও মতভেদ যাই থাকুক না কেন, এফ সি পি যতদূর সম্ভব কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সঙ্গে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও স্বাধীনতা ও শান্তির পক্ষে সংগ্রামরত সমস্ত গণতান্ত্রিক ও জনপ্রিয় শক্তির সঙ্গেও ভ্রাতৃত্ব-মূলক সম্পর্ক প্রসারিত করতে চায়।

---

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৬৪ পৃঃ

ঐক্যের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা

লায়োনেল সটো প্রিয়েটো
কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আগের চেয়ে আরো দৃঢ় হয়ে উঠেছে; এর ভৌগোলিক সীমানা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং মানব জাতির অগ্রগতিতে এর প্রভাব দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যে-পিকিঙ নেতৃত্ব মহান চীন বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেই পিকিঙ নেতৃত্ব বিশ্বের বিপ্লবী শক্তিগুলোর মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তির উপাদান ছড়িয়েছে। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র বিশ্ব-বিকাশের সামগ্রিক বৈপ্লবিক লক্ষ্যকে পরিবর্তিত করতে পারে নি।

অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী শিবির স্থায়ী সংকটে জরাজীর্ণ—এই সংকট অর্থনীতির অবক্ষয় ও সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া সমাজের অবক্ষয়ের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী নীতি যে বরাবরই জনগণের ও ইতিহাসের স্বার্থের বিরুদ্ধে। তা আগের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মানবজাতি, তথা এই গ্রহের সমগ্র জীব জগৎকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে শান্তির সংগ্রাম একটি আবশ্যিক প্রয়োজন। অস্ত্র প্রতিযোগিতা চালাতে গিয়ে মানবজাতির যে-বিপুল পরিমাণ সম্পদ বর্তমানে নষ্ট হচ্ছে, সেই সম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির কাজে নিয়োজিত করতে হলেও স্থায়ী শান্তি একান্ত প্রয়োজন। এই অস্ত্র প্রতিযোগিতার জন্যে কে দায়ী বিশ্বের বিপ্লবীরা তা ভালো করেই জানেন। তারা এটাও ভালোভাবে উপলব্ধি করেছেন যে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট কর্মকাণ্ডের জন্যেও শান্তির প্রয়োজন।

আমাদের পার্টির নীতি কিউবার জাতীয় স্বার্থ এবং সর্বোপরি বিশ্ব-বৈপ্লবিক আন্দোলনের সর্বোচ্চ স্বার্থ পূরণ করে। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা-বাদ আমাদের পার্টির নীতির মূল স্তম্ভ। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে

বিশ্বের সকল সমাজতান্ত্রিক দেশ একটি সাধারণ ও কার্যকর নীতি অনুসরণ করুন—কিউবার কমিউনিস্টরা তাই চায়। বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণী এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যাতে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে তার জন্য আমরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা গড়ে তুলতে এবং তা বৃদ্ধি করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাই। আমরা বিশ্বাস করি পৃথিবীতে কেবলমাত্র দু-টি শিবির, যার একদিকে সমাজতান্ত্রিক শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি এবং অপর দিকে সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আন্তর্জাতিক রণাঙ্গনে মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অবস্থান করছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বরাবর আস্থাশীল এমন যে-কেউ (সুবিধাবাদের শিকার না হলে) বিষয়টি পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারবেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে, একচেটিয়া পুঁজির অভূতপূর্ব আন্তর্জাতিকীকরণ ধনতান্ত্রিক বিকাশের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। এর ফলে বহুজাতিক কোম্পানি নামে পরিচিত দৈত্যাকার একচেটিয়া পুঁজি-সমষ্টি গড়ে উঠেছে এবং তার বৃদ্ধি ঘটছে।

সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া, আফ্রিকার এবং লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশকেই উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্র বলে মনে করে। কারণ, খনিজাত কাঁচামাল (বিশেষ করে খনিজ তৈল) এবং কৃষিজাত দ্রব্য এরা এইসব দেশ থেকে সংগ্রহ করে থাকে (এর ফলে এইসব দেশের কৃষির বিকাশ বিকৃত ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে)।

এমন কি যেইসব দেশগুলো যারা ইতিমধ্যেই তাদের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করেছে কিন্তু যাদের অর্থনৈতিক কাঠামোয় এখনো পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনের বোঝা বর্তমান রয়েছে তাদেরকেও এই বাঁধনে বাঁধার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বিশ্ব-বাজারে তাদের অবস্থানকে কাজে লাগাচ্ছে।

জনগণের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করা, তাদেরকে লুণ্ঠন করা এবং ক্রীতদাসে পরিণত করার আরও সূক্ষ্ম পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছে। যেমন, বিদেশী পুঁজির সঙ্গে একত্রে এমন সব মিশ্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে—যাদের সাহায্যে একচেটিয়া চক্রগুলি, প্রথমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাতীয়করণের 'বিপদ' থেকে এইসব প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করতে চায়, স্থানীয় পুঁজি ও আইন কাজে লাগিয়ে তাদের মুনাফাবৃদ্ধি করা, কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করতে চাইলে তা প্রতিরোধ এবং মিশ্র প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চায়। উন্নয়নশীল

দেশগুলোকে লুণ্ঠনের অপর সাম্রাজ্যবাদী কায়দা হচ্ছে "ঋণের জালে আবদ্ধ রাখা", বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক সংস্থা যেমন আন্তঃ আমেরিকান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (আই এ ডি বি), বিশ্ব ব্যাঙ্ক (আই বি আর ডি) এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আই এম এফ), ইত্যাদি সংস্থা থেকে এই ধরণের ঋণ দেওয়া হয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর হাত-পা বেঁধে ফেলাই এই ঋণের উদ্দেশ্য।

বিদেশী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজি লাতিন আমেরিকায় তার বিনিয়োগ ১৯৭৮ সালে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে, বিশেষ করে ব্রেজিলে এবং মেক্সিকোতে, যেখানে এখন মোট ১ হাজার ডলার খাটছে।

শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়ারই যে লাতিন আমেরিকায় পুঁজি রপ্তানি করছে তাই নয়, পশ্চিম জার্মানির বিনিয়োগও বেশ ভালোরকম বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৭ সালে পশ্চিম জার্মানির বিনিয়োগের পরিমান ৬শ' কোটি ৮০ লক্ষ ডি এমে পৌঁছেছে (প্রায় ৩শ' কোটি ২০ লক্ষ মার্কিন ডলার) এবং এর মধ্যে অধিকাংশটাই (৩শ কোটি ৮০ লক্ষ ডি এম) ব্রেজিলে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

দীর্ঘ ঔপনিবেশিক বন্ধন থেকে সদ্যমুক্ত আফ্রিকেয় দেশগুলোর অবস্থা এর চেয়েও খারাপ। এই মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদ সবচেয়ে বর্বর কায়দায় নয়া-উপনিবেশিক শোষণ চালিয়েছে কিন্তু সেখানেও বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিবর্তনের চাপে পড়ে আদিম হিংস্র কায়দায় শোষণের পথ ছেড়ে অনেক সূক্ষ্ম কায়দা সাম্রাজ্যবাদকে নিতে হয়েছে। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আফ্রিকেয় দেশগুলো অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার যে-জটিল সমস্যা লাভ করেছে তার জন্যে দেশের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তারা ধনতান্ত্রিক বাজারে একটি কি দু-টি পণ্য রপ্তানির ওপর মূলত নির্ভর করে। অথচ অত্যন্ত প্রতিকূল বাণিজ্যিক শর্তে তারা তাদের পণ্য রপ্তানি করে থাকে। বহু দিক থেকে লাতিন আমেরিকার মতো আফ্রিকার এই দেশগুলোকেও বিনিয়োগ এবং ঋণের দড়িতে বেঁধে বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

এই সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন যে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই ভূমি সমস্যার সমাধান এখনো পর্যন্ত হয় নি। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো, শোষকশ্রেণী, স্থানীয় অভিজাত ও সাম্রাজ্যবাদী এক-

চেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। প্রায় সর্বত্রই ভূমি সংস্কার এক সর্বব্যাপী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

অনেক উন্নয়নশীল দেশ জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের শরিক। ১৯৬১ সালে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এই আন্দোলন শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা এবং প্রগতির সংগ্রামে সদর্থক প্রভাব বিস্তার করার কাজে এবং উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ, উগ্র-ইহুদীবাদ এবং জাতিভেদ প্রথাকে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করার কাজে নিজেকে একটি শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৯৭৯ সালে হাভানায় জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলোর ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলন হতে যাচ্ছে। আর ঠিক সেই কারণে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার অনুসরণকারী জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে কিউবার মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জন্যে জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলোর জনগণের মধ্যে কিউবা সম্পর্কে অবিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্যে এবং এই ধরনের একটা বিশাল আন্দোলনে স্বাভাবিকভাবেই যে মত-বিরোধ থাকে সেই মত-বিরোধ চাগিয়ে তোলার জন্যে জোর প্রচার শুরু করেছে। ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, সিনহুয়া এবং এদের সমগোত্রীয় আরো কিছু সংবাদ সংস্থার মধ্যে এক চমৎকার যোগসাজশে এই অসত্য এবং অন্যায় প্রচার চালানো হচ্ছে।

আমরা কিউবার কমিউনিস্টরা মনে করি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন একটি সক্রিয় উপাদান। অধিকাংশ জোট নিরপেক্ষ দেশের জনগণ আজো পর্যন্ত যে-নির্যাতনের শিকার সেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন তার সামর্থ্য ও ঐক্যের সাহায্যে প্রতিনিয়তই অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

আমরা বিশ্বাস করি জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনকে শান্তি, স্বাধীনতা এবং সমাজপ্রগতির সকল শক্তির সঙ্গে মিলিত করার একটা বিষয়গত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এই ঐক্য সাধনের পর শান্তি, স্বাধীনতা এবং সমাজ প্রগতিবিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে যুক্ত কার্যক্রম প্রয়োজন। এই পথে ঐক্য-সাধনের প্রয়াস সফল করে তুলতে হলে আরো কিছু বাধা অতিক্রম করতে হবে অথচ আন্তর্জাতিক সংহতি ছাড়া মুক্তি অর্জন এবং বৈপ্লবিক শক্তিসমূহের মিলনের সংগ্রামে জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের পথে দেশকে কে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, এমন সদ্যমুক্ত দেশ, যেমন অ্যাঙ্গোলা, ইথিওপিয়া,

মোজাম্বিক এবং ইয়েমেন গণপ্রজাতন্ত্র ইত্যাদি দেশগুলোকে তাদের সংগ্রামে সমর্থন জানানো হচ্ছে আন্তর্জাতিক সংহতির অন্যতম প্রকাশ। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও নির্যাতন নির্মূল করতে এবং সত্যিকারের প্রগতিশীল পরিবর্তন চায় এমন শক্তিসমূহকে সমর্থন করাও আন্তর্জাতিক সংহতির মধ্যে পড়ে।

কিউবার বিপ্লবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নিয়ামক সমর্থন ও সাহায্য বরাবর পাওয়া গিয়েছে এবং এখনো পাওয়া যাচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিউবার বিরুদ্ধে আক্রমণ ও অর্থনৈতিক অবরোধের যে-নীতি নিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ভ্রাতৃপ্রতিম সংহতি সাম্রাজ্যবাদের সেই নীতি গুঁড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত করে তুলতে চাই। যদিও আমাদের ক্ষমতা এখনো পর্যন্ত সীমিত তথাপি আমরা আন্তর্জাতিক সংহতির চিহ্ন হিসাবে মুক্ত এবং সংগ্রামরত জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কাজে সাহায্য করে চলেছি। কিউবার হাজার হাজার ডাক্তার, শিক্ষক, কারিগরী বিশেষজ্ঞ এবং শ্রমজীবী মানুষ আফ্রিকায় ও বিশ্বের অন্যান্য অংশে সাধারণভাবে পোর সাহায্য যুগিয়ে চলেছে। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোর হাজার হাজার অর্ধশিক্ষিত যুবক-যুবতীকে কিউবার স্কুল-কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।

আমরা এইভাবে আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন করে চলেছি বলে আমরা বিশ্বাস করি। সমাজতন্ত্রের রণনীতিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সদ্য-মুক্ত দেশগুলোর অর্থনীতি শক্তিশালী করা এবং তাদের উন্নয়নের কাজে সাহায্য করা এবং জাতীয় দক্ষ কর্মীদের প্রশিক্ষণের কাজ নিশ্চিত করার কাজে সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য। তার কারণ এই সাহায্যের ফলে এই সব দেশ সমাজতন্ত্রের পক্ষে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারবে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহের অবস্থান আরো দুর্বল করতে পারবে।

জিম্বাবুই, নামিবিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে, প্যালেস্টাইন ও পশ্চিম সাহারার মুক্তি আন্দোলনে, নিকারাগুয়া, গুয়াতেমালা, চিলি, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে এবং আরো বহু দেশের জনগণ আমাদের সকলের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম চালাচ্ছে এবং যে-জনগণ মানবিক মর্যাদাপূর্ণ জীবনে উন্নীত হতে চায় তাদের সকলের প্রতি রাজনৈতিক সমর্থন ও প্রতিটি সাহায্যের মধ্যে দিয়ে বৈপ্লবিক ও জাতীয়মুক্তি আন্দোলনের প্রতি যে-সংহতির প্রকাশ ঘটছে নিঃসন্দেহে তা সমাজতন্ত্রের প্রতি অগ্রগতি ঘটাতে এবং সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতা দুর্বল করতে সহায়ক হবে।

কিউবার বিপ্লবকে শ্বাসরুদ্ধ করার সাম্রাজ্যবাদী সকল অপচেষ্টা আমাদের সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি প্রতিহত করেছে। ১৯৬১ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের বিরুদ্ধে ন্যায়-নীতি বিবর্জিত অবরোধ গড়ে তোলে এবং যা এখনও বর্তমান। আমাদের স্বদেশ ভূমির একটা অংশ (যেখানে গুয়ান-তানামোর নৌ-ঘাঁটি রয়েছে) এখনো তারা দখল করে রেখেছে। আমাদের বিরুদ্ধে নানান হুমকি এবং কিউবা-বিরোধী প্রচার এখনো তারা সমানতালে চালিয়ে যাচ্ছে। কিউবার জনগণ তাদের সংগ্রামী শক্তির দ্বারা এই সবল শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্ব-বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিশ্বস্ত অংশীদার হিসাবে কিউবা তার যথাযোগ্য স্থান করে নিয়েছে বলে আমরা মনে করি।

বর্তমান সমাজতন্ত্র ও সদ্যস্বাধীন দেশসমূহ

নারায়ণ কে. কৃষ্ণাণ
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সম্পাদক,
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য

বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমানে বিশ্বের সামাজিক-রাজনৈতিক বিকাশে নিয়ামক প্রভাব ফেলছে। তার বিরাট আর্থনীতিক ও প্রতিরক্ষা সামর্থ্য সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিশেষ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সারা দুনিয়ার সমস্ত শান্তিকামী জাতি ও শক্তিগুলোর দ্বারা সমর্থিত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সক্রিয় ও উদ্দেশ্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি সত্তরের দশকের প্রথমদিকে উত্তেজনা প্রশমনের (দেঁতাত) দিকে ইতিবাচক মোড় ফেরানোয়ও জাতীয় ও সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে প্রতিবিপ্লব রপ্তানি করা আরও কঠিন হয়ে পড়ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অনুসৃত নীতি ইতিহাসে এই প্রথম আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিকাশকে সাহায্য করছে। সমাজতান্ত্রিক বৈদেশিক নীতির মৌল সূত্রগুলো যথা, ভিন্ন সমাজব্যবস্থা সম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আন্তঃরাষ্ট্র বিরোধের মীমাংসার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধ পরিহার করা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক আইনে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত সূত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সদ্যস্বাধীন দেশগুলো তাদের স্বাধীনতাকে সংহত করার, অর্থনীতির বিকাশ ঘটানোর, দারিদ্র্য ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার বিশাল সমস্যার মুখোমুখি, যা তারা শতাব্দীব্যাপী ঔপনিবেশক শোষণের মাধ্যমে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। এই কর্তব্যগুলোর সম্পাদন সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার জন্য সংগ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

বিশ্বের শক্তিসমূহের পরিবর্তিত সম্পর্ক বহু সদ্যস্বাধীন দেশকে বিদেশী সংস্থা জাতীয়করণে ও নিজেদের সম্পদের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম করেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাদের অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্যও বিশাল সংখ্যক দক্ষ কারিগরী কর্মী প্রশিক্ষণের জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ব্যাপকভাবে সাহায্য দিচ্ছে। অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনে ভারতের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা একটি সাধারণ তথ্য থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সোভিয়েত সহযোগিতায় নির্মিত সংস্থাগুলো থেকে বর্তমানে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ইস্পাত, উৎপাদিত তেলের অর্ধেকেরও বেশি, ৮০ শতাংশ ধাতব যন্ত্রপাতি, ৬০ শতাংশ ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদিত হচ্ছে। এগুলো হল ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাহায্য। ইউ এস এস আর ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সাহায্যের প্রকৃত গুরুত্ব শুধুমাত্র পরিমাণগত দিক দিয়ে মাপা যায় না। স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিস্থাপনেও জাতীয় সার্বভৌমত্ব সংহতিতে এর গুণগত ফলাফল দেখতে হবে।

বেশির ভাগ সদ্যস্বাধীন দেশে বিকাশের পথের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এই বিষয়টি তাদের সামাজিক-আর্থনীতিক সমস্যার সমাধানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ক্রমশঃই আরও বেশি বেশি দেশ সমাজতন্ত্রমুখী বিকাশের পথ ধরছে। এইসব দেশগুলোতে সাধারণভাবে বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা শাসনব্যবস্থায় রয়েছে, এবং তারা সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ অবসানের জন্য ও পুঁজিবাদী বিকাশ খর্ব করার জন্য মৌল সামাজিক প্রগতির কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও নৈতিক সমর্থন হচ্ছে সমাজতন্ত্রমুখী বিকাশের সাফল্যের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত, কিন্তু এইসব উপাদান আপনাআপনি চরম নিশ্চয়তা আনে না। এইসব দেশগুলোর শক্তিসমূহের সম্পর্কের মধ্যে প্রগতিশীল পরিবর্তন, অর্থাৎ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব এইসব দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সরকারগুলো এইদিকে এগোচ্ছে। বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোর মতাদর্শগত ভিত্তি হিসেবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গ্রহণ এ-ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য বিষয়।

সমাজতন্ত্রের সাফল্য ও তার আন্তর্জাতিক প্রভাব গভীরতর হচ্ছে, এবং

বিশ্ব-পুঁজিবাদের সংকটকে তা আরও তীব্রতর ব
প্রভাবে নতুন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার
বেপরোয়া কৌশল অবলম্বন করছে। এই নতুন
সোভিয়েত-বিরোধিতা, যাতে মার্কিন সাম্রাজ
সম্প্রসারণবাদী চীনা শাসকদের দোসর হিসেবে পে

গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের বর্তমান নেতৃত্ব মার্কসবাদ
ছিন্ন করেছেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাতীয় মু
ও দেঁতাত-এর বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও না
প্রকাশ্যে যোগ দিয়েছেন। মাওবাদী জাত্যভিমানী
আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ভারত। বর্তমানে তারা
প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধেও আক্রমণ চালিয়েছে। সাম
গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের বর্তমান নেতৃত্ব সম্পর্কে নী
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্য ও সংগ্রামের, বিশ্ব-শা
পক্ষে সম্ভব?

আমরা গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সাথে বন্ধুত্বের স
চীনা নেতাদের বর্তমান বৈদেশিক নীতির বিরু
অর্জন করা যাবে না।

আগ্রাসী মার্কিনী-চক্র ভিতর থেকে সমাজতন্ত্র
পড়ে লেগেছে; আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোল
নামানোর জন্য, তাকে ভাঙার জন্য তারা বিভিন্ন
অবস্থায় সোভিয়েতবিরোধিতাকে দৃঢ়ভাবে পরা
পারমাণবিক যুদ্ধের পথ বন্ধ করার আমাদের সা
লক্ষ্য অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দো
সংগ্রামী ক্ষমতা বাড়ানোর কর্তব্য একটি সাধারণ ঐ
হয়েছে।

পরস্পরকে বোঝার জন্য ঘনঘন অভিজ্ঞতা বি
অভিজ্ঞতার তাত্ত্বিক সাধারণীকরণের প্রচেষ্টা—আম
বর্তমানের নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করার
শক্তিশালী করার পথ।

ইথিওপিয়ার বিপ্লবের অবিচল অগ্রগতি

আসেফা আরেগাহেগ্‌নে
সমাজতান্ত্রিক ইথিওপিয়ার অস্থায়ী সামরিক প্রশাসনিক
পরিষদের প্রতিনিধি

ইথিওপিয়ার বিপ্লব একটি শক্তিশালী সামন্ত রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে। এই রাজতন্ত্র সারা দেশে তার জাল ছড়িয়েছিল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে নিপীড়িত জনগণের রক্ত শোষণ করেছে। এখানেই ইথিওপিয়ার বিপ্লবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব। ১৯৭৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর এই সামন্ত-বুর্জোয়া শাসন পদচ্যুত হয়, এবং সেই দিনই পূর্ব-আফ্রিকায় সামন্ত-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী একটি বিপ্লবী রাষ্ট্রের জন্ম হয়, যারা শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিগুলোর বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত।

ইথিওপিয়ার বিপ্লবকে এক জটিল পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে, কারণ নিপীড়িত জনগণের শত্রুরা, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ এর গতিরোধ করার চেষ্টা করছে। একটি ট্রট্স্কীপন্থী গোষ্ঠী, ইথিওপিয়ার গণ-বিপ্লবী পার্টি নামে একটি দলকে সাম্রাজ্যবাদ প্রসারিত করতে চায়, যারা লোকদেখানো বিপ্লবী স্লোগান দেয়। ইথিওপিয়ার নিপীড়িত জনগণ খুব শীঘ্রই পি আর পি ই (উপরোক্ত পার্টি)-র জনবিরোধী ও বিপ্লবী-বিরোধী চরিত্র বুঝতে পারে ও "লাল সন্ত্রাস" তীব্রতর করে। "লাল সন্ত্রাসের" মধ্য দিয়েই জনগণের সংকল্প, তাদের অনমনীয় ইচ্ছা ও সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তির অবশ্যম্ভাবী পরাজয় প্রদর্শিত হয়।

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল আরব শাসকচক্র তথাকথিত ইথিওপিয়া গণতান্ত্রিক ইউনিয়নে (ই. ডি. ইউ.) সামন্তবাদের অবশিষ্টাংশদের ও হঠে-যাওয়া অভিজাতদের সংগঠিত করে এবং তারা ইথিওপিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিপ্লবকে চ্যালেঞ্জ করতে চেষ্টা করে। ইথিওপিয়ার বিপ্লবী সৈন্যদলের হাতে এই সংগঠন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

P 36245

বিপ্লবের গতিরোধ করার প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টায় সাহায্য করার সুযোগ পিকিং নেতারা হারায় নি।

সাম্রাজ্যবাদীরা উত্তরে, ইরিত্রিয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের, একটি বিরাট অঞ্চল দখলে সাহায্য করতে, অর্থনীতিকে দুর্বল করতে এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও দেশের ঐক্য বিনষ্ট করতে বৈষয়িক ও নৈতিক সাহায্য দেয়।

ইথিওপিয়ার বিপ্লব ও জাতীয় ঐক্যকে আক্রমণের জন্য সাম্রাজ্যবাদ প্রতিক্রিয়াশীল সোমালী নেতাদের ঠেলে দেয়। বিপ্লবের জটিল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা পূর্ব ও দক্ষিণ ইথিওপিয়ার বিরাট অঞ্চল দখল করে। "বিপ্লবী পিতৃভূমি বা মৃত্যু" এই স্লোগানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইথিওপিয়ার দেশপ্রেমিক জনগণ সংগ্রামে নামে। সামরিক বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে গণবাহিনী ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিসমূহ ইথিওপিয়ার ভূখণ্ড থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করে।

যদিও আমাদের অর্থনীতি যুদ্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তবুও বিপ্লবী ইথিওপিয়ার বীর জনগণ যে-বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির সহযোগিতায় রাজনৈতিক সংগ্রামের মতো অর্থনৈতিক সংগ্রামেও জয়যুক্ত হবে, এসম্পর্কে এক মুহূর্তের জন্যও আমরা সন্দেহ পোষণ করি নি। আমাদের সামনে যে সংগ্রাম তা আমাদের দ্বারা জয়যুক্ত রাজনৈতিক সংগ্রামের যে-কোনো অংশে কম নয়, সে-বিষয়ে আমরা সচেতন।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার কর্মসূচীর ভিত্তিতে বিপ্লবী ইথিওপিয়ার পররাষ্ট্র নীতি প্রতিষ্ঠিত। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনবাদী নীতির ভিত্তিতে আমাদের দেশ বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা সম্পন্ন পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। আমরা সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোর সাথে আমাদের সংহতি শক্তিশালী করেছি ও করব। ইথিওপিয়ার পররাষ্ট্রনীতি জোটনিরপেক্ষতার নীতি, অর্থাৎ শান্তি, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সাম্য, জাতীয় মুক্তি, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনুপ্রবেশ না-করার নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার সমস্ত ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের সাথে, সমস্ত জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সাথে ও সাম্রাজ্যবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা আমাদের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।

আমাদের এখনও বহু কাজ করার আছে। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার একটি শ্রমিক পার্টি এখনও আমরা গঠন করতে পারি নি। আমরা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে, যা নিঃসন্দেহে ইথিওপিয়ার মতো উন্নয়নশীল দেশে সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিতের সূচনা করবে। ইথিওপীয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সংগঠনে সমবেত হয়ে আমাদের দেশের নাগরিকেরা একটি প্রলেতারীয় পার্টি গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশ, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কিউবা থেকে আমরা যে-সমর্থন পেয়েছি, সে-ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের প্রচারকে ইথিওপিয়া জোরের সাথে ধিক্কার জানায়। এই সাহায্য ছাড়া আমাদের বিপ্লব বর্তমান স্তরে পৌঁছাতো না। আমরা পিকিং-এর সোভিয়েত-বিরোধী ও মহাশক্তিসুলভ নীতির, বিপ্লবী কিউবার বিরুদ্ধে তার কুৎসার, সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে তার নীতির এবং সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তার অনুপ্রবেশের নিন্দা করি।

ইথিওপিয়ার বিপ্লবের অগ্রগতি ও যে-পথ ধরে সে চলেছে, তাতে প্রতিবেশী দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর ও সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। সে-কারণে আমাদের বিপ্লবকে পরাজিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

"সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গঠন এবং বিশ্বের অগ্রগতি"

শীর্ষক আন্তর্জাতিক তত্ত্বগত সম্মেলনের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে তথ্য। সম্মেলনের সমাপ্তি।

সম্মেলনের কাঠামো এই তিনটি শাখায় ভাগ করা হয়:

বর্তমান সমাজতন্ত্র ও বিশ্বের সমাজ বিকাশের ধারা। এই বিভাগীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং নভো ভ্রেমে পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক নিকোলাই ইরিবাদ্‌জাকভ।

এছাড়া আলোচনাটিতে অংশ নেন স্লোভাকিয়া কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক লুডোভিট পেজলার, পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির ভাবাদর্শ ও শিক্ষা বিভাগের প্রধান জেরজি মুহ্‌ জাইমিস্কি; সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির সহ সভাপতি পিওতর ফেদোসিয়েভ; কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির বিকল্প সদস্য ও ডাবলিউ. এম. আর-এ ঐ পার্টির প্রতিনিধি পিটার বয়চুক; বি. সি. পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এন ইরাচিল; বি. সি. পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য ও সমাজবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান ওয়াই জর্জিয়েভ; এম. পি. আর. পি-র ইতিহাস ইনস্টিটিউট-এর এম পি আর পির কেন্দ্রীয় কমিটির ডেপুটি ডাইরেক্টর এ. মিনিস; পেরুভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য ও এই পত্রিকায় পার্টির প্রতিনিধি কর্লোজ নিউনস আমাভিটারটে; কৎসম (কমিউনিস্ট পত্রিকা) পত্রিকাটিতে ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান ভু ভান-থিয়েন; রুমানিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কনট্রোল কমিশনের সদস্য ও ডাবলিউ. এম. আর-এর সম্পাদকীয় মণ্ডলীর সদস্য বারবু জাহারেস্কু; এস ইউ পি জি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজবিজ্ঞান

আকাডেমির প্রো-রেক্টর প্রফেসর কার্ল হিঞ্জ স্টিমারলিং ; উরুগুয়ে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য এডুয়ার্ডো ভিয়েরা ; বি সি পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ওয়াই রাদেভ ; বুলগেরিয়ান বিজ্ঞান আকাডেমির দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ বিভাগের যুক্ত কেন্দ্রের ডাইরেক্টর ও পলিটিচেস্কা প্রসভেটা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এস আঞ্জেলভ ; বি সি পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক বিভাগের প্রথম সহ প্রধান চ আলেকজাণ্ডারভ ; গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে ডাবলিউ এম আর-এর সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য বার্ট রমেলসন ; বি সি পি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বুলগেরিয়ান বিজ্ঞান আকাডেমির অধীনে কলাবিদ্যা গবেষণা যৌথ সংস্থার ডাইরেক্টর প্রফেসর এ স্টইকভ ; চেকোস্লাকভ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট-এর ডেপুটী ডাইরেক্টর মিলান মার্টোজ ; বি সি পি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ডবলিউ এম আর-এর সম্পাদকীয় কমিটির সদস্য গিরগিন জিরাজিনভ ।

নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহ ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে আলোচিত হয় ।

—বর্তমান অবস্থায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল বিকাশের উৎস ও রূপ ;

—বর্তমানে সমাজবাদ ও সমাজবাদের আদর্শ এবং বিভিন্ন দেশের বিশেষ অবস্থায় এর প্রকাশ ; সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য এবং এর উত্তরণের সাধারণ মিল ;

—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জগতে কোন কোন উপাদান বর্তমান সমাজবাদের স্থান ও ভূমিকা নির্ধারিত করে ;

—অ-সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অংশে গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়ায় বর্তমান সমাজবাদের প্রভাব ;

—বর্তমান সমাজবাদ ও তার সামাজিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলি উন্নত পুঁজিবাদী এবং উন্নতিশীল দেশগুলিতে ভাবাদর্শ ও রাজনীতির সংগ্রাম ; বিশ্ব-উন্নয়নে বর্তমান সমাজবাদের আর্থিক বিকাশের প্রভাব ;

—বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্যের গুরুত্ব এবং পুঁজিবাদের উপর সমাজতন্ত্রের সুযোগ-সুবিধার চাক্ষুষ প্রমাণ । "সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর আন্তর্জাতিক নীতি এবং বিশ্ব-প্রক্রিয়ায় তার প্রভাব ।" এই শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির

বিষয় সদস্য ও সি পি এস ইউ-এর আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রথম সহকারী প্রধান অধ্যাপক ভাদিম চাগলাদিন।

এই আলোচনায় অংশ নেন: হুন্ডুরাস কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কমিশনের সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এবং ডাবলিউ এম আর-এর পার্টির প্রতিনিধি হিউমবের্তো পারেদেস; পি ইউ ডবলিউ পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রধান ভ্লাদিমির কোয়াস্কি; ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার দপ্তরের সহকারী প্রধান নগুয়েন ভিন; এম পি আর পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এম সসোর ধারম; আলজিরিয়ার সোশ্যালিস্ট ভ্যানগার্ড পার্টির প্রতিনিধি; দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি ভুজবা সেমে, আর সি পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও আর্থনীতিক বিজ্ঞান আকাডেমির রেক্টর ভেতপি হুলুগু; সিরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্য দানিয়েল নামে; সুদানী কমিউনিস্ট পার্টির ডাবলিউ এম আর-এ প্রতিনিধি আহমেদ সালেম; বি সি পি প্রতিনিধিদের পরামর্শদাতা ও নাটাবলার উচ্চতর সংস্থার রেক্টর প্রোফেসর কে গোরানভ; এইচ এস ডাবলিউ পি-র ডাবলিউ এম আর-এর সম্পাদকীয় মণ্ডলীর সদস্য কারোলা নিপকোভিকস।

ভাষণে ও উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয় সমেত বিস্তৃত বিষয় আলোচিত হয়:

—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতে বিভিন্ন শক্তির ভারসাম্য ও একে রূপায়িত করার উপাদান;

—দেতাঁতের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া, শ্রেণী সংগ্রাম এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর বৈদেশিক নীতির শ্রেণীগত ও আন্তর্জাতিক চরিত্র;

—দেতাঁতকে দৃঢ় ও গভীরতর করার, নিরস্ত্রীকরণ এবং বিশ্বশান্তি দীর্ঘস্থায়ী করার সংগ্রামে ইউ এস এস আর ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলির মুখ্য ভূমিকা;

—স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার মুখ্য পূর্বশর্ত হিসাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, সমস্ত বিপ্লবী, প্রগতিশীল ও শান্তিকামী শক্তিসমূহের গভীর মিথস্ক্রিয়া;

—মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদীদের পরিবর্তনা এবং জাতিসমূহের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির যথাপ্রসু সহযোগিতা;

—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পিকিং নেতাদের বৃহৎ শক্তি সুলভ একাধিপত্যের

নীতি, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার সহযোগী হিসাবে তাদের ভূমিকা আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির বিপজ্জনক শক্তি।

"সমাজবাদী দেশ এবং বিপ্লবী শক্তিসমূহের সংহতি বৃদ্ধির সমস্যাবলী"—এই শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন চিলির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল কমিশনের সদস্য ভোলোদিয়া টাইটেলবম।

অন্য যাঁরা এই আলোচনায় অংশ নেন তাঁরা হলেন পি. ইউ. ডাবলু পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পোলিশ বিজ্ঞান আকাডেমির দর্শন ও সমাজবিদ্যা সংস্থার ডাইরেক্টর তাদেউস জারসজেওস্কি; বি. সি. পি প্রতিনিধি আকাডেমিশিয়ান ই. মাটভিয়েভ; ইস্রাইল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্য ও ডাবলিউ. এম আর-এ পার্টির প্রতিনিধি ইমিলে হাবিবি; সিরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ডাবলিউ এম আর-এ পার্টির প্রতিনিধি জ্যাকভ কারবো; ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার দপ্তরের সদস্য কোয়া থিয়েন; পি ইউ ডাবলু পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য এবং ডাবলিউ এম আর-এর সম্পাদকীয় মণ্ডলীর সদস্য উইহেল্ম ক্লিমজাক; এস ইউ পি জি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ডাবলিউ এম আর-এর সম্পাদকীয় মণ্ডলীর সদস্য রোলাণ্ড বুয়ার; ডাবলিউ এম আর-এ প্যারাগুয়ান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি সিভিরো রোমেরো; এম পি আর পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ও ডাবলিউ এম আর-এর সম্পাদকীয় মণ্ডলীর সভ্য বাদামিন লামস্থরেন; প্রগ্রেসিভ পার্টি অব দি ওয়ার্কিং পিপল, সাইপ্রাস (এ. কে. ই এল) ও ডাবলিউ এম আর এ পার্টির প্রতিনিধি আগমেম্নন স্টাভরো; এস ইউ পি জি-র প্রতিনিধি সভ্য ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন সংস্থার ডাইরেক্টর হারল্ড নিউবার্ট।

নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি ভাষণ এবং উত্তরের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়:—

—বর্তমান যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের মূল তিনটি ধারা এবং অন্য সব বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোর সংহতির ভিত্তি হিসেবে কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সংহতি।

—আন্তর্জাতিক শ্রেণী সংহতির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির স্থান ও ভূমিকা এবং তা প্রকাশের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও সমকালীন রূপ;

—কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সংহতি এবং বর্তমান বিশ্বে ভাবাদর্শগত সংগ্রাম; এই সংহতির উপযুক্ত প্রকাশ হিসেবে বর্তমান সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের কুৎসা প্রচার খণ্ডন করা;

—বর্তমান জগতের অন্যান্য বিপ্লবী শক্তিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়া ও তাদের সহযোগী পিকিং নেতাদের প্রচেষ্টার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ;

—ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির অভিজ্ঞতা ও তাত্ত্বিক সৃজনশীলতার আন্তর্জাতিকতাকরণ ;

—আন্তর্জাতিকতাবাদী সংহতি এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে এর অচ্ছেদ্য ঐক্যের রূপ হিসেবে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদ।

সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ সমাপ্তি অধিবেশনে ডাবলু এম আর-এর প্রধান সম্পাদক কনস্তানতিন জারোদভ ভাষণ দেন। তিনি বলেন :

সভাপতির শেষ ভাষণ হিসেবে আমার মনে হয় যে সাধারণভাবে একথা আমি বলতে পারি যে আমাদের এই সম্মেলন কমিউনিস্টদের এবং অন্যান্য সব বিপ্লবী শক্তির জীবনে বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কমরেড তোডর জিভকভ সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে সমাজবাদ ও সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ এবং বিশ্ব উন্নয়নের বিনা শর্তে এই "শতাব্দীর আলোচ্য বিষয় হিসেবে" অভিহিত করেন।

বিশ্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর জনগণ, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও অন্যান্য প্রগতিশীল ও শান্তিকামী শক্তিসমূহের সামনে যে-সব সমস্যা রয়েছে সেসব সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বর্তমান সমাজতন্ত্রকে যে-বিরাট ভূমিকা পালন করতে হয় সে-বিরাট ভূমিকা সম্পর্কে এক গভীর বিশ্লেষণ করার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে এই সম্মেলনে।

এখানে যে-সব পার্টির প্রতিনিধিরা এসেছেন তাদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা এবং মতামত বিনিময়ের ফলে উপলব্ধির গভীরতা বৃদ্ধির সুযোগও এ-সম্মেলনে হয়েছে। আমরা আবার এটা বোঝবার সুযোগ পেলাম যে তত্ত্ব ও প্রয়োগের তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যাগুলির যৌথ অনুশীলনে কমিউনিস্টদের আগ্রহ রয়েছে। আমাদের আন্দোলনের সারবস্তু থেকেই এই আগ্রহের সৃষ্টি।

এই আলোচনায় দেখা গেল যে আমাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব অনড় নয়, এ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এবং সাধারণ সমধর্মিতা ও পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে কমিউনিস্টরা বিশ্ব-বিকাশের নতুন ঘটনাবলী অনুধাবন করতে চায় এবং মার্কস ও এঙ্গেলস ও লেনিনের মহান মতবাদের সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটাতে চায়।

সম্মেলনে যে-সব সমস্যা উত্থাপিত হয়েছিল তা পারস্পরিক আলোচনা

ও খোলাখুলি মত-বিনিময়ের ভিত্তিতে আলোচিত হয় এবং এইসব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু সমধর্মী নয়। মোটামুটিভাবে প্রত্যেক বক্তা জোরের সাথে এ-কথা বলেন যে সম্মেলনটি অত্যন্ত ফলপ্রদ এবং লাভজনক।

ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর অনেক সংবাদপত্র সম্মেলনটির বিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেছে। আমরা আশা করব যে এই সব ধ্যান-ধারণা ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলো আরো প্রচার করতে সচেষ্ট হবেন। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা বি সি পি-র কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ সম্মেলনের ফলাফলগুলিকে প্রচার করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পালন করবে।

পরিশেষে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটির এবং বিপ্লবী গণ-তান্ত্রিক সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটি ক্ষমতাসম্পন্ন ও / প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিনিধি এ-সম্মেলনে পাঠিয়েছেন, তাদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমার মনে হয় সকলের পক্ষ থেকে মহান জর্জি ডিমিট্রভের পার্টি বুল-গেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি আমাদের বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। সম্মেলনটির প্রস্তুতিকল্পে তাঁরা যে-দর্শনীয় উদ্যোগ, যে-সাদর সম্ভাষণ ও আতিথেয়তা এবং আমাদের কাজের সর্বাধিক নিখুঁত ব্যবস্থা করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। আমরা ধন্যবাদ জানাই তাঁদের সকলকে যাঁরা তাঁদের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে সম্মেলনের খুঁটিনাটি কাজ ও সাংগঠনিক সহায়তা করেছেন।

সম্মেলনটির উদ্যোক্তা বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি এবং ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-এর সম্পাদকদের পক্ষ থেকে অংশ গ্রহণকারীদের কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শান্তি, সমাজ প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবেন।

এপ্রিল বিপ্লবের পঞ্চম বার্ষিকী

আলভারো কুনহাল
পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক

১৯৭৪ সালের ২৫শে এপ্রিল সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলন (এ এফ এম) ও সেই সঙ্গে গণ অভ্যুত্থানের ফলে ফ্যাসিস্ত একনায়কত্বের অবসান ঘটে; এই ফ্যাসিস্ত একনায়কত্ব ১৯২৬ সাল থেকে পর্তুগালের ওপর অত্যাচার চালিয়ে আসছে।

ফ্যাসিস্ত সরকারের পতনের পর শ্রেণী সংগ্রাম নাটকীয়ভাবে তীব্র হয়ে ওঠে এবং এক জটিল ও কঠিন বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়, এই প্রক্রিয়ায় সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন কার্যকর করা হয়। এই সব পরিবর্তনের ফলে নতুন পর্তুগীজ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অত্যন্ত সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, যা পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে পৃথক।

জনগণ ও প্রগতিশীল সামরিক বাহিনীর বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অর্জনের ফলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন ঘটে। পর্তুগালের সদ্য প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের পথ সমাজতন্ত্রের দিকে।

গত তিন বছর ধরে যে সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ক্রমশ পুনর্দখল করেছিল তারা জনগণের গণতান্ত্রিক সাফল্য-গুলোর ওপর তীব্র আঘাত হেনেছে। শ্রমজীবী জনগণ ও অন্যান্য বড় বড় জনগোষ্ঠী দৃঢ়তার সাথে তাদের প্রতিহত করে এসেছে এবং তাদের অর্জিত সাফল্যের প্রতিটি বিন্দু রক্ষা করেছে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটা গণতান্ত্রিক পরিবর্তন আনা। ফ্যাসিস্ত একনায়কত্ব উচ্ছেদ করার পঞ্চম বার্ষিকীতে অতীতের ঘটনাবলীর এক সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা, বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করা ও এর বিবর্তনের ভবিষ্যৎ আগে থেকে উপলব্ধি করা সঠিক হবে।

ফ্যাসিবাদ উচ্ছেদ করার পথ ও পদ্ধতি সংজ্ঞায়িত করে পর্তুগাল কমিউনিস্ট পার্টির ৬ষ্ঠ কংগ্রেস ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বিপ্লবকে গণতান্ত্রিক ও জাতীয় বিপ্লব বলে অভিহিত করে এবং নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান লক্ষ্য স্থির করে: ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা, একচেটিয়াদের ক্ষমতার অবসান ঘটানো ও দেশের সামগ্রিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা; কৃষককে জমি দিয়ে এক কৃষি সংস্কার সমাধা করা; শ্রমিক ও সমগ্র জাতির জীবনধারণের মান উন্নয়ন করা; শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গণতান্ত্রিক করা; সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে পর্তুগালকে মুক্ত করা; পর্তুগীজ উপনিবেশগুলোর জাতিসমূহের আশু স্বাধীনতা অর্জনের অধিকার স্বীকার করা ও তা সুনিশ্চিত করা; সমস্ত দেশের বন্ধুত্ব ও শান্তির নীতি অনুসরণ করা।

পর্তুগালের বাস্তব অবস্থা, পুঁজিবাদী বিকাশের প্রক্রিয়া ও ব্যাপকতা এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুক্ত একচেটিয়া পুঁজি ও বড় বড় ভূস্বামীবর্গের সন্ত্রাসমূলক শাসন হিসেবে ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করে পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য ও একচেটিয়া পুঁজি ও ভূস্বামী গোষ্ঠী-গুলোকে নির্মূল করার মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সংযোগ রয়েছে।

পর্তুগীজ বিপ্লবের গতি প্রমাণ করে যে পি সি পি সঠিকভাবেই এই সব লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল।

এ এফ এম-এর (ক্যাপ্টেনদের আন্দোলন হিসেবেও একে অভিহিত করা হয়) সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের ফলে, এই সব কিছু কিছু মৌলিক লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শ্রমজীবী/জনগণের মৌলিক স্বাধীনতা ও অধিকারকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। ঔপনিবেশিক যুদ্ধের অবসান ঘটানো হয়েছে। পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসনে নিপীড়িত জাতিসমূহের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদান রাখা হয়েছে। শ্রমজীবী জনগণের জীবনধারনের মান উন্নত হয়েছে। একচেটিয়া গোষ্ঠী-গুলোকে নির্মূল করা হয়েছে, বৃহৎ ভূস্বামীদের জমি দখল করা হয়েছে এবং এদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, এবং যারা জমি চাষ করে তাদের পরিচালনায় এই সব জমি তুলে দেওয়া হয়েছে।

১৯৭৫ সালে রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি, তেল, পেট্রোকেমিক্যাল, ও ধাতু শিল্প, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, প্রধান প্রধান রেলওয়ে ও জাহাজ কোম্পানি, বিমান ও পরিবহন শিল্প, পোতাশ্রয়, সিমেন্ট, কাচ, কাগজ, তামাক ও অন্যান্য শিল্প জাতীয়করণ করেছে। ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুলাইয়ের মধ্যে মোট ২৪৫টি শিল্প জাতীয়করণ করা হয়েছে, অন্যান্য শত শত শিল্পে তাদের সম্পদ থাকায় সে-সব শিল্পকেও জাতীয়করণ করা হয়েছে। অর্থনীতিতে যে-সব একচেটিয়া গোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল, তাদের এইভাবে কার্যত নির্মূল করা হয়েছে।

বৃহৎ বৃহৎ জমিদারি প্রসঙ্গে শ্রমজীবী জনগণ ১,১৪০,০০০ হেকটার জমি বা দেশের এক পঞ্চমাংশ চাষযোগ্য জমি অধিগ্রহণ করেছে এবং ৫৫০টি যৌথ উৎপাদন কেন্দ্র (সি পি ইউ) ও সমবায় সংগঠিত করেছে।

২৫শে এপ্রিলের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে একচেটিয়াপতি ও ভূস্বামীবর্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা উচ্ছেদ করা হয়েছে। জাতীয়করণ ও কৃষি সংস্কার তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটিয়েছে।

ঐ সময় পর্তুগীজ বিপ্লবের কোনো কোনো সমালোচক বলেছিল যে তাড়াহুড়ো করে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, পর্তুগীজ বিপ্লবীরা খুব দ্রুত বেশিদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে এবং এই সব পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিপদাপন্ন হয়েছে।

কিন্তু আসল বিষয় হলো গণতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এই সব বিপ্লবী পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল।

২৫শে এপ্রিলের পর একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলো ও ভূস্বামীবর্গ খোলাখুলি-ভাবে প্রতিবিপ্লবী কার্যক্রমের ষড়যন্ত্র করতে, সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গড়ে তুলতে ও তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে, জাতীয় অর্থনীতিকে ব্যাপক আকারে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম চালাতে এবং তরুণ গণতন্ত্রের অবসান ঘটাবার ও একনায়কত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বিদেশী সম্পদ, প্রভাব, সমর্থন ব্যবহার করতে ও বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে।

বহুবার—১৯৭৪ সালের জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে ও ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে—তারা সামরিক অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করেছিল ও সেই উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টাও চালিয়েছিল; কিন্তু এ এফ এম-এর সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ জনগণের সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রামের মাধ্যমে তা প্রতিহত হয়।

শুধুমাত্র শ্রমজীবী জনগণকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ও দেশের প্রগতির পথ

প্রস্তুত করার জন্যই জাতীয়করণ ও কৃষিসংস্কার গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ঐসব কাজ গণতন্ত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে জরুরীকালীন কার্যক্রম ছিল। ১৯৭৫ সালে যদি ঐসব কার্যক্রম গ্রহণ না করা হত, তাহলে যে-সদ্যপ্রতিষ্ঠিত পর্তুগীজ গণতন্ত্র অর্থনৈতিক কব্জার মধ্যে আটকে ছিল এবং ভেতরে ও বাইরে ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যস্থল ছিল, সেই গণতন্ত্রের পতন ঘটত।

পর্তুগালের বর্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র থেকে অবিচ্ছেদ্য। তিন বছর ধরে বিপ্লবের সাফল্যগুলোর ওপর আক্রমণের পরেও এই নীতি আজও সত্য। বিপ্লবের সাফল্য ও প্রতিবিপ্লবের আক্রমণ সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে এটা বিচার করা প্রয়োজন যে রাজনৈতিক শক্তিগুলো প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই জনগণ ও তাদের অগ্রণী শক্তিগুলোর উদ্যোগ ও সংগ্রামের ফলেই এইসব পরিবর্তন সুরু হয়েছিল ও পূর্ণ রূপ লাভ করেছিল, যদিও তারা বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় বিপ্লবীদের (সামরিক ও বেসামরিক) কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছিল।

বিপ্লবের সময় কোনো বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি; পরস্পর সংগ্রামরত শক্তিগুলোর মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয়েছিল। যে-সব মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে তাদের সাথে পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

একদিকে সশস্ত্র বাহিনীর বিপ্লবী সদস্যদের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সম্ভব করে তুলেছিল, অন্যদিকে কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকায়, বিপ্লবী সাফল্য ও জাতীয় জীবনকে গণতান্ত্রিক করার প্রক্রিয়ার ওপর প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের সুযোগও বর্তমান ছিল।

অধিকন্তু, আমাদের এ-বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, প্রধানত, এ এফ এম-এর ঐক্য যদি রক্ষা করা যেত, যদি সোশ্যালিস্ট পার্টি বৃহৎ পুঁজি ও লাটিফুণ্ডিয়ার মালিকদের স্বার্থ রক্ষা না করত এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ না হত, তাহলে গণতান্ত্রিক ক্ষমতা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারত এবং যে-সব প্রধান প্রধান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন কার্যকর করা হয়েছিল ও ১৯৭৬ সালের সংবিধানে যে-সব পরিবর্তনকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছিল, সে-সব পরিবর্তনের ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে বহুদিন আগেই সংহত করা যেত।

এ এফ এম'র মধ্যে ভাঙন, এম পি-র দক্ষিণপন্থী প্রবণতা ও এর ফলে

সংঘাত ও সংঘর্ষ ও "বামপন্থী" গোষ্ঠীগুলোর প্ররোচনা (রাস্তায় ও সেনাবাহিনীর মধ্যে) প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের পথ পরিষ্কার করেছিল, নতুন শাসনব্যবস্থার অস্থায়িত্ব বাড়িয়েছিল এবং নতুন নতুন বিপদের সৃষ্টি করেছিল।

১৯৭৫ সালের শেষদিকে বামপন্থী সামরিক বাহিনীর পরাজয় ও এর পরে এ এফ এম-র মধ্যে ভাঙনের ফলে দক্ষিণপন্থীদের অনুকূলে ভারসাম্যের যথেষ্ট পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছিল। যে-দক্ষিণপন্থী বেসামরিক গোষ্ঠী ও সামরিক কর্মচারীরা নয় জনের গোষ্ঠী ও এম পি-তে যোগ দেয় তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন পদ দখল করেছিল এবং যথেষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছিল।

এটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে কতকগুলো উপাদানের ফলে দক্ষিণ-পন্থীরা এত তাড়াতাড়ি ক্ষমতায় আসতে পারে নি ও এর পাশবিক রূপ ধারণ করে নি। প্রথমত, শ্রমিকশ্রেণীর ও জনগণের আন্দোলনের প্রকৃত শক্তির ফলে দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় আসতে পারে নি। দ্বিতীয়ত, "নরমপন্থী" সামরিক ও বহু সোশ্যালিস্ট এটা উপলব্ধি করেছিল যে চরম দক্ষিণপন্থার দিকে তাদের মিত্রদের বেশি সুযোগ-সুবিধা দিলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার গতি ব্যাহত হবে এবং তাদের নিজেদের পরাজয় ঘটবে।

এই রকম পরিস্থিতিতে ১৯৭৬ সালের ২রা এপ্রিল একটা নতুন সংবিধান গ্রহণ করা ও প্রকাশ করা সম্ভব হয় এবং বিপ্লবের প্রধান প্রধান সাফল্যকে চূড়ান্ত রূপ দান করা হয়। প্রজাতন্ত্রের সংসদের নির্বাচন দেরিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হয় এবং লোকসভায় পি সি পি-র এম পি-দের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০-এ দাঁড়ায়। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর ভিত্তি করে সরকার গঠন করা হোক পি সি পি এই দাবি তোলে। প্রতিক্রিয়াশীলদের বহু হিসাব সত্ত্বেও, এস পি ও দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলোর সমর্থন নিয়ে রাষ্ট্রপতির পদে জেনারেল ইয়েমেনের নির্বাচনও এই সুযোগ নষ্ট করতে পারে নি। এটা করা যায় নি প্রধানত এই কারণে যে এম পি-র নেতারা দক্ষিণপন্থীদের সাথে, বৃহৎ পুঁজিপতি ও ভূস্বামীবর্গের সাথে তাদের মৈত্রীর নীতি চালিয়ে যাওয়া পছন্দ করে; এই নীতি শ্রমজীবী জনগণ, বিপ্লবের সাফল্য ও সংবিধানে বিধিবদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত।

তখন থেকেই, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দুটো প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলোর ওপর ক্রমাগত আঘাত; এই আঘাত হানার ক্ষেত্রে পরপর কয়েকটি সরকার

বেশ সক্রিয় ছিল। অন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণের সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রাম, যা প্রতিক্রিয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে ও এপ্রিল মাসে অর্জিত সাফল্য রক্ষা করে।

পুঁজিবাদের অবস্থান ও লাটিফুণ্ডিয়া ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন এবং সাম্রাজ্যবাদ

১৯৭৫ সালে এ এফ এম ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সংঘাত যখন চরমে পৌঁছেছিল এবং ১৯৭৬-৭৭ সালে এম পি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন এম পি শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের সাথে, বামপন্থীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। পর্তুগালের বিপ্লবে এম পি-র ঐতিহাসিক দায়িত্ব ছিল বিপদাপন্ন পুঁজিবাদকে উদ্ধার করা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আঘাত করে প্রতিক্রিয়াশীলদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করা।

১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রীরূপে সরকার গঠন করে এম পি-র সাধারণ সম্পাদক মারিও সোয়ারেজ বলেন যে তিনি বামপন্থীদেরও পক্ষ নেবেন না, দক্ষিণপন্থীদেরও পক্ষ নেবেন না, এবং পার্লামেন্টে যদি সংখ্যা-গরিষ্ঠতা না-ও থাকে, তাহলেও তিনি একাই শাসন করবেন। বাস্তবে তিনি দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ নিলেন এবং এমন এক নীতি নিলেন যা কার্যত বৃহৎ পুঁজি, বৃহৎ ভূস্বামী ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করে।

এম পি সরকারের প্রধান প্রধান লক্ষ্য ছিল, সারা দেশকে যে সংকট গ্রাস করেছিল, সে সংকটের ফলাফল শ্রমজীবী জনগণের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া, ফ্যাক্টরি ও জমি তাদের পূর্বতন মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া এবং পুঁজিবাদী শোষণের ব্যবস্থা নতুন করে কায়েম করা। এম পি সরকার কৃষি সংস্কার, জাতীয়করণ ও শ্রমিকদের হাতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ২৫শে এপ্রিলের পর শ্রমজীবী জনগণ কর্তৃক অর্জিত অধিকারগুলোর ওপর আক্রমণ শুরু করে। সরকার মজুরি সংকোচন করে, মূল্য বৃদ্ধি করে এবং যে সব লাটিফুণ্ডিয়া-গুলো নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, পাশব শক্তি প্রয়োগ করে সে সব লাটি-ফুণ্ডিয়াগুলো তাদের মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়। যে-৮৬টি কারখানার পরিচালন ব্যবস্থায় সরকার অংশ গ্রহণ করেছিল, সেসব কারখানা তাদের আগের মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়; এরা অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মে লিপ্ত ছিল। সরকার রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য গণ-তন্ত্রীদের বিতাড়িত করে। সরকার এমন এক অর্থনৈতিক ও ফিনান্স নীতি

গ্রহণ করে যা বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের সেবা করে। এইভাবে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে সরকার ক্রমশ বিদেশী ঋণের আশ্রয় নেয়, এবং সোনা ও বিদেশী মুদ্রা নষ্ট করে এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের দাবি ও খবরদারির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

সর্বশেষে, ১৯৭৭ সালের গ্রীষ্মে এম পি পার্লামেন্টে এমন কতকগুলো আইন জোর করে প্রণয়ন করে, যা "প্রতিবিপ্লবী আইন" বলে পরিচিত। সরকার কমিউনিস্ট-বিরোধিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলোর সাথে সহযোগিতায় এই আইন প্রণয়ন করে। এইসব আইনের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কৃষি সংস্কার-বিরোধী আইন (যা ব্যারেটো আইন বলে পরিচিত), সরকারি উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী আইন (যে সব শিল্প ও উদ্যোগের জাতীয়করণ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ডিক্রি), ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইন (বৃহৎ পুঁজি ও ভূস্বামীদের শত শত বিলিয়ন এসকুডো দেওয়া হয়) এবং বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ সংক্রান্ত ডিক্রি (বিপ্লবের পরে বহুজাতিক সংস্থাগুলো যে-আধিপত্য হারিয়েছিল, তা তারা আবার এই ডিক্রির ফলে ফিরে পায়)।

সরকারের নীতি ব্যর্থ হওয়ার ফলে ১৯৭৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর এই সরকারের পতন ঘটে। এর ফলে পার্লামেন্টে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এক গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা সম্ভব হয়। পি সি পি এস পি-র সাথে সমঝোতা করার জন্য প্রচুর চেষ্টা চালায়; পার্টি কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখে, ধৈর্য সহকারে আলোচনা চালায় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া সৃষ্টি করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু এস পি নেতারা প্রতিক্রিয়ার সাথে মৈত্রীর ওপর নির্ভর করে এই চুক্তিকে শর্তসাপেক্ষ করে তোলে যে কমিউনিস্টদের কৃষিসংস্কার-বিরোধিতাকে মেনে নিতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে চরম দক্ষিণপন্থী পার্টি, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক কেন্দ্র (এস ডি সি) ও এস পি-র মধ্যে এক কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। কয়েক মাস ধরে এই সরকার সোশ্যালিস্টদের নীতি অনুসরণ করে, বিপ্লবের সাফল্যের ওপর আঘাত করতে থাকে এবং এইভাবে জাতীয় সমস্যাগুলো সমাধান করার অক্ষমতা প্রদর্শন করে।

যখনই দক্ষিণপন্থী ও সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পারল যে তারা এস পি-কে ছাড়া চলতে পারবে, সেই মুহূর্তে তারা কোয়ালিশন থেকে সরে এল এবং এস

পি-কে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করার জন্য ও খোলাখুলি এর প্রতিক্রিয়াশীল সরকার গঠন করার জন্য এক নতুন সরকারি সংকট ত্বরান্বিত করল। পি সি পি এ সম্পর্কে আগে থেকেই বলেছিল।

তথাপি তখনও এক গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা যেত। কিন্তু এস পি-র নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সংঘাতের ফলে এ-ধরনের সমাধান অসম্ভব ছিল।

এ ভাবে প্রথম মোবর ডা কোস্টা সরকার গঠিত হয় (আগস্ট ১৯৭৬) এবং বিধানসভা তা অগ্রাহ্য করে। তারপর মোটা পিন্টো সরকার গঠিত হয়; এই সরকার বিধানসভার অনুমোদন লাভ করে, কারণ পি সি পি সরকারের কর্মসূচীর প্রতি যে-অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল এস পি সে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

মোটা পিন্টো সরকার হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার। এর একটা লক্ষণ হচ্ছে এই যে, কৃষি মন্ত্রক ভূস্বামীবর্গের প্রতিনিধিদের হাতে ছিল ও কৃষি বিভাগের দায়িত্বে যে-সেক্রেটারি (ডেপুটি মন্ত্রী) ছিলেন তিনি হচ্ছেন একজন বৃহৎ ভূস্বামী যার জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং যিনি তার জমি ফেরত পাবার দাবি জানান, যদিও অবশ্য তার খুব কম জমিই চাষ করা হয়েছে। বর্তমানে এই সব জমি সমবায়ের (গ্যামবিয়া) মাধ্যমে চাষ করা হয়; এইসব সমবায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

সাধারণভাবে বললে, মোটা পিন্টো সরকার তার আগের সরকারগুলোর নীতির অনুরূপ নীতি অনুসরণ করে চলেছে। এই সরকারের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই সরকার অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী এবং প্রায়ই অসাংবিধানিক ও বেআইনী পদ্ধতি গ্রহণ করে।

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে-নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি হয়েছিল পুঁজিবাদ, লাটিফুণ্ডিয়া ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান পুনরুদ্ধারের নীতি তার বিরোধী এবং এই নীতি জনগণের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। এটা দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও জরুরী জাতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

জনগণকে জবরদস্তি করে যে কৃচ্ছ্রতাসাধন করানো হয়, তার কারণ হিসেবে বলা হয় যে, বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য ও সর্বোপরি ব্যবসা-বাণিজ্যের ভারসাম্য স্বাভাবিক করার জন্য এই কৃচ্ছ্রতার প্রয়োজন আছে। এর ফলাফল কী? ১৯৭৫ সালে বৈদেশিক বানিজ্যের

যে-ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ মিলিয়ন এসকুডোস, সেই পরিমাণ ১৯৭৬ সালে গিয়ে দাঁড়ায় ৭৩,০০০ মিলিয়ন এসকুডোস, ১৯৭৭ সালে ১১২,০০০ মিলিয়ন এসকুডোস ও ১৯৭৮ সালে ১৩০,০০০ থেকে ১৪০,০০০ মিলিয়ন এসকুডোসে গিয়ে দাঁড়ায়। বৈদেশিক ঋণ খুব দ্রুত বাড়ছে এবং প্রায় ২৫০,০০০ মিলিয়ন এসকুডোসে গিয়ে পৌঁছেছে—অর্থাৎ বছরে বেড়েছে ২৫,০০০ মিলিয়ন, এর অর্ধেকটাই হচ্ছে সুদ।

আই এম এফ-এর নীতি হচ্ছে পর্তুগীজ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে বাধা দেওয়া। এর ফল দাঁড়িয়েছে যে জাতীয় উৎপাদনের বিকাশের হার ৩ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, প্রকৃত মজুরির সংকোচন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এসকুডোস-এর অবমূল্যায়ন ঘটেছে, এবং সুদের হার অত্যধিক বেড়েছে (২০ শতাংশেরও বেশি)। এসবের ফলে শত শত ছোট ও মাঝারি শিল্পপতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আমদানি বাড়ছে; এর সাথে যুক্ত হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি। এই ঘাটতি জাতীয় উৎপাদনের অচল অবস্থাকে গভীরতর করেছে।

এখন এটা পরিষ্কার যে বারোয়ারি বাজারে পর্তুগালের প্রবেশ হচ্ছে একটা প্রধান রাজনৈতিক চাল, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বারোয়ারি বাজারের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশে অর্থনৈতিক কাঠামো ও শ্রম আইনকে ঐক্যবদ্ধ করার অজুহাতে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির পুনরুজ্জীবন ঘটানো। এ সম্পর্কে পি সি পি আগেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল। প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের কিছু কিছু মুখপাত্র এতদূর পর্যন্ত দাবি করে যে বারোয়ারি বাজারে প্রবেশ করতে হলে পর্তুগীজ সংবিধানের অসংবিধানিক সংশোধন প্রয়োজন ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটেছিল, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাছে জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে।

পর্তুগালের জনগণ সাহসিকতার সাথে তাদের স্বাধীনতা ও অধিকার ও বিপ্লবের অন্যান্য সাফল্য রক্ষা করার জন্য তাদের প্রতিদিনের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের জীবনধারণের মান বজায় রাখতে ও উন্নত করতে সর্বদা লড়াই করে। প্রতিক্রিয়াশীল ও সরকারের হিংস্র আক্রমণ সত্ত্বেও শ্রমজীবী জনগণ ৫০০-এর বেশি সি পি ইউ ও সমবায়ের মধ্যে সংগঠিত হয়ে এক মিলিয়ন হেক্টার জমিতে স্বাধীনভাবে চাষ করে এবং এই সংখ্যা সমগ্র দখলিকৃত ও সরকারের বাজেয়াপ্ত করা জমির ৮০ শতাংশেরও বেশি।

জনগণ ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো কোনো রাষ্ট্রীয় শিল্পকে ব্যক্তি-মালিকানায় ফিরিয়ে দিতে বাধা দিয়েছে। জনগণ বহু শিল্পের পরিচালন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে। সরকারের হিংস্রতা, স্বৈরাচারিতা ও বেআইনী কাজকর্ম এবং নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব করার প্রচেষ্টার সম্মুখীন হয়ে জনগণ প্রতিদিন এইসব অধিকার প্রয়োগ করে।

আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়াশীলেরা নয়, শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও বিশ্ব-সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানগুলো পর্তুগালের তরুণ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এপ্রিল বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে ও বলপূর্বক এর সাফল্যগুলোর অবসান ঘটানো হচ্ছে বা অস্বীকার করা হচ্ছে। কিন্তু পর্তুগালের বাস্তব অবস্থায় এইসব সাফল্যের অস্তিত্ব রয়েছে এবং জনগণ এই সব সাফল্য এগিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ

যাইহোক, জনগণ শীঘ্রই নতুন নতুন বাধা, অসুবিধা ও বিপদের সম্মুখীন হবে।

সম্প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ সরাসরি বা সমস্ত ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিপদাপন্ন না করে বৃহৎ পুঁজি, লাটিফুণ্ডিয়ার মালিক ও সাম্রাজ্য-বাদের অবস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য তাদের অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

জরুরী জাতীয় সমস্যাগুলো সমাধান করতে প্রতিক্রিয়ার অক্ষমতা, গণআন্দোলন ও গণপ্রতিরোধের শক্তি, পুঁজিবাদের পুনরুদ্ধারের পক্ষে যারা ওকালতি করে তাদের শ্লথ ও সীমাবদ্ধ সাফল্য, এবং বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তন অসম্ভব, এসবের ফলে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হচ্ছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের লক্ষ্যকে আগের চেয়ে আরো স্পষ্ট করেছে—তারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ও নতুন একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একচেটিয়াপুঁজি (সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুক্ত) ও লাটিফুণ্ডিয়ার মালিকদের ক্ষমতার পুনরুদ্ধার চায়।

মোটা পিন্টো সরকার যে-সব লক্ষ্য অনুসরণ করে সে-সব লক্ষ্যের মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সর্বাত্মক আক্রমণ পরিস্ফুট (এই আক্রমণের সাথে সরকারের নীতি ও কাজকর্ম বেশ খাপ খায়)। ২৫শে

এপ্রিলের আগে যে-ধরনের বর্বর পুঁজিবাদী শোষণের অস্তিত্ব ছিল বৃহৎ, পুঁজিপতি ও সরকার প্রকৃত মজুরি হ্রাস করে ও জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধি করে, ব্যাপক ছাঁটাইয়ের আশ্রয় নিয়ে (এই দেশে ৪০০,০০০-এর বেশি মানুষ কর্মহীন রয়েছে) ও বহু কলকারখানায় নিপীড়নমূলক পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন করে সেই ধরনের বর্বরতা আবার কায়েম করতে চায়।

বেআইনী কাজকর্ম, স্বৈরাচারী শাসন, কৃষি সংস্কারগুলোর লঙ্ঘন ইত্যাদি আগের চেয়ে আরো বেশি ঘটছে। সরকার তাড়াতাড়ি করে শিল্প ও জমি তাদের মালিকদের অর্থাৎ পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের হাতে আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে। তাদের কোটি কোটি এসকুডো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। যেসব শিল্পে সরকারের অংশগ্রহণ রয়েছে ও যেসব শিল্পে রাষ্ট্রের মালিকানা বেশি, সেসব শিল্প সংবিধানবিরোধীভাবে পুঁজিপতিদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি চলছে। মূল্য, ঋণ ও কর সম্পর্কিত নীতির লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয়করণ করা শিল্প ও সমবায় শিল্পে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিবাদী শিল্পে ফিরিয়ে দেওয়া। পুঁজির সঞ্চয়, কেন্দ্রীভবন ও কেন্দ্রীকরণের হার ক্রমশ বাড়ছে।

ক্রমশই রাষ্ট্রযন্ত্র, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণপ্রচার মাধ্যম ও অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থাকে মুক্ত করার সাথে সাথে বেশি বেশি করে গণতন্ত্রীদের বরখাস্ত করা হচ্ছে (বর্তমানে সোশ্যালিস্টদের সম্পর্কে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে)। ফ্যাসিস্ত ও প্রতিক্রিয়াশীলদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হচ্ছে।

বিপ্লবী পরিষদ ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, সামরিক ব্যক্তিদের সরিয়ে দেওয়ার ও এক নতুন সামরিক পর্ষদ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সামরিক বাহিনীতে অস্থায়ী অবস্থা সৃষ্টি করার অভিযান চালানো হচ্ছে। ২৫শে এপ্রিলের ঘটনাবলীতে এই সব সামরিক ব্যক্তি খুব সক্রিয় ছিল, এবং নতুন সামরিক পর্ষদ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একচেটিয়া পুঁজি ও ভূস্বামীবর্গের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনরুদ্ধারকে সুনিশ্চিত করবে। অধিকন্তু, প্রতিক্রিয়াশীলেরা সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারোয়ারি বাজার ও নাটোর ওপর পর্তুগালের কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট, যাতে পর্তুগালের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন করে বাইরে থেকে অধিকতর চাপ ও হস্তক্ষেপ সৃষ্টি করা যায়।

প্রতিক্রিয়াশীলেরা এ-বিষয়ে সচেতন যে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলোর চৌহদ্দির মধ্যে জনগণের সাফল্য নষ্ট করা খুব কঠিন। এর ফলে, সরকারি

নীতির ক্ষেত্রে সংবিধান-বিরোধী ও বেআইনী পদ্ধতি প্রয়োগ করতে প্রতিক্রিয়া বাধ্য হচ্ছে। অবাধ নির্বাচনের পরিবর্তে এক প্রহসন সৃষ্টির প্রয়োজনে একটা ব্যবস্থা নেবার পরিকল্পনা এরা করছে। এই জন্যই, এরা সংবিধানের অসংবিধানিক সংশোধনের জন্য অভিযান চালাচ্ছে; এই সংশোধন হবে এক ক্যু-এর শামিল।

বস্তুত, সংবিধানই সংশোধনের শর্ত, পদ্ধতি ও সীমা স্থির করেছে। ১৯৮০ সালে যে-বিধান পরিষদ নির্বাচিত, সেই পরিষদই এই সংবিধান সংশোধন করতে পারে। যে-কোনো প্রস্তাবিত সংশোধনীকে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা-গরিষ্ঠের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। এ ছাড়াও, আরও অনেক মৌলিক বিষয় রয়েছে (জাতীয়করণ, কৃষি সংস্কার, শ্রমজীবী জনগণের অধিকার, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি)। এই সব বিষয় সংশোধনের আওতার বাইরে।

প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই যুক্তি দেয় যে কমিউনিস্টরাই সংবিধানের ওপর ভোট দেওয়া "জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে"। তারা সংশোধনের সীমারেখা ও দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংক্রান্ত শর্তের বিরোধিতা করে এবং ঘোষণা করে যে সমস্ত অ-পুঁজিবাদী কাঠামো নির্মূল করে সংবিধানকে সংশোধন করাটাই হচ্ছে বারোয়ারি বাজারে সদস্যপদ লাভের এক শর্ত। তারা দাবি করে যে ১৯৮০ সালে বিধানসভা নির্বাচন করে সংবিধান সংশোধন করা যাবে না; অসাংবিধানিকভাবে গণভোট, এমনকি ক্যু-এর মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

এ-সব থেকে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে প্রতিক্রিয়ার এই নতুন আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটানো। প্রতিক্রিয়া যা চাইছে তা জাতীয় সমস্যাগুলোর সমাধান নয়, তা হচ্ছে ক্ষমতা দখল করা ও যে-শোষণ ও নিপীড়নের ব্যবস্থা ২৫শে এপ্রিলের আগে বলবৎ ছিল তা পুনরায় চাপিয়ে দেওয়া।

পি সি পি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করার বাস্তব পথের প্রস্তাব দেয়। পার্টি প্রধানত অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য জাতীয় দেশপ্রেমিক প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়-তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং সেই সঙ্গে বিপ্লবজাত বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাঠামো রক্ষা করার ওপরেও গুরুত্ব দেয়। বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য পার্টি এক গণতান্ত্রিক বিকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা তুলে

ধরে ; এই বিকল্প হচ্ছে এক গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা, যা এক গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করবে।

গণতন্ত্রের শক্তিসমূহ

গত ১৫ই জানুয়ারি পি সি পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে গণতান্ত্রিক সংস্থাকে বিপদাপন্ন করে তোলার নতুন নতুন বিপদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই অধিবেশনে এই প্রত্যয় ব্যক্ত হয় যে জনগণই প্রতিক্রিয়াশীলদের পথ বন্ধ করতে পারে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশকে সুনিশ্চিত করতে পারে।

পি সি পি এই বিষয়ে জোর দেয় যে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ, বিপ্লবের সাফল্য ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষা করার সংগ্রাম বর্তমান সংস্থা ও ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যেই পরিচালনা করতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীলেরাই রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার, শৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক বৈধতা লঙ্ঘন করার ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম চালাবার প্রচেষ্টায় অসাংবিধানিক পদ্ধতি ব্যবহার করছে। সাংবিধানিক বৈধতা, গণতান্ত্রিক সংস্থা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষা করার মধ্যে পর্তুগালের জনগণের স্বার্থ নিহিত আছে।

বর্তমানে শ্রমজীবী জনগণ ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সংগ্রাম তিনটি প্রধান প্রধান খাতে বয়ে চলেছে।

প্রথম হচ্ছে গণ-সংগ্রাম (সমাবেশ, বিক্ষোভ প্রদর্শন, ধর্মঘট ও অন্যান্য বড় সংগ্রাম)। এই সংগ্রাম হচ্ছে জনগণের ইচ্ছার সর্বোত্তম অভিব্যক্তি। জনগণ নিশ্চিতভাবেই সর্বোচ্চ জঙ্গীপনা প্রদর্শন করছে। উদাহরণস্বরূপ, ২৪শে জানুয়ারি সি পি ইউ এস-এর সদস্যবৃন্দ, সমবায় ও শিল্প-শ্রমিকরা, কৃষিমন্ত্রী যে-সব বেআইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগ্রামে ও কৃষি-সংস্কারের সাথে সংহতি জানাবার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে। শত শত কারখানার কাজ বন্ধ করা হয়েছে, এবং ৩২টি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে ; এইসব সমাবেশে ২ লক্ষেরও বেশি ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছে ; অংশগ্রহণ করেছে ৩০০টি ট্রেড ইউনিয়ন, শত শত শ্রমিক কমিশন, বহু কৃষক সংগঠন ও ১৫০টি ঐক্য সংগঠন।

দ্বিতীয় হচ্ছে সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সংগ্রাম বা তাদের প্রতি আবেদন। বিধান পরিষদে পি সি পি-র ৪০জন এম পি খসড়া আইনের

প্রস্তাব দেয়, এসব আইনের লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমের স্বার্থ, স্বাধীনতা ও বিপ্লবের অন্যান্য ফলাফল ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। এই ৪০ জন এম পি গণতান্ত্রিক আইনের অনুমোদন পাবার জন্য এস পি-র পার্লামেন্টারিগোষ্ঠীর সাথে এক চুক্তি করতে চায়। এইসব কাজের অন্যতম হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ও বিপ্লবী পরিষদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা ও সরকারের কাছে আবেদন ও প্রশ্ন করা। স্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলোতে (মিউনিসিপ্যালিটি) পি সি পি-র সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে এবং ৩৮টি শহরে চেয়ারম্যানের পদ ও অন্যান্য শহরে আরো কিছু পদ তারা দখল করে আছে। এই ঘটনা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় হচ্ছে জাতীয় সমস্যাগুলোর সমাধানে শ্রমজীবী জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। সি পি ইউ ও কৃষি সংস্কারের এলাকাভুক্ত সমবায়গুলোতে শ্রমজীবী জনগণ, সরকারের বর্বর আক্রমণ সত্ত্বেও, কৃষি উৎপাদন, গবাদিপশুর সংখ্যা বাড়াতে, উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ উন্নত করতে ও বেশি করে বিক্রি করতে সত্যিকারের বীরের মতো পরিশ্রম করছে। যেসব শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়েছে, সেসব শিল্পে ও শিল্প-সমবায়গুলোতে ও যেসব শিল্প শ্রমিকদের পরিচালন ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে, সেসব শিল্পে শ্রমজীবী জনগণ কর্ম-তৎপরতা ও উন্নত উৎপাদনের হার সুনিশ্চিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। বহু মিউনিসিপ্যালিটিতে, পরিচালন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে কাজ করছে এবং জল সরবরাহ, ময়লা পরিষ্কার, আবর্জনা দূর করার ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় নির্মাণ করা ও খেলাধূলার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধান করছে।

বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পর্তুগীজ জনগণ বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পথ হিসেবে এক গণতান্ত্রিক বিকল্পের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে। ১৯৮০ সালে সাধারণ নির্বাচন হবে। মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটা পরিষ্কার হবে এবং পি সি পি এই মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচন চায়।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকারের উপনির্বাচনে এস পি-র খ্যাতি দ্রুত নেমে গেছে এবং পি সি পি-র যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। বিশেষ করে, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ১৯শে নভেম্বর কৃষিসংস্কারের অঞ্চলে বৃহত্তম শহর ইভোরা-তে পৌর সভার নির্বাচন। এই নির্বাচনে কমিউনিস্টদের সমর্থিত

তালিকা চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা, অর্থাৎ ৫৩ শতাংশ ভোট পায় ; ১৯৭৬ সালে এই তালিকা ৪১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল।

পি সি পি মনে করে যে আসন্ন নির্বাচনগুলোতে প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি-গুলোকে পরাস্ত করা যেতে পারে এবং কমিউনিস্টরা বেশি সংখ্যায় নির্বাচিত হলে এক গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের জন্য আরো অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যেতে পারে।

যাই ঘটুক না কেন, শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলনের সংগঠিত শক্তি, উন্নত অভিজ্ঞতা ও উন্নত নৈতিক শৃঙ্খলা থাকলে গণতান্ত্রিক পর্তুগাল সম্পর্কে এক আশাবাদী মূল্যায়ন করা যায়।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সি জি টি পি এন আই*-এর সাথে ঐক্যবদ্ধ ; এই সি জি টি পি হচ্ছে এক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন যার এক বিরাট বিপ্লবী ঐতিহ্য আছে।

সম্প্রতি এস পি-র সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলো এক নতুন প্রচারাভিযান পরিচালনা করছে ; এর পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও এফ আর জি প্রচুর অর্থব্যয় করছে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ভাঙন ধরানো ও এক নতুন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র দি জেনারেল ইউনিয়ন অব ওয়ার্কার্স প্রতিষ্ঠা করা। এই বিভেদাত্মক কার্যকলাপকে যারা সমর্থন করছে তাদের তথাকথিত কংগ্রেস হচ্ছে গণতন্ত্র থেকে বিচ্যুতির এবং এস ডি পি, এস পি ও এস ডি সি ও বড় বড় মালিকদের শ্রেণী সংগঠন—কনফেডারেশন অব পর্তুগীজ ইণ্ডাস্ট্রি, কনফেডারেশন অব পর্তুগীজ এগ্রিকালচার ও কনফেডারেশন অব পর্তুগীজ ট্রেড—এদের তরফ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দখল করার এক জঘন্য উদাহরণ। কিছু কিছু ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক পার্টি—এস ডি পি, এস পি ও এস ডি সি-দ্বারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের নেতৃত্বই "প্রতিনিধি" নিয়োগ করছে। ম্যারিও সোয়ারেজ, প্রতিক্রিয়াশীল এস ডি পি নেতা, সা কারনিয়েরো, এবং উগ্র দক্ষিণপন্থী এস ডি সি-র প্রতিনিধি, এ্যামারো ডা কোস্টা এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে ; এই তিনটি পার্টি পরস্পরের পাশে রয়েছে। ফ্যাসিস্ত ও প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র ও মালিকরা এই কংগ্রেসকে তাদের সমর্থন জানাচ্ছে। কিন্তু, এই সময়েও তারা কোনো নতুন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি।

---

* জেনারেল কনফেডারেশন অব পর্তুগীজ ওয়ার্কার্স—ন্যাশন্যাল ইন্টার-সিনডিক্যাল,—সম্পাদক।

সি জি টি পি-এন আই হচ্ছে পর্তুগালের বৃহত্তম ফেডারেশন ; এই ফেডারেশনে ৩৪৮টি ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে ২৭৭টি ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ। দেশের দুই মিলিয়ন ইউনিয়ন সদস্যদের মধ্যে ১·৭ মিলিয়ন সদস্য এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত।

কৃষক আন্দোলন, বিশেষ করে যেখানে ছোট কৃষি উৎপাদনের অস্তিত্ব রয়েছে, সেখানে খুব দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। এই আন্দোলনের ফলে, বড় বড় মালিকের স্বার্থ রক্ষা করার নীতিকে শুধুমাত্র প্রতিহত করাই নয়, বহু ক্ষেত্রে যে-সব অঞ্চলে প্রতিক্রিয়াশীলেরা ২৫শে এপ্রিলের পরেও তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে এবং আবহাওয়া ছিল গণতন্ত্র বিরোধী, সে-সব অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে।

ইউনিটি ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন (বিশেষ করে, কলকারখানায় শ্রমিকদের কমিশন, ও আবাসিন অঞ্চলে ভাড়াটেদের কমিশন), শ্রমজীবী যুবক, ছাত্র, নারী, বুদ্ধিজীবী, প্রযুক্তিবিদ, মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়ী ও উৎপাদক, বৃত্তিভোগী, অসুস্থ ব্যক্তি, এদের সবার আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রামের সাথে যুক্ত হচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক বিরাট, সংগঠিত সামাজিক ভিত্তি রচনা করছে।

বর্তমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো যখন সরকারে, রাষ্ট্রযন্ত্রে, জাতীয় অর্থনীতিতে ও গণপ্রচার মাধ্যমে তাদের অবস্থান পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করছে (সাময়িকভাবে সাফল্যলাভও করছে), তখন শ্রমিক ও গণআন্দোলন তার সংগঠন ও প্রভাব শক্তিশালী করছে এবং তার গণপ্রচার মাধ্যম সৃষ্টি করছে এবং এ ক্ষেত্রে পি সি পি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পার্টি সমগ্র গণ-আন্দোলনে ও বিপ্লবের সাফল্য, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করার সংগ্রামে এক অপূর্ব, অপরিহার্য ও চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করছে। সপ্তম কংগ্রেসের সময় (অক্টোবর, ১৯৭৪) পি সি পি-র সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০, ০০০ ; অষ্টম কংগ্রেসের সময় (নভেম্বর, ১৯৭৬)-এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১১৫, ০০০ এবং ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে এই সংখ্যা হল ১৪২, ৫১২ ; যদিও কমিউনিস্ট ইয়ুথ লীগের ৩০, ০০০ সদস্য এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। ১৯৭৯ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য নবম কংগ্রেসের সময় এর সদস্য সংখ্যা আরো বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পি সি পি-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভা ও সমাবেশে বহু সংখ্যক জনগণ

যোগ দেয়। এই সভা ও সমাবেশকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকার ও রাষ্ট্রের কোনো কোনো বিভাগ আমাদের পার্টিকে বড় বড় হলঘর ব্যবহার করতে অনুমতি দেয় না। এর ফলে পার্টির সভা, সমাবেশ, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সম্মেলন সংগঠিত করতে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। । পর্তুগালের সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিলোর মধ্যে পি সি পি হচ্ছে একমাত্র বড় পার্টি যে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ, বিপ্লবের সাফল্য, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ও জাতীয় স্বাধীনতার নীতিকে ঊর্ধে তুলে ধরে।

পি সি পি শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে নেতৃত্বে দেয়, সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য; পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমস্ত গণতন্ত্রী ও দেশপ্রেমিকের মধ্যে সংগ্রামের ঐক্য বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চালায়। এর ফলে, প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ ও তাদের পরিকল্পনার রূপায়ণ, বিশেষ করে সংবিধানের অসাংবিধানিক সংশোধনের পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

এই জন্যই কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে; এই সব প্রচার নিকৃষ্ট মিথ্যা কুৎসা ছড়াচ্ছে এবং এই দাবি তুলছে যে পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করা হোক, নিয়ন্ত্রণ করা হোক বা নিষিদ্ধ করা হোক। কিন্তু কেউই পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কারণ এ হচ্ছে দেশের একটা প্রধান পার্টি। এর পথ-প্রদর্শক মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, প্রতিটি সংগঠন ও প্রতিটি সদস্যের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে এ গভীরভাবে যুক্ত। পার্টি পর্তুগীজ গণতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এটা স্লোগান নয়, এ হচ্ছে ঘটনার বিবৃতি যে পি সি পি হচ্ছে সত্য, আশা ও ভবিষ্যতের পার্টি।

শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ, বিপ্লবের সাফল্য, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম যে-মহান দায়িত্ব পর্তুগালের কমিউনিস্টদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে তা তারা উপলব্ধি করে। তাদের প্রতি শ্রমজীবী জনগণ ও জনগণের অন্যান্য অংশের যে-আস্থা সেই আস্থা থেকে, এবং বিশ্বের শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ রক্ষার সংগ্রাম থেকে যে-মহান দায়িত্ব সৃষ্টি হয়েছে তা তারা উপলব্ধি করে।

কমিউনিস্টরা তাদের পার্টির গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই বিশ্বাস বজায় রাখতে ও এটা সুনিশ্চিত করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবে না যে, পর্তুগাল সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠবে ও এপ্রিল বিপ্লব যে-পথ খুলে দিয়েছে সেই পথ ধরে, অর্থাৎ গণতন্ত্রের পথ ধরে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলবে।

গণ-বিপ্লবে নতুন জোয়ার

নুরুদ্দিন কিয়ানৌরি
ইরানের পিপল্‌স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক

ইরানের যে-গণবিপ্লব ১৯৭৯-এর ১০ ও ১১ ফেবরুয়ারির বিজয়ী অভ্যুত্থানে পরিণতি লাভ করেছে তার গুরুত্ব শুধু এই ঘটনাটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যে, ইরানের সমাজকে এ পালটে দিয়েছে এবং ঘৃণ্য স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেছে। যে-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরানকে মধ্য-প্রাচ্যে তার বশংবদ বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করছিল, তার বিরুদ্ধেও এ একটা কঠিন আঘাত। সেই কারণেই ইরানীয় বিপ্লবের ফলাফল অনিবার্যভাবেই আমাদের দেশের, এমনকি আমাদের এই অঞ্চলের সীমান্তের বাইরেও অনুভূত হবে।

আমাদের বিপ্লবের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর সত্যিকারের গণ-চরিত্র। যে-সব বৃহৎ পুঁজিপতি ও জমিদারদের একটা ক্ষুদ্র অংশ এবং মুষ্টিমেয় রাজনীতিবিদ শাহী শাসনকে রক্ষা করতে চেয়েছিল তাদের অবস্থান ছিল বিপক্ষ শিবিরে। আক্ষরিকভাবেই সমগ্র জনগণ শাহীতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল শ্রমিকশ্রেণী, শহরের মধ্য-বর্গের লোকেরা, কৃষক ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী।

এইসব শ্রেণী ও অংশ বিপ্লবের এই রণধ্বনির পক্ষে সমবেত হয়েছিল: রাজতন্ত্রের অবসান এবং ঐস্লামিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (ধর্মীয় নেতারা যে-কর্মসূচী পেশ করেন সেটা ছিল স্পষ্টতই গণতান্ত্রিক); রাজনৈতিক, সামরিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থেকে সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার উচ্ছেদ; সাম্রাজ্যবাদ রচিত সামরিক চুক্তিগুলি থেকে ইরানের পদত্যাগ, মার্কিন সামরিক, উপদেষ্টাদের বহিষ্কার এবং শাহের বিপুল সামরিক অর্ডার বাতিল করা; দেশের প্রধান সম্পদ তেলকে আন্তর্জাতিক সংস্থার কব্জা থেকে মুক্ত করা; শাহ ও জল্লাদ চক্রের শাস্তি, শাহ, তার পরিবার এবং জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি।

এই সব লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম পুরো এক বছর ধরে চলেছে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ইরানের বিপ্লব রূপ লাভ করেছে, শক্তি অর্জন করেছে ও বেগবান হয়ে উঠেছে।

এখন অনেক বিদেশী প্রশ্ন করছেন, ২৫ বছর ধরে প্রগতিশীল শক্তিগুলির উপর হিংস্রতম সন্ত্রাস ও নির্মম নিপীড়ন চালানো সত্ত্বেও ইরানের বিপ্লবী আন্দোলন এত কম সময়ের মধ্যে এমন দুর্বার গতিতে এগিয়ে গেল কী করে এবং কী করেই-বা এমন বিস্ফোরক হয়ে উঠল যাকে নিপীড়ন চালিয়েও স্তব্ধ করা গেল না?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে প্রথমেই ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করতে হয়। এই শতাব্দীতে ইরানের জনগণ বারবার শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে জ্বলে উঠেছে। ১৯০৬-১৯১১-তে ইরানীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ বিরোধ তীক্ষ্ণতর হওয়ার ফলে এবং রুশ বিপ্লবের প্রভাবে এটা ঘটে। বিশের দশকে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তরুণ সোভিয়েত দেশের বন্ধুত্বের সাহায্যে ইরান ১৯১৯ সালের অসম চুক্তি রদ করতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সারা দেশ জুড়ে মুক্তি সংগ্রামের তরঙ্গ বয়ে যায় এবং ১৯৪৫-এ ইরানের আজারবাইজান ও কুর্দিস্তানে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী অভ্যুত্থান দেখা দেয়। পরবর্তীকালে শাহ এটাকে দমন করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের অভিব্যক্তি ঘটে মোসাদেক সরকারের তেল-শিল্প জাতীয়করণের মধ্যে। বর্তমানের এই পঞ্চম বিপ্লবী তরঙ্গ আগেকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্যকে বহন করছে। কিন্তু এর মধ্যে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

বিগত ২৫ বছরে শাহ ও সাম্রাজ্যবাদীরা এমনভাবে ইরানের উপর লুঠপাট চালিয়েছে যার নজির মেলা ভার। জনগণের মধ্যে অসন্তোষ যখনই ফেটে পড়েছে তখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের গুপ্ত বাহিনীর প্রতিষ্ঠিত সাভাক ও গুপ্ত পুলিস নির্মমভাবে তা দমন করেছে। কিন্তু সন্ত্রাসের প্রতিটি ঘটনাই জনগণের মধ্যে তাদের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ঘৃণার ইন্ধন যুগিয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে বিস্ফোরণের শক্তি।

তেল থেকে দেশের বিপুল আয় হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণের মাত্রা ছিল প্রচণ্ড রকম চড়া এবং শ্রমিকরা ক্রমশই বেশি বেশি করে ধর্মঘটের আশ্রয় নিচ্ছিল। আর সরকার পক্ষ বর্বরভাবে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতো। কৃষকদের মধ্যেও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছিল। শাহের নীতি ইরানের কৃষিতে বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসে এবং কৃষির বিপর্যয় ঘটে। "শ্বেত বিপ্লবের" বহু বিজ্ঞাপিত উপকারিতা ভুয়ো বলে

প্রমাণিত হয়েছে, কৃষকদের জীবন যাত্রার মান আরও নেমে গিয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ গ্রামের মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছে। গত দুই তিন বছরে কৃষকরা বেশি বেশি করে শহরের দিকে ছুটেছে। সেখানে এরা বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে মাত্র।

অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ক্রমশই বেশি বেশি অর্থ ঢেলে শাহ যে আর্থিক নীতি অনুসরণ করছিল গত কয়েক বছর ধরে তার ফল হয়েছে গভীর আর্থনীতিক সংকট। বিগত পাঁচ বছরে তেল থেকে আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ শো বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৩৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয়িত হয়েছে প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে অস্ত্র কেনার কাজে।* ২৬ বিলিয়ন ডলার এই সব দেশের 'সিকিউরিটি'তে বিনিয়োগ করা হয়েছে অথবা ব্রিটেন এবং মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে সাহায্য করার কাজে লেগেছে। বাকি ৩৬ বিলিয়ন ডলারের একটা বড়ো অংশ দুর্নীতিপরায়ণ শাসকরা ও প্রবীণ সরকারি অফিসার গোষ্ঠী অপহরণ করেছে এবং সেই অপহৃত অর্থ ব্যক্তিগত নামে বিদেশী ব্যাংকগুলিতে জমা রাখা হয়েছে। ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে বিভিন্ন ব্যক্তি বছরে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার করেছে।

আর্থনীতিক সংকটের ফলে এবং শাসকচক্র ও বিদেশী একচেটিয়ারা যেভাবে দেশে লুঠতরাজ চালিয়েছে সেটাও চিরাচরিত ব্যবসায়ীশ্রেণীকে যাদের প্রায়ই "বাজার" আখ্যা দেওয়া হয়, যথেষ্ট পরিমাণে বিক্ষুব্ধ করেছে। শাহ অস্ত্র কেনার ব্যাপারটা কখনও ছাড়তে চায় নি এবং এর বোঝা চাপাতে চেয়েছিল জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীশ্রেণীর উপর। এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র কেনাতে "বাজারের" কোনো লাভ ছিল না। যে-স্বৈরতান্ত্রিক শাসন এবং সর্বশক্তিমান সাভাক জাতীয় বুর্জোয়াদের দোহন করার কাজে রাষ্ট্রকে মদত দিচ্ছিল, "বাজার" তার বিরুদ্ধেও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গক্রমে এটা মনে রাখা দরকার ইরানের এই "বাজার" আগেকার বিপ্লবী আন্দোলনগুলিতে অংশ নিয়েছিল।

এসবের ফলে ইরানে রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, ও সামাজিক নির্যাতন একসঙ্গে মিশে গিয়েছিল; আর এটাই বিপ্লবের প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে।

---

* আয়াতুল্লা খোমেইনি সম্প্রতি জানিয়েছেন শাহ জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অস্ত্র কেনার জন্যে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘাঁটি গড়ে তোলার কাজে তেলের আয়কে ব্যবহার করেছে।

কিন্তু গণ-আন্দোলনের মধ্যে যে-ধর্মীয় ব্যঞ্জনা ছিল, সেটাও একটা এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এর পেছনে বিষয়গত ও বিষয়ীগত কারণ আছে।

প্রথমত, ইরানে ইসলামের প্রধান শাখাটি শিয়া সম্প্রদায়ের। বরাবরই এদের বিপ্লবী ও গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। দেশপ্রেমিক শিয়াপন্থী মোল্লারা বারবার বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নিয়েছে এবং ১৯০৬-১৯১১ সালের বিপ্লবে তাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

দ্বিতীয়ত, বিগত ২৫ বছরে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র যখন গুপ্ত বিপ্লবী গোষ্ঠী-গুলিকে তাড়া করে বেড়িয়েছে এবং শাহ-বিরোধীদের গ্রেপ্তার করে জেলখানা ভরিয়ে তুলেছে (সাভাক-এর নির্যাতনের ফলে এরা মারাও গিয়েছে), তখন মসজিদগুলিই ছিল একমাত্র আশ্রয়স্থল। শাহ খোলাখুলিভাবে এর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে সাহস পায় নি। দেশপ্রেমিক ঐস্লামিক গোষ্ঠী জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে পেরেছিল এবং স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দাবি তারা ছড়িয়েছিল। জনসাধারণ এই সব দাবির প্রতি ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়।

১৯৭৮-৭৯-তে ইরানের গণ-বিপ্লব তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে।

প্রথম পর্যায়টি হল, সেই সময় যখন গণ-অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছিল একটা ব্যাপক ও উত্তাল বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে। আন্দোলন যত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, শাহ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ততই নানা রকম কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল। এমন একটা ভান করছিল যে তারা সুযোগ-সুবিধা দিতে প্রস্তুত এবং সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাও তারা মেনে নেবে। শারিফ এমামির সরকার এই খেলাই খেলছিল। কিন্তু এটা ছিল কালক্ষেপের, শক্তি সংগ্রহের এবং আঘাত হানার কৌশল। ১৯৭৮-এর ৮ই সেপ্টেম্বর দেশের গণবিক্ষোভকারীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একমাত্র তেহ্‌রানেই ৪ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়। শাহ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেবেছিল এর ফলে গণ-আন্দোলনের "চৈতন্য হবে" এবং তারা সরকারের সঙ্গে একটা "আপসে আসার" জন্যে আন্দোলনের উপর চাপ দেয়।

এর ফলে গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের অনেক দক্ষিণপন্থী নেতা ভয় পায় এবং আপসমূলক কার্যক্রমের মনোভাব দেখায়। কিন্তু বিপুল সংখ্যক মানুষ, বিপ্লবী সংস্থাগুলি এবং আয়াতুল্লা খোমেইনি-র অনুগামীরা তাদের বিপ্লবী অবস্থান বজায় রাখে। অল্প দিনের মধ্যেই দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়, সমস্ত মেহনতী মানুষ অংশ গ্রহণ করে শক্তিশালী ধর্মঘট আন্দোলনে।

এদের মধ্যে ছিল শ্রমিক, সরকারি আমলা, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও স্কুলের ছেলে-মেয়ে। শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই আন্দোলন একটা রাজনৈতিক খাতে প্রবাহিত হয়। এর মধ্যে শিল্প-শ্রমিকের নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল।

ইরানে এখন শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা ৩০ লক্ষের বেশি এবং এরা সংগঠিত ও রাজনীতি-সচেতন শক্তি। অবশ্য এদের মধ্যে এমন অনেক শ্রমিক আছে যারা সম্প্রতি গ্রাম থেকে এসেছে এবং গ্রামের সঙ্গে তাদের এখনও সম্পর্ক বর্তমান। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে শ্রমিকশ্রেণীর একটা চমৎকার গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী ঐতিহ্য রয়েছে এবং তরুণ শ্রমিকরা আমাদের পার্টির দ্বারা শিক্ষিত পুরানো শ্রমিকদের কাছ থেকে ঐ ঐতিহ্য গ্রহণ করছে। ইরানের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্বারা। এছাড়া সমাজতন্ত্রের পক্ষে দুনিয়ার শক্তিগুলির ভারসাম্যের পরিবর্তন এবং ভিয়েতনাম, আঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও অন্যান্য দেশের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সমর্থনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমগ্র সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ভূমিকার একটা বিরাট প্রভাব পড়েছে ইরানের শ্রমিকশ্রেণীর উপর।

আমাদের শিল্প-শ্রমিকদের শ্রেণীগত পরিপক্কতা প্রকাশ পেয়েছে বিপ্লবী রাজনৈতিক স্লোগান নিয়ে সর্বসম্মত ও সর্বাত্মক ধর্মঘট আন্দোলনে। এই আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল তেলের খনির শ্রমিকরা।

সারা দেশের জীবন কার্যত অচল হয়ে গিয়েছিল। শাহ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বাকচাতুরীর কৌশল ছড়াতে এবং একটা সামরিক মন্ত্রিসভা গঠন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিক্ষোভ ও ধর্মঘট চলছিলই। তাছাড়া যে-কৃষকরা প্রথম দিকে খানিকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিল তারও আন্দোলনে যোগ দেয়। অবশ্য আগে থেকেই কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছিল। যে-শ্রমিকরা গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক হারায় নি, যে সব সৈন্য সামরিক বাহিনীর চাকরি শেষ করে ঘরে ফিরছিল তাদের দ্বারা এবং দেশপ্রেমিক শিয়াপন্থী মোল্লাদের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী মনোভাব ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক ধর্মঘট আন্দোলন এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিতে পালাবদল ঘটে, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি প্রবল বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হয়। কৃষকরা পুলিস ও ভাড়াটে বাহিনীকে তাড়াতে শুরু করে এবং জন সেনাবাহিনী গড়তেথাকে।

যখন শাহ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এটা বুঝতে পারে যে তাদের নির্মম

গণহত্যা সত্ত্বেও সামরিক সরকারের হাতে আর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই, তখন তারা তাদের শেষ তীর ছাড়ে এবং এটাই বিপ্লবের তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা করে। এরা তখন ব্যবসায়ীশ্রেণীর মধ্যেকার বিরোধী শক্তিকে পক্ষে টানার প্রচেষ্টা চালায়। বেসামরিক মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং এই রকম একটা ভান করা হয় যে শাহ সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে, "জনগণের আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে" এবং রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকিয়ে রেখেও দেশ শাসনে অংশ না নিতে শাহ প্রস্তুত। শাপুর বক্তিয়ারকে এই ভূমিকা পালনে ডাকা হয়। আবার এই সঙ্গে শাহ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্যে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করার কাজে উঠে-পড়ে লাগে। এ এমন একটা অভ্যুত্থান হতো যা হিংস্রতার দিক থেকে ইরানের সব পূর্ববর্তী রেকর্ড ছাড়িয়ে যেত।

কিন্তু ইতিমধ্যে যে-বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা দ্রুত গতিতে সৈন্যদের ব্যারাকের মধ্যে ঢুকতে থাকে। সেনাবাহিনীর মধ্যে আলোড়নের বাস্তব ভিত্তি ছিল শ্রমিক ও কৃষকদের অসন্তোষ। সৈন্যদের মধ্যে এরাই ছিল একটা মস্তবড়ো অংশ। বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল বিমান বাহিনীর লোকদের হাতে। এর কারণ, হলো শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নবিত্তের শহুরে পরিবারগুলোর বহু তরুণ কোনো উপায়েই উচ্চ শিক্ষা না পেয়ে বিমান বাহিনীর কলেজে ভর্তি হয়েছিল।

একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হলো বিপ্লবে সৈন্যদের ব্যাপকভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে যোগদান তখনই শুরু হয়েছিল যখন জনগণ নির্ভয়ে গুলির সামনে দাঁড়িয়ে তাদের শক্তি এবং সেই সঙ্গে তাদের গভীর নৈরাশ্য ও ঘৃণা প্রকাশ করতে থাকে। শাহীশাসন এবং শাহর অনুগত উপরতলার সামরিকচক্রের বর্বরতা সৈন্যদের চোখ খুলে দিয়েছিল; তারা তাদের ভাইদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। এটাই শাহর সবচাইতে বিশ্বস্ত ভরসাস্থলকে ধূলিসাৎ করে দেয়।

ইতিমধ্যে জনগণ খুব তাড়াতাড়ি শাহ ও তার প্রতিক্রিয়াশীল সমর্থকদের খেলা বুঝতে পারে এবং নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। ১৯৭৯-এর জানুয়ারির গোড়ার দিকে আয়াতুল্লা খোমেইনির কাছে লেখা একটি চিঠিতে এবং ১৪ই জানুয়ারির এক ঘোষণায় আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জনগণকে সশস্ত্র প্রতিরোধ ও গৃহযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানায়। শাহীতন্ত্র এই গৃহযুদ্ধ শুরু করতে চেয়েছিল। অন্যান্য বিপ্লবী শক্তিগুলোও সশস্ত্র প্রতিরোধের আহ্বানকে সমর্থন করে।

এই স্লোগান যে কী পরিমাণ সঠিক ও সময়োচিত ছিল পরবর্তী ঘটনাবলীতে তা প্রমাণিত হয়েছে। বক্তিয়ার সরকারের ছত্রছায়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জেনারাল হাইসার-এর মাধ্যমে কাজ চালাচ্ছিল। এই লোকটি ইরানে এসে শাহের অনুগত সামরিক ইউনিটকে, বিশেষ করে রাজকীয় বাহিনীকে, সামরিক অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত করে তুলছিল। এরা একটা আচমকা আঘাত হেনে জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং আয়াতুল্লা খোমেইনি ও অন্যান্য নেতাদের খতম করতে চেয়েছিল। আবার এই সঙ্গে বক্তিয়ার একটা আপস সূত্রের সন্ধানে উপরতলার সামরিকচক্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিল।

কিন্তু জনসাধারণ ঘটনাবলীর এইরকম মোড় পরিবর্তনের জন্যে প্রস্তুত ছিল। তাই শাহর রক্ষীবাহিনী ১০ই ফেব্রুয়ারি সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করলে তার প্রতিক্রিয়ায় বিমানবাহিনীর মধ্যে একটা অভ্যুত্থানের মতো ঘটনা ঘটে। এটাই সাধারণ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে। আর এই অভ্যুত্থানই বিপ্লবী কায়দায় ক্ষমতার প্রশ্নটি মীমাংসা করে দেয়।

১০-১১ই ফেব্রুয়ারি বিজয়ী অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি সূচিত হয়। এর ফলে বিপ্লবী আন্দোলনের এই লক্ষ্যগুলো আংশিকভাবে অর্জিত হয়: রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ; দেশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উপর প্রচণ্ড আঘাত; শাহ ও পুরানো শাসক শ্রেণীগুলোর হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা গণতান্ত্রিক জাতীয় শক্তিগুলোর নিকট হস্তান্তর।

যে-পর্যায় অতিক্রান্ত হলো তার থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, বর্তমান ইরানে বিপ্লবে জড়িত শক্তিগুলোর রাজনৈতিক পার্থক্য, সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও ধর্মীয় বিরোধের চাইতে সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী ও স্বৈরতন্ত্রবিরোধী মনোভাব স্বল্পস্থায়ী হলেও শক্তিশালী।* কার্যত জনগণের সমস্ত অংশের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতি ইরানের বিপ্লবের এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, বিক্ষোভের সময় ধনী লোকেরাও গুলি ও তল্লাসীর হাত থেকে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল, আবার অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা বিনামূল্যে খাদ্যের যোগান দিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের উপর র‍্যাপক গুলি চালানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এত লোক স্বেচ্ছায় রক্ত দিতে আসত যার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বেশি।

* গত হাজার বছর ধরে ইসলামের শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-মতবিরোধ চলেছে এখানে তার ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে।

এই ব্যাপক সংহতি সারাদেশে বিকল্প ক্ষমতার কাঠামো গড়ে তুলতে নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়েছে। এই ক্ষমতাই সরকারপন্থী প্রশাসনের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পরিচালনার ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণের কর্তব্যভার হাতে নিয়েছিল।

যেমন তেহ্‌রানের দক্ষিণাংশ, এর দরিদ্র অঞ্চলে মালপত্র সরবরাহের, এমনকি গৃহস্থের জ্বালানি পাওয়ারও কোনো সমস্যা ছিল না। বিপ্লবী গোষ্ঠীর সদস্যরাই এটা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল।

এই মাসগুলোতে, বিশেষকরে গত কয়েক সপ্তাহে, ধর্মঘটী কমিটিগুলো পালটা ক্ষমতা-কাঠামোর উপযুক্ত শক্তি হিসেবে নিজেদের দাঁড় করাতে পেরেছিল। তাদের কাজকর্মের মধ্যে জনগণের, বিশেষকরে শ্রমিকশ্রেণীর উন্নত রাজনৈতিক চেতনার প্রমাণ মিলেছে। শ্রমিকশ্রেণী সারা দেশের ভবিতব্য সম্পর্কে তাদের দায়িত্ববোধ বেশ ভালোভাবেই প্রকাশ করতে পেরেছে। এর একটা দৃষ্টান্ত হলো আয়াতুল্লা খোমেইনির নিযুক্ত অস্থায়ী বাজারগান সরকারের আহ্বানে ধর্মঘটীরা কার্যত সর্বসম্মতিক্রমে কাজে যোগ দিয়েছে।

বিপ্লবের প্রতিটি পর্যায়ে ইরানী নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবারের সংগ্রামের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই সংগ্রামের সাফল্যে তাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

পরিশেষে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিটির উল্লেখ করতে চাই: বিগত ২৫ বছরের প্রচণ্ড মার্কিনপন্থী ও সোভিয়েতবিরোধী প্রচার সত্ত্বেও গণআন্দোলন স্পষ্টভাবেই মার্কিন-বিরোধী বৈশিষ্ট্য নিয়েছে। এই সময়ে সোভিয়েত-বিরোধী বা সমাজতন্ত্রবিরোধী একটা কাজেরও নজির নেই।

দুনিয়াব্যাপী শক্তির পাল্লা যেভাবে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের পক্ষে ঝুঁকেছে, এটা সেই প্রচণ্ড তাৎপর্যসম্পন্ন পরিবর্তনেরও ফলশ্রুতি।

ইরানে এখন সংগ্রামের নতুন পর্যায় শুরু হয়েছে। এখনকার বিষয়বস্তু হলো গণতান্ত্রিক জাতীয় বিপ্লবের এই মুখ্য ও কর্মসূচিগত কর্তব্য সমাধা করা: সাম্রাজ্যবাদের আর্থনীতিক শক্তির কবল থেকে ইরানের মুক্তি এবং পুরানো শাহীশাসনের সমগ্র রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক ভিত্তি ধ্বংস করা। বর্তমান পর্যায়ের সংগ্রামে এতদিনের আন্দোলনরত সমস্ত শক্তি যে যোগ দেবে না তা সহজেই বোঝা যায়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যে-চরম দক্ষিণপন্থী অংশকে পুরানো শাসন-ব্যবস্থা রেখে গিয়েছে তারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি-

গুলোর ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করবে এবং বিপ্লবের জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক উপাদান যাতে আর গভীরতা না পায় তার জন্যেও চেষ্টা চালাবে। এই গোষ্ঠী যেকোনো মৌলিক সামাজিক-আর্থনীতিক রূপান্তর এবং শাসকশ্রেণী অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জড়িত বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী, বৃহৎ ভূস্বামীবর্গ, মুনাফাখোর ও ব্যাংক-মালিকদের আর্থনীতিক ক্ষমতা বিলুপ্ত করার বিরোধিতা করে।

আবার ঠিক এর বিপরীতভাবে প্রকৃত গণশক্তিগুলো ও তাদের অগ্রণী-বাহিনী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণী মেহনতী মানুষ এবং শহর ও গ্রামের মধ্যবর্তী অংশের কল্যাণে বিপ্লবী আন্দোলনকে ঐসব রূপান্তরমুখী করে তোলার চেষ্টা করবে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের পার্টি গণতান্ত্রিক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমাদের এটা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, ইরানে আমাদের পার্টির দীর্ঘতম ও দৃঢ়তম বিপ্লবী ঐতিহ্য রয়েছে এবং আমরাই একমাত্র পার্টি যারা বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে ইরানীয় সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের বাস্তব কর্মসূচী রচনা করেছি।

ইরানের পিপল্‌স পার্টি ইরানের রাজনৈতিক জীবনে তার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থেকে অত্যন্ত সুসঙ্গতভাবে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হিসেবে কাজ করে যাবে, সারা দেশে পার্টির সংগঠন গড়া ও শক্তিশালী করার জন্যে এবং সমস্ত মেহনতী মানুষের স্বার্থরক্ষায় শ্রমিকশ্রেণীকে স্বাধীন সংগ্রামে উদবুদ্ধ করার জন্যে তার প্রয়াস অব্যাহত রাখবে। আমাদের লক্ষ্য হলো একটা সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণশক্তির ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী মোর্চা গড়ে তোলা এবং ইরানীয় জনগণের নিঃস্বার্থ সংগ্রাম থেকে আমাদের দেশের ব্যাপকতম জনগণ যাতে উপকৃত হয়, তার জন্যে সব কিছুই করা।

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯।

চিঠির জবাব

আধিপত্যবাদ এবং বৃহৎ শক্তি সুলভ নীতি

প্রিয় প্রধান সম্পাদক,

আমি আপনাকে যে-চিঠি লিখছি তা আপনার পত্রিকার প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধের বিষয় নিয়ে নয়—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক গাস হল পিকিং নেতাদের উদ্দেশে যে-চিঠি লিখেছেন এবং যে-চিঠি আমি পড়েছি সোভিয়েত পত্রিকা নিউ টাইমস-এর জার্মান সংস্করণে, সেই চিঠিটি আমাকে এই পত্র লিখতে উৎসাহিত করেছে। যেহেতু আপনাদের পত্রিকাটি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর পত্রিকা এবং যেহেতু প্রায়ই আপনাদের পত্রিকায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর উপর বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয় এবং যেহেতু গাস হলের এই চিঠি পড়ে আমার মনে কতকগুলো সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে তাই সন্দেহগুলোর কথা আপনাকে লিখতে চাই।

আমি জানি যে কমিউনিস্টরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একনিষ্ঠ প্রবক্তা এবং আমি এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে এই দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কের অন্তর্গত হিসাবে বিবেচনা করি। এটা আমাকে বিস্মিত করেছে যে আমেরিকার কমিউনিস্টরা আমেরিকা ও চীনের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নে ছিদ্রান্বেষী মনোভাব পোষণ করে এবং আমি তাদের বক্তব্য থেকেই এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আমার প্রশ্ন হল: সমস্ত জাতির মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী চায় বলে কমিউনিস্টদের বলিষ্ঠ বক্তব্যের সঙ্গে আমেরিকা ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রশ্নে ছিদ্রান্বেষী মনোভাবের কি পদ্ধতি রয়েছে, বিশেষ করে যখন উভয় দেশ বহু বছর ধরে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত ছিল? শত্রুতা কি স্বাভাবিক সম্পর্কের চেয়ে অধিকতর শ্রেষ্ঠ? বস্তুতপক্ষে, গাস হলের চিঠি থেকে এটা স্পষ্ট যে ১৯৪৪ সাল থেকেই চীনারা আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য তাদের আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছে।

আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে লোকে যা-কিছুই ভাবতে পারে কিন্তু অন্যান্য দেশের মতোই আমেরিকার জাতীয় স্বার্থ রয়েছে এবং নিজের

নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অন্যান্য দেশের মতোই আমেরিকা সর্বত্র তার বন্ধু ও মিত্র শক্তিদের সমর্থন করে। প্রতিটি দেশের পক্ষেই শত্রু সৃষ্টির জন্য নয় বরঞ্চ আরও বেশি বেশি বন্ধুর সন্ধান ও তাদের জয় করার প্রয়াস চালানো খুবই স্বাভাবিক। একটি দেশের যত বেশি সংখ্যক বন্ধু থাকবে তত বেশি তার জনগণ নিরাপত্তা বোধ করবে। উপরন্তু রাজনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ফলে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সর্বদাই সম্প্রসারিত হয়, বাণিজ্য বৃদ্ধি ঘটে, সাংস্কৃতিক মূল্য-বিনিময় প্রভৃতি কাজও প্রসার লাভ করে।

যদি তাই হয়ে থাকে তবে আমেরিকার কমিউনিস্টদের বক্তব্য অনুসারে এটা কী-ভাবে নিন্দনীয় হয় যদি তাদের দেশ তার বন্ধু ও মিত্রদের প্রতি সমর্থন জানায়? এই অভিযোগ কি তার স্বার্থের অনুকূল? বিশ্বে উত্তেজনা প্রশমনের ক্ষেত্রে এ-ধরনের বক্তব্য কী অবদান রাখতে পারে?

আরও একটি প্রশ্ন আছে যা আমি আপনার কাছে উপস্থিত করছি। চীন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং তার এমন একটি নীতি অনুসরণ করার অধিকার আছে যা তার নেতারা চীনের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করে। আমি এমন কোনো রাষ্ট্রের নেতাদের দৃষ্টান্ত স্মরণ করতে পারি না যারা তাদের দেশের পক্ষে ক্ষতিকর কোনো বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেছে।

চীনের বৈদেশিক নীতিতে এমন কিছু উপাদান আছে যা বিস্ময়ের উদ্রেক করে, কারণ আমি মনে করি যে এই বৈদেশিক নীতি হল একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের বৈদেশিক নীতি। তা সত্ত্বেও, আপনি কী মনে করেন যে একটি ক্ষতিকর নীতি অনুসরণকারী হিসাবে চীনকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে?

যখন আমি চীনা নেতৃত্বের উদ্দেশে লিখিত গাস হলের চিঠিটি পড়ছি তখন আমার মনে এই প্রশ্নগুলো নাড়া দিয়েছে—আমি এই চিঠিখানিকে বহু দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ও তথ্যমূলক বলে মনে করি। আমার এই চিঠির জবাব পেলে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব। হয়তো এই জবাব আমার সন্দেহ মোচনে সাহায্য করবে।

পরিশেষে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, যদিও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নাবলী আমাকে আকৃষ্ট করে কিন্তু আমি কখনও কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নই।

নিবেদক

পিটার কাইজার

মানস্টার

প্রধান সম্পাদক আমাদের পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত কমরেড জন পিটম্যানকে পিটার কাইজারের চিঠির জবাব দিতে অনুরোধ করেছেন।

নিম্নে এই জবাব দেওয়া হল :

প্রিয় মিঃ কাইজার,

আমরা আপনার চিঠি পেয়েছি এবং সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার চিঠির বিষয়বস্তু বিবেচনা করে বলা যায় যে সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামের উপর সশস্ত্র আক্রমণের জন্য চীনের প্রস্তুতির সংবাদ আসার আগে এই চিঠি লেখা হয়েছে। এখন যখন এই নির্লজ্জ আক্রমণ প্রকৃতপক্ষেই ঘটল তখন পিকিং নেতৃত্বের উদ্দেশে গাস হল যে-চিঠি লিখেছিলেন এবং যে-চিঠি আপনার মনে নানা প্রশ্নের উদ্রেক করেছে সেই চিঠি বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে প্রতিভাত হয়েছে।

আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পিকিং নেতৃত্বের উদ্দেশে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে ভিয়েতনামের উপর এই আক্রমণের আগে চীনের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা এখনও প্রাসঙ্গিক। পিকিং নেতারা তাদের আগ্রাসনমূলক ও সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনাকে পরিপুষ্ট করা থেকে তা কার্যকর করা পর্যন্ত যে-পথ অতিক্রম করেছে এবং যা ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে চীনের আগ্রাসনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে সেই পথের মুখোশ এই চিঠিতে উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

আপনার প্রশ্নের জবাবে এই অপযশ ও অসম্মানজনক পথ খুঁজে বের করতে আমরা চেষ্টা করব।

আপনার সর্বশেষ প্রশ্ন নিয়ে সুরু করা যাক। আপনি প্রশ্ন করে বলেছেন যে পিকিং-এর বৈদেশিক নীতি আপনাকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার যে-দেশগুলো সমাজ প্রগতি ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হয়েছে সেই দেশগুলোর প্রতি পিকিং নেতৃত্বের নীতির পটভূমিতে পিকিং-এর বৈদেশিক নীতির এই দিকগুলি বিবেচনা করতে হবে।

যে-তথ্যগুলো এ-কাজে আমাদের সর্বোত্তম সাহায্য করবে তা হল :

প্রথমত, ১৯৬২ সালে মার্কিন শাসক যখন সংকট সৃষ্টি করল তখন তা মোকাবিলায় জন্য সোভিয়েতকে কিউবায় আত্মরক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করতে হয়েছিল। কিউবার সেই অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল, কারণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিউবাকে সঠিকভাবেই দক্ষিণ আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদ-

বিরোধিতা ও সমাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হিসাবে মূল্যায়ন করেই কিউবার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের প্রস্তুতি কাজ শেষ করছিল। আমেরিকা তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক বিশাল সামরিক আক্রমণ পরিচালনার উপর নির্ভর করেছিল যাতে করে পিগ উপসাগর অভিযানের ব্যর্থতা বরণ করতে না হয়।

কিউবার সেই বিপদের মুহূর্তে পিকিং নেতাদের মনোভাব কি ছিল? তারা কী বীর কিউবার জনগণের সঙ্গে তাদের সংহতি ঘোষণা করেছিলেন? সে ধরনের কিছুই করা হয় নি। প্রকাশ্য বিবৃতিতে তারা অভিযোগ করেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কিউবা এই সংকটের উস্কানি দেয়—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নয়। আমেরিকার কিউবা আক্রমণের পরিকল্পনা পরিত্যাগের শর্তে ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে যখন সংকটের অবসান ঘটল তখন পিকিং তার মনোভাব পরিবর্তন করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে "কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক" বলে অভিযুক্ত করে। পিকিং কিউবার সাহসী জনগণের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার সুরু করে দেয় অথচ কিউবার জনগণের বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং নিজেদের দেশ রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জনের উদ্যোগই আগ্রাসীদের স্তব্ধ করার অন্যতম হাতিয়ার ছিল।

আপনি নিশ্চয়ই একমত যে সে-সংকট ছিল শান্তির পক্ষে গুরুতর বিপজ্জনক এবং চীনা নেতারা তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ সমর্থন করে।

চিলির প্রগতিশীল সরকারের পতন ঘটানোর ব্যাপারে এবং প্রেসিডেন্ট আলেন্দের হত্যাকাণ্ডে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে সি আই এ-র ভূমিকা আজ সমগ্র বিশ্ব অবগত আছে। উপরন্তু এটাও বিশ্ববাসী জানে যে সন্ত্রাসবাদী পিনোচেত সরকারের পক্ষে পিকিং নেতারাই প্রথম তাদের সমর্থন ঘোষণা করে। তারা চিলির গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিনিধি চীনে নিযুক্ত চিলির রাষ্ট্রদূতকে চীন থেকে বহিষ্কারের জন্য দৈহিক বল প্রয়োগ করে এবং অবশেষে অবৈধ ফ্যাসিস্ট জুন্টার প্রতি স্বীকৃতি জানায়।

আপনি অবশ্য জানেন যে চিলির জনগণের পক্ষে সংহতির জন্য গণ-আন্দোলন সারা বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু পিকিং চিলির মানবাধিকার রক্ষার জন্য জাতিসংঘের প্রস্তাবের পক্ষ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে এবং মাদ্রিদে চিলির জনগণের প্রতি সংহতি জানানোর জন্য বিশ্ব সম্মেলনে অংশ-গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। আজ পর্যন্তও চিলির ফ্যাসিস্ট সরকার নির্ভর

করছে মার্কিন সমর্থনের উপর এবং পিকিং-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বন্ধনের উপর।

নানা প্রচার মাধ্যম থেকে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে যখন পিকিং সমর্থিত পলপত-লেংসারিচক্র কাম্পুচিয়ার শাসন ক্ষমতা দখল করে তখন সে-দেশের জনগণের উপর কী বিপর্যয় নেমে এসেছিল। পিকিং-এর আশীর্বাদ নিয়ে এই পলপতচক্র কোনোরূপ তদন্ত ও বিচার ছাড়াই ৮ মিলিয়ন অধ্যুষিত কাম্পুচিয়া জনগণের প্রায় ৩ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করে। এটা এমন এক সময় ঘটল যখন দেশে কোনো যুদ্ধ ছিল না—এ ঘটনা ঘটেছিল শান্তির সময়ে। কিন্তু সে-ধরনের 'শান্তি' একটি যুদ্ধের চেয়েও অধিকতর ভয়াবহ। কাম্পুচিয়ার জনগণ ঘৃণিত ফ্যাসিস্ট সরকারকে উৎখাত করার শক্তি আহরণ করে এবং সত্যিকারের জনপ্রিয় সরকার গঠন করে এবং এটা এমন একটি সরকার যা ব্যাপক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের গোঁসা গোপন করতে পারে নি এবং চীনের মাওবাদী নেতারাও তাদের বিদ্বেষ গোপন করতে অক্ষম। এগুলো একই অবস্থা থেকে উদ্ভূত একই ধরনের উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনা।

আফ্রিকাতেও আমরা একই ধরনের অবস্থা লক্ষ্য করছি।

আপনার হয়তো মনে আছে ১৯৭০ সালের প্রথমদিকে সুদানে কী ঘটেছিল। সে-দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে এক সন্ত্রাস রাজ প্রবর্তন করে।

সে-ক্ষেত্রেও পিকিং নেতারা অযথা হস্তক্ষেপ করেছে। যারা সন্ত্রাসের বলি তাদের প্রতি পিকিং নেতাদের কোনো সমবেদনার বার্তা নেই বরঞ্চ বিপ্লবীদের যারা হত্যাকারী তাদের প্রতি পিকিং নেতারা উৎসাহজনক বার্তা পাঠিয়েছে। আমরা নিশ্চিত যে সুদানে প্রগতিশীল শক্তির এই পরাজয় সাময়িক এবং এই পরাজয়ে উচ্ছ্বসিত আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীলচক্র পিকিং-এর কার্যকলাপকে "সুদানে স্থিতিশীলতার উপাদান" হিসাবে স্বাগত জানিয়েছে।

চীনের নেতারা এইভাবে প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পুনরায় সমর্থন করেছে।

বহু বছর ধরে অ্যাঙ্গোলার জনগণ স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করতে বাধ্য হয়। তাদের এই সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমর্থন ছিল। পিকিং-এর মনোভাব কী ছিল? অ্যাঙ্গোলা জনগণের এই ন্যায্য সংগ্রাম সমর্থনের জন্য পিকিং নেতারা

একটি অঙ্গুলিও উত্তোলিত করে নি। বিজয়লাভের পর অ্যাঙ্গোলার জনগণ একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে এবং বহু দেশ অ্যাঙ্গোলার প্রতি তাদের স্বীকৃতি জানায় কিন্তু আমেরিকা বা চীন এই দেশগুলির মধ্যে যুক্ত নয়।

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে সাম্রাজ্যবাদী ও বর্ণ-বিদ্বেষবাদীদের সঙ্গে পিকিং নেতাদের সংহতির কথা বোঝা যাবে এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন অ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে সশস্ত্র আগ্রাসনে পিকিং-এর সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে চীনের এই সংহতির কথা আরও প্রমানিত হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা অ্যাঙ্গোলার শত্রুদের অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করেছে। পিকিংও তাদের অস্ত্র পাঠিয়েছে।

জায়েরে-তে প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলির পক্ষে চীন শর্তহীন সমর্থন দিয়েছে। সোমালিয়া যখন ইথিওপিয়া বিপ্লব-বিরোধী সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত হয় তখন চীন সোমালিয়াকে সামরিক সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষবাদীদের সঙ্গে পিকিং-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং আর এস এ ও নামিবিয়ায় এই বর্ণবিদ্বেষবাদীদের নির্যাতনমূলক নীতিকে পিকিং সমর্থন করেছে।

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই এক নতুন জীবন গড়ে তোলার অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের প্রতি পিকিং নীতির বৈশিষ্ট্য এই তথ্যগুলির মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে। এগুলো বিক্ষিপ্ত তথ্য কিন্তু আমরা আশা করি যে আপনি এ-বিষয়ে এক মত হবেন যে এই বিক্ষিপ্ত তথ্যাবলী হল একটি সাধারণ প্রবণতার ও একটি সুনির্দিষ্ট নীতির পরিচায়ক।

কমরেড গাস হলের চিঠিতে বলা হয়েছে যে চীনের এই নীতি প্রমাণ করছে যে চীনের নেতারা সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধী একটি সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

যে-সমাজতান্ত্রিক দেশটি সর্বদাই চীনা জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট রয়েছে সেই দেশকে পিকিং নেতারা কেন আক্রমন করতে প্রবৃত্ত হল? যদিও এমন এক সময় ছিল যখন চীনের নেতারা ভিয়েতনামের জন্য তাদের বন্ধুত্ব প্রদর্শন করেছিল এবং তাদের কারিগরি ও অন্যান্য সাহায্য দিয়েছে। তবে তারা কেন বন্ধুত্ব থেকে শত্রুতামূলক আচরণ অনুসরণ করল এবং ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে আগ্রাসন পরিচালনা

করল ? সম্ভবত, ভিয়েতনামীদের পরিবর্তন ঘটেছে ? হয়তো তারা সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ পরিত্যাগ করেছে ?

অবশ্য সে-ধরনের কিছুই ঘটে নি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে পরাজিত করে এবং নিজেদের দেশের পুনর্মিলনের কাজ শেষ করার পর ভিয়েতনামীরা সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করতে প্রবৃত্ত হয়। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি অনুগত থেকে তারা সমস্ত দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং একই ভাবে চীনের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখতেও সচেষ্ট ছিল।

কিন্তু এ-ধরনের প্রতিবেশী পিকিং নেতাদের মনঃপূত নয়। ভিয়েতনাম যে-বলিষ্ঠভাবে একটি স্বাধীন নীতি অনুসরণ করছে এবং পিকিং নেতাদের আধিপত্যবাদমূলক নীতি মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তা পিকিং নেতারা পছন্দ করেন নি। এই নেতাদের প্রয়োজন ছিল একটি ভিন্ন ভিয়েতনামের—যে দেশ হবে কাম্পুচিয়ার মতো চীনা মডেলে "সাংস্কৃতিক বিপ্লব" পরিচালনাকারীদের দেশ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে-লক্ষ্য একটি স্বাধীন নীতি অনুসরণকারী রাষ্ট্রগুলোর অবস্থানের পক্ষে সঙ্গতিপূর্ণ নয় সেই লক্ষ্যই তাদের আগ্রাসন পরিচালনার পথে এবং জঘন্য অপরাধমূলক কাজে ঠেলে দিয়েছে।

আজ এটা আপনার কাছে অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে মাওবাদীদের শত্রুতামূলক আচরণ—ভিয়েতনাম থেকে চীনা বিশেষজ্ঞদের সরিয়ে নেয়া, ভিয়েতনামী কর্তৃপক্ষ চীনাবাসীদের উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছে বলে মিথ্যা উক্তি, ভিয়েতনামের "আধিপত্যবাদ" সম্পর্কে হাস্যকর অভিযোগ এবং ভিয়েতনামের সঙ্গে সীমান্ত সম্পর্কিত ঘটনাবলী নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়গুলির অবতারণার উদ্দেশ্য হল বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করা, যাতে তারা বুঝতে পারে যে চীন নয় ভিয়েতনামই দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

এই পরিস্থিতিতে কার্টার প্রশাসন পিকিং-এর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ব্যবস্থা করেছে এবং তেং-সিয়াও পিংকে আমেরিকায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

আপনি নিশ্চয়ই আমেরিকায় তেং-এর বিবৃতি সম্পর্কে অবগত আছেন এবং আপনি অবশ্যই জানেন যে তেং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চীন, আমেরিকা, জাপান ও পশ্চিমী ইউরোপের সহযোগে একটি সামরিক মোর্চা

গঠনের জন্য প্রকাশ্যে কার্টার সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। তার একটি বিবৃতির কথা আমরা স্মরণ করতে পারি: "আমরা যদি প্রকৃতপক্ষে মেরু প্রদেশের ভল্লুকের উপর (অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন—সম্পা) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষমতা অর্জন করতে চাই তবে আমাদের পক্ষে তার একমাত্র বাস্তব পথ হল আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আমরা যদি শুধু আমেরিকার শক্তির উপর নির্ভর করি তবে তা যথেষ্ট নয়। আমরা যদি শুধু ইউরোপের শক্তির উপর নির্ভর করি তাও যথেষ্ট নয়। আমাদের (চীন) দেশ তুচ্ছ ও দরিদ্র কিন্তু যদি আমরা একতাবদ্ধ হই তবেই তা গুরুত্ব বহন করবে।"

আমরা পরে সামরিক মোর্চা গঠনের জন্য পিকিং নেতাদের পরিকল্পনার কথা আলোচনা করব। এখন আমরা তেং-এর উদ্ধৃত বিবৃতির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে চীন ভিয়েতনামকে "একটি শিক্ষা" দিতে চায়, চীনের ভিয়েতনামকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো অর্থে এ-বিবৃতিকে বিবেচনা করা যেতে পারে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ বাধাবার এই হুমকি সম্পর্কে কার্টার সরকারের কী প্রতিক্রিয়া হল? তাদের কেউ কি তেং-এর বিবৃতির প্রতিবাদ জানিয়েছে? এ-ধরনের নীতি অনুসরণ করা থেকে তারা কেউ কি মার্কিন সরকারকে বিরত করেছে? না, তারা সবাই নীরব ছিল। আপনি কী মনে করেন না যে এভাবে তারা চীনকে ভিয়েতনাম আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছে?

কার্টার এবং তার সহচরদের সঙ্গে গোপন আলোচনার পরই তেং এই বিবৃতি দিয়েছে—এই সহচরদের মধ্যে অন্যতম জেগনির্ভ ব্রেজেজিনস্কি সোভিয়েত-বিরোধী মোর্চা গঠনের প্রবক্তা।

আমরা আশা করি আপনি আমাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হবেন যে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের সহচর হিসাবে চীনা নেতারা শুধু আন্তর্জাতিকতাবাদের সমস্ত নীতি পরিত্যাগ করে নি, চীনা জনগণের প্রতিও অন্যায়ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

আপনি স্মরণ করতে পারেন যে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে চীনা আগ্রাসন সুরু হওয়ার দিন থেকে বীর ভিয়েতনামী জনগণের প্রতি সংহতি জ্ঞাপনের এক শক্তিশালী জোয়ার সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে

ভিয়েতনামী জনগণ এই সংহতির উপর নির্ভর করেই আগ্রাসকদের বিতাড়িত করবে এবং তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করবে যেমন তারা এর আগেও বহুবার আগ্রাসীদের বিতাড়িত করেছে। ইতিমধ্যে ভিয়েতনামের মাটিতে এই জঘন্য অপরাধের জন্য মাওবাদী নেতাদের পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। এবং আমরা মনে করি যে আপনিও এখন উপলব্ধি করবেন যে, তারা এমন নীতি অনুসরণ করে চলেছে যা তাদের নিজেদের পক্ষে এবং চীনা জনগণের পক্ষেও বিপজ্জনক।

এখন আমরা একটি সামরিক মোর্চার জন্য মাওবাদী পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করব। এই ভাবধারার কথা গোপন করে পিকিং নেতারা ভণ্ডামির সঙ্গে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি মুখোশ ধারণ করেছে। তাদের দাবি হল: সোভিয়েতের বিরুদ্ধে দেশ রক্ষার জন্য তাদের প্রয়োজন একটি মোর্চার, কারণ তাদের অভিযোগ অনুসারে সোভিয়েতের উদ্দেশ্য হচ্ছে চীনকে আক্রমণ করা।

এটা আমাদের কাছে একটি সুস্পষ্ট মিথ্যা দাবি বলে মনে হয়েছে। আপনি নিজেই এটা বিচার করুন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পিকিং নেতাদের কাছে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য এবং সমস্ত বকেয়া বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে বার বার প্রস্তাব দিয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি না যে চীনের উপর সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো আঞ্চলিক দাবি রয়েছে। চীনের উপর আক্রমণ চালানোই যদি সোভিয়েতের পরিকল্পনার কোনো অংশ হত তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ভিন্ন আচরণ চালিয়ে যেত। আপনি হয়তো অবগত নন যে মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েত সেনাবাহিনী জাপানী সামরিক গ্রুপগুলিকে ছত্রভঙ্গ করার পর, সোভিয়েত ইউনিয়ন সমস্ত জাপানী অস্ত্র-শস্ত্রের বিপুল অস্ত্রাগার এবং তার নিজস্ব সেনাবাহিনীর অস্ত্র-শস্ত্রের একটা অংশ চীনা কমিউনিস্ট সেনাবাহিনীর হাতে অর্পণ করে। এই সামরিক সম্ভারের ফলে চীনা কমিউনিস্টরা জোরদার অভিযান পরিচালনা করতে এবং তাদের বিপ্লবকে অবশেষে পূর্ণ জয়লাভের পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। নিশ্চয়ই চীনকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিয়ে কোনো দেশ এ-ধরনের ব্যবহার করতে পারে না।

চীন বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজ-

তান্ত্রিক দেশ চীনকে বিপুল বৈষয়িক সাহায্য দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে শিল্প, খনি ও পরিবহন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ৬০ বছরব্যাপী নিরলস শান্তি নীতি অথবা সমস্ত দেশের সঙ্গে শান্তি, দেঁতাত ও শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা সুনিশ্চিত করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিরামহীন প্রচেষ্টার কথা আমরা কিছু বলছি না।

বস্তুত, মাওবাদীরা যখন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মৈত্রীর জন্য সচেষ্ট হয় এবং তাদের সেনাবাহিনীকে আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে অস্ত্রের বিশেষ করে মারণাস্ত্রের জন্য আবেদন জানায় তখন মাওবাদীরা "উত্তর" থেকে ভুয়া "হুমকি"র বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের উপর পরিকল্পনা করে ও হিসাব করে থাকে। ভিয়েতনামের উপর আক্রমণ প্রমাণ করছে যে তারা আগ্রাসী কার্যকলাপের জন্য অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে এবং তারা মোটেই উদ্বিগ্ন নয় যে এই কার্যকলাপ একটি বিশ্ব-পারমাণবিক সংঘর্ষে পরিণত হতে পারে। এই পটভূমিতে ১৯৫৭ সালে পারমাণবিক যুদ্ধ সম্পর্কে মাও-সে তুং-এর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে:

"কেউ কি বলতে পারে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে কত মানুষ মারা যাবে? হয়তো বিশ্বের ২·৭ বিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৯০০ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি যে যদি পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা হয় তবে মৃতের এই সংখ্যা নিতান্তই কম। অবশ্য এক পক্ষে এটা ভয়াবহ। কিন্তু অপরপক্ষে এটা বিরক্তিকর হবে না যদি মানব-জাতির অর্ধেক নিহত হয়…যদি মানবজাতির অর্ধেকও নিশ্চিহ্ন হয় তবু আরও অর্ধেক বেঁচে থাকবে।"

মাও-এর উত্তরাধিকারেরা কিছুতেই এই বীভৎস হিসাব পরিহার করে নি। নিরস্ত্রীকরণের উপর জাতিসংঘের অধিবেশনে চীনের বৈদেশিক মন্ত্রী নিরস্ত্রী-করণের ধারণা বাতিল করে দেন এবং মাও-এর কথা উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে যদি একটি পারমাণবিক যুদ্ধ সুরু হয় তবু তা মানবজাতিকে ধ্বংস করবে না এবং তাই ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

এ-সম্পর্কে কমরেড গাস হল উল্লেখ করেছেন যে এই চিন্তাধারা পেন্টাগনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলচক্রকে এবং এমনকি কার্টারের মন্ত্রিসভাকেও সন্তুষ্ট করে। বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত কার্টারের উপদেষ্টা ব্রেজেজিনস্কি পিকিং সফরের পর ফিরে এসে পারমাণবিক যুদ্ধ সম্পর্কে যে-

বক্তব্য পেশ করেন সে-কথার উদ্ধৃতি দেন কমরেড গাস হল। "একটি পারমাণবিক যুদ্ধের অর্থ মানবজাতির অবসান বলে যে কথা বলা হয়" তাকে ব্রেজেজিনস্কি "মূর্খতা বলে চিহ্নিত করেন"।

ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে চীনের আগ্রাসন এবং এ-ধরনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কী মনে করেন যে ওয়াশিংটন ও পিকিং-এর মধ্যে সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা এবং দেঁতাতকে সাহায্য করবে? আমরা আমেরিকার কমিউনিস্টরা তা স্বীকার করি না।

আমাদের পার্টি সর্বদাই চীন ও আমেরিকার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আহ্বান জানিয়েছে ও জোর দিয়েছে। কিন্তু এটা কীভাবে অর্জিত হবে সে-সম্পর্কে আমরা উদাসীন নই। এই চিঠিতে কমরেড গাস হল তাঁর আশংকা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে মাওবাদীদের সমর্থনের ও যুদ্ধের জন্য পিকিং-এর প্রস্তুতির পটভূমিতে আমেরিকা-চীন সম্পর্ককে স্বাভাবিকীকরণ করা হচ্ছে। এটা কী এখন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি যে এই আশংকার ভিত্তি ছিল?

আপনি লিখেছেন যে অন্যান্য রাষ্ট্রের মতোই আমেরিকার জাতীয় স্বার্থ তো রয়েছে এবং নিজ দেশের জন্য সে বৃহত্তর নিরাপত্তা চায়, অন্যান্য দেশের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী এবং সে তার বন্ধু ও মিত্রদের সমর্থন করে এবং এটার বিরোধিতা করে আমেরিকার কমিউনিস্টরা দেশাত্মবোধ বর্জিত বলেই অভিযুক্ত হবে।

আমরা এ-বিষয়টি নিয়েই আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। দেশপ্রেম সম্পর্কে আপনার ও আমাদের ধারণার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে দেশপ্রেম সম্পর্কে আমাদের ভাবধারা জনৈক জার্মান-আমেরিকান বহিরাগত কার্ল সার্জ-এর বক্তব্যের কাছাকাছি। কার্ল সার্জ ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ ও গৃহযুদ্ধের সময় ইউনিয়ন সেনাবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনি বলেছিলেন: "আমাদের দেশ—সঠিক ও ভ্রান্তও বটে। যখন সঠিক তখন সঠিকভাবে রাখতে হবে, যখন ভ্রান্ত তখন সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে।"

আমরা যেমন বুঝি যে সত্যিকারের দেশপ্রেম শ্রমজীবী জনগণের আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের অনুচরদের ক্ষমতা ও স্বৈরাচারী কায়দায় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত সমস্ত দেশের ভ্রাতৃত্বমূলক সংহতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

ক্রীতদাস মালিকদের প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমর্থনে সমবেত শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সামনে ১৮৬৪ সালে হোয়াইট হাউসে আব্রাহাম লিঙ্কন বলেন: "পারিবারিক সম্পর্কের বাইরে মানবিক সহানুভূতির কঠিন-তম বন্ধন হল সমস্ত দেশ, ভাষা ও সমজাতীয় সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা।"

আমরা এটা উপলব্ধি করি যখন স্পেনের স্বাধীনতার জন্য চার হাজার আমেরিকান কমিউনিস্ট সংগ্রাম করেছিলেন, এবং এটাই হল দেশপ্রেম।

যখন যুব জনতা সহ লক্ষ লক্ষ নাগরিকদের সঙ্গে আমরা ইন্দোচীনে মার্কিন আগ্রাসনের অবসান ও ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি করেছিলাম সেটাই দেশপ্রেম।

যখন আমাদের লক্ষ লক্ষ নাগরিকদের সঙ্গে "চীন থেকে হাত গুটাও" আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি এবং চীনের উপর পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের জন্য জেনারেল ডগলাস ম্যাকার্থারের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অভিযান সংগঠিত করি সেই আন্দোলন ও অভিযানই হল দেশপ্রেম।

আজও, চীন এবং আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ সম্পর্কে আমরা যখন আমাদের আশঙ্কা ঘোষণা করি তখন আমরা আমাদের এই ঘোষণাকে প্রকৃত দেশপ্রেম বলে গণ্য করি। আমরা মনে করি না যে এই সম্পর্ক আমেরিকার নিরাপত্তাকে আরও বেশি সুনিশ্চিত করবে। যে-দেশ যুদ্ধ প্রস্তুতি থেকে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং বিশ্ব-শান্তির ক্ষেত্রে তার কার্যকলাপ কী ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে সে-সম্পর্কে পরোয়া করে না সেই দেশের সঙ্গে পুনর্মিলনের অর্থ হল সেই দেশের অংশীদার অপর দেশটির নিরাপত্তা গুরুতর-ভাবে বিপন্ন করে তোলা। উপরন্তু আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে, কারণ সাম্রাজ্যবাদ সর্বোপরি আমেরিকার শ্রমজীবী মানুষের শত্রু। যে-শক্তি তার আগ্রাসনের মাধ্যমে, এবং যে-শক্তি স্বৈরাচারী শাসন অবসানের জন্য সংগঠিত গণআন্দোলন দমন করার উদ্দেশে অপর দেশের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে নিরন্তর উত্তেজিত করে তোলে এই সম্পর্ক সেই শক্তিকে শক্তিশালী করে এবং যখন আপনি আমেরিকার বন্ধু ও মিত্র সম্পর্কে লেখেন তখন অবশ্যই আপনি এই সমস্ত স্বৈরাচারী শাসন সম্পর্কে অবগত আছেন। এই সম্পর্ক সেই সকল শক্তিকে শক্তিশালী করছে যে-শক্তিগুলো বর্তমানে আমেরিকার শ্রমিকদের উপর দুঃখ ও অনাহার চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

পরিশেষে আপনি যেমন লিখেছেন—যে-দেশ আপাত দৃষ্টিতে সমাজ-তান্ত্রিক সেই দেশ সম্পর্কে চীনের নীতির অসামঞ্জস্যতা আপনাকে হতবুদ্ধি করেছে। এই অসামঞ্জস্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত। সমাজতন্ত্র ও শান্তি অবিভাজ্য। চীনা নেতাদের সমাজতান্ত্রিক বৈদেশিক নীতির মূল-তত্ত্ব পরিত্যাগ করার অর্থই হল এই দৃঢ়ভিত্তির মূল-তত্ত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

এই পটভূমিতে আমরা গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই সম্প্রতি প্রকাশিত জনৈক ডেভিড বার্নেটের এ আলোচনা প্রসঙ্গে। চীনা নেতাদের উদ্দেশে লিখিত কমরেড গাস হলের চিঠিতে বার্নেট প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

বার্নেট লিখেছেন যে ১৯৪৪ সালে মাও-সে তুং তাঁকে বলেছিলেন: "আমরা যে-কোনো সময় বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আপনাদের সাহায্য গ্রহণ করব। আমরা আমাদের সমস্ত জীবন-মন দিয়ে একজন আমেরিকান সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে কাজ করব কিন্তু তার সঙ্গে কোনো বাঁধন বা শর্ত থাকবে না। এটাই হল আপনার প্রতি আমাদের মনোভাব।" তিনি আরও বলেন: "চীনে অবস্থিত প্রতিটি আমেরিকান সৈন্যকে হতে হবে গণতন্ত্রের ভ্রাম্যমাণ ও সবাক বিজ্ঞাপন। যে কোনো চীনাবাসীদের সঙ্গে তার দেখা হবে তাকেই একথা বলতে হবে। আমেরিকান অফিসারদেরকেও এ-বিষয়টি নিয়ে চীনা অফিসারদের সঙ্গে অবশ্য আলোচনা করতে হবে। সর্বোপরি, চীনা বা আমেরিকানদের গণতন্ত্রের আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করে।" এবং সর্বশেষে তিনি বলেন: "চীনকে অবশ্যই শিল্পসমৃদ্ধ হতে হবে। শুধু মাত্র অবাধ উদ্যোগ এবং বৈদেশিক পুঁজির সাহায্যেই চীনে শিল্পায়নের কাজ সম্পন্ন হতে পারে। চীন ও আমেরিকানদের স্বার্থ পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত এবং সমসদৃশ।"

বস্তুত এটাই আপনি মনে করেন, বিশেষ করে যখন আপনি লিখছেন যে বহু দিন ধরে চীনারা আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক চেয়ে এসেছে। এটা আমাদের ধরে নিতে হয় যে বিষয়টি তাই যদিও মাও-সে তুং শুধুমাত্র বন্ধুত্ব সম্পর্ক চান নি, তিনি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতার কথাও মনে করেছেন। কিন্তু আপনার প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে আমরা মাও-সে তুং-এর আলোচনার অংশ বিশেষের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে এই আলোচনায় মাও-সে তুং মতাদর্শ প্রসঙ্গে বলেন অর্থাৎ বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে চীনের শিল্পায়ন সম্পর্কে তাঁর অভিমত এবং আমেরিকার গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর

প্রশংসাবাদ—এটাই গণতন্ত্রের বাহ্যিক পোশাকে বৃহৎ পুঁজির শাসন ছাড়া আর কিছু নয়।

আমরা জানি না মার্কসবাদের সঙ্গে আপনার পরিচিতি আছে কিনা। কিন্তু এটা কী আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হয় না যে নিজেকে কমিউনিস্ট হিসাবে অভিহিত করে এক জন রাজনৈতিক নেতা বেসরকারি পুঁজির উদ্যোগে তার দেশের শিল্পায়নের কথা ঘোষণা করতে পারেন যখন এই বেসরকারি শিল্পোদ্যোগের অর্থ হল উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি?

সম্ভবত আপনি এই যুক্তিতে আপত্তি জানাবেন যে বিপ্লবের পর চীন বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে তার অর্থনীতি উন্নয়ন করে নি। এটা ঠিক। কিন্তু এর জন্য যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় সেই দিনগুলিতে ও পরবর্তী বছরে শ্রেণী সংগ্রামে যুক্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রশ্নে পিকিং নেতৃত্ব এক সংগ্রাম সংগঠিত করে। আগেই এই বছরগুলিতে দুইটি পথ উপস্থিত হয়। একটি হল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কর্মে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। অপরটি হল পাতিবুর্জোয়া, শ্রেণীহীন, সংকীর্ণ-জাতীয়তাবাদী ঝোঁক। সেই বছরগুলিতে চীনের সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল চীনের নেতৃত্বে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের নিরলস প্রাধান্যের জন্য।

যাহোক, যে-সমস্ত পাতিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর প্রতি মাও-সে তুং সর্বদাই ঝুঁকেছে সে-শক্তি পরবর্তী অধ্যায়ে প্রাধান্যলাভ করে। তার উত্তরাধিকারেরা, অর্থাৎ বর্তমান চীনা নেতারা জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে তাদের গুরুকে ছাড়িয়ে গেছে এবং এই জাতীয়তাবাদকে তারা এক চরম ও উগ্র স্বাদেশিকতার পথে ঠেলে দিয়েছে, সেই সঙ্গে অন্যান্য জাতির প্রতি রয়েছে তাদের জবরদস্তিমূলক মনোভাব এবং তাদের পদানত করার জন্য এক ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি। এটাই হল বৃহৎ শক্তিসুলভ স্বাদেশিকতা যা আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদী মনোভাবের সূচনা করেছে এবং আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি যে এই মনোভাবই একটি প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আগ্রাসনের পথে পরিচালিত করেছে।

মিঃ কাইজার, আমরা আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করেছি। আমরা আশা করি, আমাদের জবাব আপনার সংশয় ও অনিশ্চয়তা বাছাই করে নিতে সাহায্য করবে।

জন পিটম্যান

সদস্য, ডাবলিউ এম আর, সম্পাদকমণ্ডলী।

ভিয়েতনাম ঃ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বজনীন সত্য ও বিপ্লবের প্রয়োগ-কর্মের সমন্বয়

জোস লাভা
ডাবলিউ এম আর-এর সম্পাদকীয় পর্ষদের সদস্য ; ঐ পত্রিকায় ফিলিপিনস কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি

ভাসিভোলড রিবাকভ
ডাবলিউ এম আর-এর কর্মী

এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে জাতীয় কৃষি-বিপ্লব সমাজ বিপ্লবে রূপ নিচ্ছে। ভিয়েতনামে বিপ্লব শুধু সমাজবিপ্লবে রূপ নিচ্ছে না, এটা হয়ে উঠছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আমাদের সফরের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই প্রক্রিয়াকে চাক্ষুষভাবে দেখা ও উপলব্ধি করা। ভিয়েতনামী বিপ্লবীরা তাদের সাফল্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে যেভাবে দেখে থাকে তা অনুধাবন করা ও সেগুলোর বিবরণ দেওয়া ; তারা কী করেছে এবং কীভাবে করেছে এবং আরও কী করতে বাকি আছে, আর কীভাবেই-বা সেগুলো করবে, সেসব উপলব্ধি করা।

এটা অবশ্যই একটা অফুরন্ত বিষয়। আর সেই কারণেই আমরা এমন কতকগুলো বিষয়ের বিবরণ রাখব যা আমাদের মতে ভিয়েতনামী বাস্তবতার সবচেয়ে লক্ষণীয় ও আসল পরিচয় তুলে ধরবে।

দুই পতাকা

প্রথমে একটা বলতেই হবে যে, সমাজতন্ত্র গঠনের পর্যায়ে ভিয়েতনামের প্রবেশের তাৎপর্য হলো পশ্চাৎপদ ও ঔপনিবেশিকতার শ্বাসরোধকর বজ্রমুষ্টি থেকে সম্প্রতি-মুক্ত একটা দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজয়।

* ১৯৭৯-এর ফেব্রুয়ারি ও মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের" অনুবৃত্তি।

পশ্চাদপদতার অর্থ হল ক্ষুধা, ব্যাধি, জরাজীর্ণ দেহ ও নিরক্ষরতা। এর তাৎপর্য হলো শিল্প প্রায় না-থাকা, মান্ধাতার আমলের কৃষি-ব্যবস্থা, সামান্য সংখ্যক ও দুর্বল শ্রমিকশ্রেণী এবং সামন্ত ও আধা-সামন্ত শোষণ কবলিত অসংখ্য ছোট ছোট কৃষকদের সম্পত্তি।

আমাদের তত্ত্বাবধায়ক বললেন, ১৯৪৫-এর আগস্ট বিপ্লবের সময় পশ্চাদপদ দেশের উপরোক্ত "মাপকাঠিতে" ভিয়েতনামের অবস্থা ছিল ঐ সব দেশের চাইতেও খারাপ। শুধু এটা মনে করলেই হবে যে ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষ নিরক্ষর ছিল এবং ১৯৪৪-এর শেষে এবং ১৯৪৫-এর প্রথম দিকে ২০ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যায়। ভিয়েতনামের মুক্তি দিবসটির সঙ্গে তুলনা করলে ভারতকে শিল্পোন্নত দেশ বলে মনে হবে।

অবশ্য ভিয়েতনামী জনগণের পক্ষে একটা সুবিধাজনক ব্যাপার ছিল: তাদের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টি এই কাল জুড়ে জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের দুটি উজ্জ্বল পতাকা বহন করে গিয়েছে।

হো চি মিনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হ্যানয়ের বিপ্লবের মিউজিয়মটিকে আমাদের দেখতে যাওয়ার ব্যাপারটা তত্ত্বাবধায়কদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির চাইতেও বেশি। ভিয়েতনামের মিউজিয়মগুলো প্রচার ও শিক্ষার মুখ্য বাহন। সেখানকার চমৎকারভাবে সাজানো জিনিসগুলো দেখার সময় মুক্তি যুদ্ধের একজন পুরোনো সৈনিক আমাদের গাইড ক্যান ত্রং ফুকের চমৎকার বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে আমরা সেই ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষের মনের অবস্থা কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম। ১৯৫৯ সালে এই মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই লোকগুলো এটা পরিদর্শন করেছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এর মধ্যে শতকরা ৭০ জন ছিল স্কুলের শিশু ও ছাত্র-ছাত্রী। ভিয়েতনামের তরুণ প্রজন্মকে তাদের পিতামাতা ও পিতামহ-মাতামহদের বিপ্লবী-ঐতিহ্যে বেশ ভালোভাবেই শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। আবার এর সঙ্গে সংযোগ সাধন করা হচ্ছে বিভিন্ন প্রজন্ম ধারার।

হো চি মিনের এই বাণী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল: "তখন সাম্যবাদ নয়, দেশপ্রেমই প্রথম আমাকে লেনিন ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দিকে নিয়ে যায়।" ভিয়েতনামের যে-সমস্ত বিপ্লবী পার্টিতে যোগ দিয়েছেন কার্যত তাঁদের সবাইয়েরই সমাজতন্ত্র গ্রহণের

সূত্রপাত হয়েছিল দেশপ্রেম থেকে। ভিয়েতনামী বিপ্লবের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরবর্তী ক্ষেত্রে হো চি মিনের আর একটা উক্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। লেনিন এটা শিখিয়েছেন: "আক্রমণকারীদের হারাতে হলে, স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তি অর্জন করতে হলে শ্রমিকশ্রেণীর একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা প্রয়োজন, সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তিকে একটা ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মোর্চায় নিয়ে আসা প্রয়োজন, সব চেয়ে বেশি যাদের সংখ্যা ও সবচেয়ে দরিদ্র যে শ্রেণী সেই কৃষকদের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন এবং প্রয়োজন হল আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ঐক্যের। লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী আমরা কাজ করতে চাই।"

ভিয়েতনামী কমিউনিস্টরা ঠিক এটাই করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতায় রূপ লাভ করেছে লেনিনের যে-ভাবধারা, তারা তাকেই সৃষ্টিশীল-ভাবে প্রয়োগ করেছেন। লেনিনের রচনায় এই কর্মের বিশেষ দিকগুলো অত্যন্ত গভীরতার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে: সামন্তবাদী ও ঔপনিবেশিক নিপীড়নে জর্জরিত কৃষি-প্রধান দেশে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিকে কাজ চালাতে হবে।

প্রাচ্যের কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত লেনিনের ভাষণ থেকে একটা উদধৃতি কমরেড ফান ত্রং ফুক আমাদের পড়ে শোনালেন, "এই সব দেশে কার্যত কোনো শিল্প-শ্রমিক নেই। তা সত্ত্বেও সেখানেও আমরা নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছি ও অবশ্যই নেব। এই সব দেশে কী প্রচণ্ড বাধাবিঘ্ন পার হতে হবে অভিজ্ঞতায় তা আমরা দেখেছি। অবশ্য আমাদের কাজকর্মের বাস্তব ফলাফল থেকে আমরা এটাও দেখেছি যে, শ্রমিকশ্রেণীর যেখানে প্রায় অস্তিত্ব নেই সেখানেও এই সব বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও জনগণকে আমরা স্বাধীন রাজনৈতিক চিন্তা ও স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যধারার আকাঙ্খায় উদবুদ্ধ করতে পারি।"

একটা অনগ্রসর কৃষক-প্রধান দেশে ভিয়েতনামী কমিউনিস্টরা নেতৃত্বের এই দায়িত্বই নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। ভিয়েতনামী জনগণকে স্বাধীন রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মে উদবুদ্ধ করে তোলার কাজে তাঁরা সফলতা অর্জন করেছেন।

ভিয়েতনামী বিপ্লবের ভাগ্য নির্ধারণে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ভূমিকা। মিউজিয়মে এটা বেশ ভালো ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক মার্কসবাদ-লেনিনবাদের

ভাবধারা প্রসারের কাজেই শুধু ভূমিকা পালন করে নি, ভিয়েতনামের বিপ্লবী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সাহায্য দিয়েও তার কর্তব্য সমাধা করেছে। হো চি মিনের কর্মের মধ্যে এটা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ১৯২৪ সালে কমিন্টার্ন-এর কার্যনির্বাহক কমিটির প্রাচ্য বিভাগের স্থায়ী সদস্য হন এবং ইন্দোচীনের দেশগুলির বিপ্লবী আন্দোলনকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করে ঐ বিভাগের অসংখ্য দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩০-এর ৩ ফেব্রুয়ারি হংকং-এ তিনি কমিউনিস্ট সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন থেকেই ভিয়েতনামী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। (১৯৩০-এর অক্টোবর থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট পার্টি)।

১৯৩০-এর ফেব্রুয়ারীতে "পার্টির রণনীতি" সংক্রান্ত কতকগুলি হলুদ রংয়ের পাতা ও ১৯৩০-এর অকটোবরে ইন্দোচীন কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক ত্রান ফু-র "থিসিস" আমরা দেখেছি। লেনিনের ভাবধারা অনুসরণ করে ত্রান ফু এই সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন: ইন্দোচীন ধনতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবে। গোড়া থেকেই এই কর্তব্য স্থির করা হয়েছিল যে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি ও সামন্ত-বিরোধী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোতে হবে।

তিনটি বিপ্লব

এটা সহজেই বোঝা যায় এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিকও বটে যে, যে-দেশে আধুনিক আর্থনীতিক ও সামাজিক কাঠামো সৃষ্টি হওয়ার আগেই জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের মধ্যে থেকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব উদ্ভূত হয় সেখানে সমাজতন্ত্র গঠনের মধ্যে নানারকম বিশিষ্টতা থাকবে ও বাধাবিঘ্ন দেখা দেবে। আমাদের আমন্ত্রণকারীরা তীক্ষ্ণ প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করতে রাজী ছিলেন, পাশ কাটিয়ে যেতে চান নি।

দেশটি বর্তমানে যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার মর্ম অত্যন্ত স্ববিরোধী পদ্ধতিতে তুলে ধরলেন কংসাম-এর (কমিউনিস্ট পত্রিকা) সহকারী প্রধান সম্পাদক হং চৌঅয়ং। তিনি বললেন, "আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র আছে আবার সমাজতন্ত্র নেইও। আমাদের সমাজতন্ত্র আছে, কারণ আমাদের রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্ব। কিন্তু আমাদের সমাজতন্ত্র নেইও,

কারণ এর উপযোগী আর্থনীতিক, বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি এখনও সৃষ্টি হয় নি, একে এখনও গড়ে তুলতে হবে।"

এর অর্থ কী? প্রথমত এর অর্থ হলো ভিয়েতনামে এখনও ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন-ই প্রধান, মুখ্য শিল্পগুলো এখনও দুর্বল, সমবায়গুলো এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, সামাজিক শ্রম-উৎপাদনশীলতা কম এবং শতকরা ৮০ ভাগ কাজই কায়িক শ্রমের মাধ্যমে করা হয়। মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ১২৫ ডলার, এটা বিশ্বের অন্যতম সর্বনিম্ন অংক। এর কোনোটাই গোপন নয়, এর অনেক কথাই প্রকাশ্যে বলা হয়েছে। ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়।

ভিয়েতনামী কমিউনিস্টরা এ সম্পর্কে মোটেই ভীত নয় যে, ত্রুটিবিচ্যুতির স্বীকৃতি এবং বাধা-বিপত্তির বিশ্লেষণ করলে একটা পশ্চাদপদ দেশকে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পর্যন্ত রূপান্তর সাধনের ভাবধারার উপর সন্দেহের ছায়া ফেলতে পারে। এটা সবাই জানে যে ১৯৪৫-৭৫ এই তিরিশ বছরের মধ্যে মাত্র সাত বছর—১৯৫৮-১৯৬৪ শান্তিপূর্ণভাবে গঠনের কাজ করা সম্ভব হয়েছে এবং তাও দেশের একাংশে, উত্তরে। এরপর আসে মার্কিন আগ্রাসন। চতুর্থ কংগ্রেসে বলা হয়েছে এর ফলে বৃহদাকার উৎপাদনের অগ্রগতি দুটি বা তিনটি পঞ্চবার্ষিক কালপর্ব পেছিয়ে গিয়েছে এবং প্রতিষ্ঠিত আর্থনীতিক পরিচালন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। কমরেড হং চৌঅং বললেন, "আমরা একই সঙ্গে বিপ্লবী যুদ্ধের নিয়ম ও সমাজতন্ত্র গঠনের নিয়ম কার্যকর করেছি।"

এমনকি ঐরকম অবস্থার মধ্যেও ভিয়েতনাম বেশ খানিকটা সাফল্য অর্জন করেছে। ঠিক এখনই শিল্পের গড় বৃদ্ধি প্রায় ১২ শতাংশ এবং অনেকগুলো নতুন শিল্পের বৃদ্ধির হার আরও বেশি। ভারি শিল্পের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এটা কেবল সূচনা মাত্র: মনে রাখা দরকার নিম্নমাত্রা থেকে আমরা শুরু করেছি। চতুর্থ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মোটামুটি বিশ বছরের মধ্যে অর্থনীতিকে ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন থেকে বৃহদাকার সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে নিয়ে যেতে হবে।

এই প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু কী? এই প্রশ্নের উত্তরে কংসান পত্রিকার প্রধান সম্পাদক দাও দাই তুং ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের রণনীতি সম্পর্কে হো-চি-মিনের সূত্রের কথা স্মরণ করলেন। সেই সূত্রটাই এই প্রবন্ধের শিরোনাম। দাও বললেন "সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক

দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এটা জানি যে, সমাজতন্ত্র গঠনের কতকগুলো সাধারণ নিয়ম রয়েছে। এই নিয়মগুলোর সম্পর্কে জ্ঞানের মধ্যেই কমিউনিস্টদের শক্তি নিহিত। আমরা এই সাধারণ নিয়মগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কাজ করি, আবার সেই সঙ্গে ভিয়েতনামের বিশেষ পরিস্থিতিতে সেগুলোকে প্রয়োগ করার বিশেষ রূপও অনুসন্ধান করি। বর্তমান স্তরে আমাদের পার্টি তিনটি বিপ্লবের এই কর্মসূচী উদ্ভাবন করেছে: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবকে প্রধান বিষয় হিসেবে ধরে উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এবং ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের পরিস্থিতির আলোকে এর প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক রূপ ও আধেয় (কনটেন্ট) খুঁজে বার করতে হবে।"

আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন ছিল: "ভিয়েতনামী পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবকে আপনারা কিভাবে দেখছেন?" এর উত্তর হল: "বর্তমান স্তরে এই বিপ্লবের আধেয় হচ্ছে যন্ত্রীকরণ; এটা কৃষির ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশে যন্ত্রীকরণের আগে যৌথ-কৃষি প্রবর্তন করা দরকার, তা না হলে আমাদের কুড়ি বছর অপেক্ষা করতে হবে।"

ইয়েনসো কৃষি সমবায়টি গড়ে উঠেছে হানয়ের শহরতলী এলাকায়। ১৯৬০ সালে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভিয়েতনামের মাপকাঠিতে এ একটা বড়ো প্রতিষ্ঠান। এর জনসংখ্যা ৫ হাজার ৭ শত, এর মধ্যে ২ হাজার ২৫০ জন উৎপাদনে যুক্ত। এখানে কর্ষিত জমির পরিমাণ মাত্র ৪২৩ হেক্টর (লোহিত নদীর বদ্বীপ এলাকায় অতি জনসংখ্যার দৃষ্টান্ত এর আগের সংখ্যায় আমরা উল্লেখ করেছি)। সেইজন্যে মনুষ্য শক্তির একটা বড়ো অংশ পোশাক তৈরির মতো সহায়ক শিল্পে নিয়োজিত হয়েছে। সেচের জন্যে পাম্প ব্যবহার করা হয়। পাঁচটি ১২ অশ্বশক্তির ট্রাক্টর এবং গবাদি পশুর খাদ্য তৈরির জন্যে রয়েছে কতকগুলো ছোট মেশিন (কিন্তু এ ধরনের ছোটোখাটো যান্ত্রিকীকরণের কাজও উত্তরাঞ্চলের অর্ধেকের কিছু বেশি কৃষি সমবায়ে চালু আছে)। বাকি সব হাতে করা হয়। এটা কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই পরিস্থিতিতে সমবায়ের কাজকর্ম প্রশংসনীয়। এর উৎপাদন ক্রমশই বাড়ছে, রাষ্ট্রের কাছে চাল, শাকসব্জি, মাছ ও মাংস বিক্রির পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর নেতারা ন্যায্য গর্বের সঙ্গেই এগুলো আমাদের বললেন।

অপর একটি প্রশ্ন ছিল: "উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনারা বিপ্লবের

কথা বলছেন। কিন্তু ভিয়েতনামের উৎপাদন-সম্পর্ক কি ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক হয়ে ওঠে নি?"

উত্তর: "হ্যাঁ হয়েছে, উত্তরে মানুষের উপর মানুষের শোষণ শেষ হয়েছে। এখানে দু-ধরনের সম্পত্তি বর্তমান: সমগ্র জনগণের সম্পত্তি এবং যৌথ সম্পত্তি। সমবায়ী কৃষক নতুন ধরনের কৃষকশ্রেণী হয়ে উঠেছে।" কমরেড দাও আরও বললেন, "কিন্তু আমাদের কাছে উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লবের ধারণা শুধু সম্পত্তি সমস্যার সমাধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পরিচালন ও বণ্টনও এর মধ্যে পড়ে। দক্ষিণে এটা অবশ্য এখনও সমাধান করতে হবে। সেখানে এখনও বিরাট পরিমাণ কাজ বাকি রয়েছে।"

দ্বিতীয় সমস্যাটি সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতি ভিয়েতনামী কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে প্রচণ্ডভাবে সমালোচিত হয়। ভিয়েতনামী কমরেডরা একথার উপর জোর দেন যে, এটা ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন যেখানে প্রধান সেইরকম অবস্থায় এবং যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিবেশে পরিকল্পনা রচনার মতো বাস্তব পরিস্থিতির বিষয়ই শুধু নয়। কর্মী প্রশিক্ষণের নিম্নমান, আমলাতন্ত্র এবং সময় সময় পরিচালনব্যবস্থা ও সংগঠনের সমস্যাগুলো সম্পর্কে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে অনিচ্ছার মতো বিষয়ীগত উপাদানও সমস্যা সমাধানের প্রয়াসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

নতুন, সমাজতান্ত্রিক মানুষ গড়ে তোলা এবং প্রতিটি নাগরিককে "যৌথ-কর্তার" মনোভাবে শিক্ষিত করাই প্রধান সমস্যা। বস্তুগত ভিত্তি—বৃহদাকার উৎপাদন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই, এমনকি মানুষের দৈনন্দিন চাহিদার পরিপূরণের মান নিম্নস্তরে থাকা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে ফল পেতে হবে।

জীবনযাত্রার মান ও জীবন-ধারা

রাজনৈতিক ব্যুরোর বিকল্প সদস্য ও ভিয়েতনামী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক তুহ বললেন, "আমাদের কাছে প্রধান ও জরুরী সমস্যা হলো ৫ কোটিরও বেশি মানুষ; প্রথমত শিশুদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা। এটা ভালোভাবে বাঁচার প্রশ্ন নয়, অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন।" বিশেষ করে ভিয়েতনাম মার্কিন আগ্রাসকদের পরিচালিত যুদ্ধে বিধ্বস্ত, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ এর মাটিতে ছড়ানো হয়েছে, এর মাটিতে এমন সব মাইন ও বোমা রয়েছে যার এখনও বিস্ফোরণ ঘটে নি। এখানকার প্রধান

ভারবাহীশক্তি হাজার হাজার মোষ মারা গিয়েছে। এছাড়া ১৯৭৮-এর শরৎকালে যে-ভয়াবহ বন্যা হয় তা-ও ভিয়েতনামকে আঘাত করেছে।

ভিয়েতনামে প্রধান খাদ্যবস্তু ও ভোগ্যপণ্য কেন্দ্রীয় রেশনব্যবস্থার মাধ্যমে বিলি করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে চোখে-পড়ার মতো ঘটনা হলো, ভিয়েতনামী কমিউনিস্টরা এমন একটি সমস্যার সমাধান করেছে যা ধনতন্ত্রের পথ অনুসরণকারী কোনো অনগ্রসর দেশের সরকার মোকাবিলা করতে পারে নি। এইসব দেশের অনেকগুলোতে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু বারবার পত্রিকায় খাদ্যবস্তু নিয়ে কেলেঙ্কারি, অপচয়, চুরি এবং ফাটকাবাজি এবং বিদেশী খাদ্য-সাহায্য সম্পর্কে উপর ও নিচুতলার কর্মচারীদের মধ্যে চক্রান্তের বহু বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। এইসব দেশ সফর করলে শিশুদের অসহনীয় অবস্থা, তাদের মুখের উপরকার টানটান চামড়া, কাঠির মতো সরু ছোট হাত-পা, পেটটা অসম্ভব মোটা—অনাহারের এইসব করুণ চিহ্ন চোখে পড়ে।

ভিয়েতনামে এটা দূর ঔপনিবেশিক অতীতের চিত্র। ভিয়েতনামী শিশুরা বয়স্কদের মতোই পরিচ্ছন্ন পোশাকে সজ্জিত, যদিও পোশাকের বৈচিত্র্য নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে না। অনেক উঠতিবয়সের ছেলেমেয়ের মুখে এখনও শীর্ণতার ছাপ কিন্তু অপুষ্টি নির্মূল হয়েছে, বিশেষ করে উত্তরে তার কোনো চিহ্ন নেই। দক্ষিণে অনাথ ও পরিত্যক্ত শিশুর সমস্যা এখনও বর্তমান কিন্তু এর সমাধান করা হচ্ছে। একথা আমরা আগেই বলেছি।

ভিয়েতনামী কমিউনিস্টরা জীবনযাত্রার মানের সামাজিক দিকগুলোকে উন্নত করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। নতুন সমাজতান্ত্রিক জীবন-ধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এর ফলাফল বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এটা গরিব দেশের পক্ষে অত্যন্ত চমকপ্রদ।

ঐসব ক্ষেত্রে ভিয়েতনামের সমাজতান্ত্রিক সাফল্যের বিবরণ দিলেন পর্যায়ক্রমে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য দপ্তরের দু-জন সহকারী মন্ত্রী, কমরেড হো ট্রাক ও হোয়াং দিন কাউ।

হো ট্রাক বলতে লাগলেন, অগাস্ট বিপ্লবের পরেই ১৯৪৫-এ রাষ্ট্রপতি হো চি মিন বলেছিলেন তরুণ ভিয়েতনামী প্রজাতন্ত্রের শত্রু তিনটি: বিদেশী হানাদার, বুভুক্ষা ও নিরক্ষরতা। নিরক্ষরতা দূর করার বিরুদ্ধে ১৯৪৫-এর ২রা সেপ্টেম্বর ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র একটি ঘোষণা জারি করে এবং ৮ই সেপ্টেম্বর

হো চি মিন একটি আইনে স্বাক্ষর দেন। একটা লক্ষণীয় ঘটনা হলো ১৯৭৫-এ দক্ষিণ মুক্ত হওয়ার পর পার্টির অন্যতম নির্দেশ ছিল সমাজতান্ত্রিক আধেয়সম্পন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার সংগঠন সংক্রান্ত।

অবশ্য এখনও অনেক সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলো: বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি, শিক্ষকদের স্বল্পতা, তাদের প্রশিক্ষণের অসন্তোষজনক অবস্থা (তাদের একটা পুরো শিক্ষা কোর্স দিতে হয়)। এর ফল হয়েছে বিস্ময়কর (যদিও স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণ এখনও উত্তরের চাইতে পেছিয়ে আছে)।*

সান্ধ্যকালীন শিক্ষার উপর যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। হো ট্রাক জোর দিয়ে বললেন, এটা "জনসাধারণকে দেশের যৌথকর্তা হওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।" এক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো: শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষামূলক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্যে কাম বিন জেলাকে ইউ এন এস কো (UNESCO) ক্রুপসকায়া পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

হোয়াং দিন কাউ বললেন, জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যুদ্ধের ফলাফল আরও প্রকট। কর্মীর অভাব, বিশেষত দক্ষিণে, উচ্চশিক্ষিত মেডিকেল কর্মীর অভাব রয়েছে। এটা প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ২০ শতাংশ। কারিগরি সুযোগ-সুবিধাও কম, ওষুধেরও ঘাটতি রয়েছে। জাতীয় ওষুধ শিল্প দেশের চাহিদার মাত্র ৩০ শতাংশ মেটায়। কিন্তু হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ও ডাক্তার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে** এবং মহামারী দূর করার ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

---

* উত্তর ভিয়েতনামে ১০০ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় আর দক্ষিণ ভিয়েতনামে এর পরিমাণ শতকরা ৮০ ভাগ। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা ৯৫ ও ৬০ শতাংশ। পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা ৩০ ও ২০ শতাংশ। উত্তরের উচ্চতর স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ৮০ হাজার, দক্ষিণে ৩০ হাজার, মোট সংখ্যা হলো ১ লক্ষ ১০ হাজার, এর সঙ্গে কলেজের ছাত্র সংখ্যা ৩৬ হাজার যোগ করতে হবে।

** ১৯৫৫ সালে প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্যে উত্তরে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ছিল ১০.৫ এবং ১৯৭৫-এ ২৪.১। দক্ষিণ পেছিয়ে থাকার জন্যে ১৯৭৬-এ এই সংখ্যা কমে গিয়ে ১১.৮ দাঁড়ায়। ডাক্তারদের সংখ্যার ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য: ১৯৫৫ সালে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৬৮৫ জন পিছু একজন ডাক্তার ছিল; ১৯৭৫-এ উত্তরে ৩ হাজার ৮১৬ জন পিছু, ১৯৭৬-এ ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনামে ৫ হাজার ২৭৮ জন পিছু এবং ১৯৭৭-এ ৪ হাজার ৪৫৮ জন পিছু একজন ডাক্তার ছিল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করা একটা বিশেষ সমস্যা। ভিয়েতনাম, তথা সমগ্র এশিয়ার ক্ষেত্রে এ একটা জটিল সমস্যা। ভিয়েতনামের জন্মহার পৃথিবীর উচ্চতম জন্মহারের মধ্যে পড়ে—৩ শতাংশের বেশি। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হলো ২.৫ শতাংশের উপর। এই হারে বৃদ্ধি পেলে ভিয়েতনামের জনসংখ্যা ২ হাজার সালে গিয়ে ১০ কোটিতে পৌঁছবে।

পরিবার পরিকল্পনা পুঁজিবাদী এশিয়ার এমন একটি গুরুতর সমস্যা যাকে বাগমানানো খুবই কঠিন। এ-সম্পর্কে ভিয়েতনামী কমরেডরা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছেন। এর একটা দিক হলো প্রচার ও জ্ঞানের প্রসার। নিম্নোক্ত যুক্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে: সীমায়িত সংখ্যক শিশুর অর্থ হলো নারীমুক্তি এবং সমাজজীবনে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ, শিশুকে মানুষ করার উন্নততর সুযোগ; মা-বাবার বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের আরও বেশি সুবিধা; মায়েদের স্বাস্থ্য রক্ষা।

জন্মনিয়ন্ত্রণের সাফল্যের ক্ষেত্রে একটা উপযুক্ত নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে। এইসঙ্গে মা ও শিশুর যত্ন, কার্যত অবৈতনিক ক্রেশ ও নার্শারি স্কুল, পারিবারিক সাহায্য এবং গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের পরিচর্যার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে কি কোনো বিরোধ আছে? না, কোনই বিরোধ নেই। আমরা মনে করি বৃহৎ পরিবারে মা ও শিশুর জন্যে উদ্বেগ নিয়ে ধৈর্য ও কুশলতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি প্রচার চালায় তাহলে তা ফলপ্রসূ হবে এবং পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যেসব জবরদস্তি চলে, যার ফলে পুঁজিবাদী এশিয়ার জনসাধারণ, বিশেষত কৃষকরা, প্রায়ই শংকিত হয়ে নিজেদের এই পরিকল্পনা থেকে গুটিয়ে নেয়, তা দূর হবে।

নৈতিক ও শারীরিকভাবে স্বাস্থ্যবান মানুষ নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত এবং দেশের সত্যিকারের যৌথকর্তা হিসেবে সক্রিয় থেকে উন্নত স্তরে পার্টির নীতি কার্যকর করতে সক্ষম সমাজতান্ত্রিক সমাজের এমন সচেতন নাগরিক গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞায় ঐ সব প্রয়াস ও ঐ সব সাফল্য নিয়োজিত।

বিপ্লব: একটি গণ-উৎসব

বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান ঘুরে ঘুরে দেখে আমরা এ-সম্পর্কে নিঃসন্দেহ যে, ভিয়েতনামী মেহনতী মানুষের যৌথ আর্থিক কার্যকলাপ (শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রী এর মেরুদণ্ড) সর্বক্ষেত্রেই সংহত হয়ে উঠছে। চতুর্থ কংগ্রেসে বলা

হয়েছে, এটা কার্যকর করা হচ্ছে "প্রধানত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাধ্যমে—যাকে পরিচালনা করছে পার্টি, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী।"

ভিয়েতনামে শ্রমিকশ্রেণী খুব বেশি নয় (এর শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ)। রাষ্ট্রযন্ত্রের নেতৃস্থানীয় পদে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থান শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। জাতীয় সংসদে শ্রমিক প্রতিনিধির সংখ্যা কৃষকদের মতোই, ভিয়েতনামে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ব্যাপকতম অধিকার রয়েছে। আমাদের অভ্যর্থনাকারীরা বললেন, অবশ্য সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকা বিশেষভাবে প্রকাশ পাচ্ছে এইখানেই যে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি এর নিজস্ব পার্টি, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি।

এর অর্থ এই নয় যে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টিতে সম্পূর্ণভাবেই বা বেশির ভাগই শ্রমিক, যদিও শ্রমিকদের মধ্যে থেকে নতুন সদস্য সংগ্রহ করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। ভিয়েতনামী কমরেডরা বললেন, অধিকাংশ পার্টি সদস্যই কৃষক বা পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে আসা। এদের বিপ্লবী চেতনার সূত্রপাত হয়েছে দেশপ্রেমের মাধ্যমে। কাউ লাও (এখন লাং সন)-এর উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশের পার্টির আঞ্চলিক কমিটির ব্যুরোর সদস্য হোয়াং লাম আমাদের বললেন, "এটা এই কারণেই খুবই স্বাভাবিক যে, উপনিবেশবাদী ও অন্যান্য আগ্রাসীশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষকরাই ছিল বিরাট অংশ। সংগ্রাম ও বিপ্লবে তারা পরীক্ষিত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মাওবাদী চীনের মতো আমরা কৃষকের অবস্থান গ্রহণ করি, সব কিছুই আমরা কৃষকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি। আমাদের নীতি এটাই: কেউ পার্টিতে যোগ দিলে তাকে অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণী যার ভাবাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, তার অবস্থান মেনে নিতে হবে"।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আক্ষরিক অর্থে নয়, তার বিপ্লবী ও বিজ্ঞানসম্মত মর্মবাণীকে সৃষ্টিশীলভাবে আয়ত্ত করা, এর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য এবং সমস্ত কাজকর্মের ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করার ক্ষমতা ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টিকে সক্ষম করেছে, একটা অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দেশে তার প্রলেতারীয় চরিত্র বজায় রাখতে। এই কারণেই এই পার্টির পরিচালিত রাষ্ট্র শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্র।

পার্টির প্রলেতারিয় চরিত্রের উপর গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ কোনোক্রমেই এটা নয় যে পার্টি ও শ্রেণী এবং মেহনতী জনগণের মধ্যে কোনো প্রাচীর তোলা রয়েছে। সুপরিচিত মার্কসবাদী সূত্রটিকে ভিয়েতনামী কমিউনিস্টরা

এই ভাবে প্রকাশ করেন, "বিপ্লব জনগণের উৎসব।" আমরা সর্বত্রই এটা দেখেছি যে, তাঁদের কাজকর্মে তারা সব সময়েই গণ-আন্দোলন ও সংগঠনের উপর নির্ভর করেন।

এই সব আন্দোলনকে সুস্পষ্ট ও সরল স্লোগানের ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়—যার ফলে যারা পেছিয়ে আছে তাদের অগ্রগতি ঘটে এবং প্রথম সারির কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ইয়েন সো সমবায়ের সভাপতি কাউ দী দাও আমাদের বললেন, "কাজ, সঞ্চয় ও নতুন জীবন-ধারা—এই স্লোগান-গুলিকে কেন্দ্র করে আমরা তিনটি গণ-আন্দোলন গড়ে তুলেছি।" নতুন জীবন-ধারা বলতে কী বোঝায় আমরা তাঁকে ব্যাখ্যা করতে বলি। এর মধ্যেও চারটি এই রকম সুস্পষ্ট বিষয় রয়েছে: "ক) রাজনীতি ও ভাবাদর্শে শিক্ষিত হও; খ) দৈনন্দিন জীবনে আদর্শ আচরণ কর; গ) আদর্শ পরিবার গড়ে তোল; ঘ) পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা মেনে চল।"

এই সব স্লোগান ও প্রয়োজনীয়তা থেকে এটা বোঝা যায় যে, হ্যানয়ের শহরতলীর কৃষি সমবায়ের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পার্টির কাজের লক্ষ্য হলো নতুন, সমাজতান্ত্রিক মানুষ গড়ে তোলা।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামে নতুন মানুষের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পার্টি সদস্যরাই এগিয়ে আসবেন কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো কোনো পার্টি সদস্যকে "জনগণের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয় না" এবং তাকে জনগণের মধ্যেই "ফিরে আসতে" হয়। তাই ইয়েন সো সমবায়ে প্রতি ছয় মাস অন্তর জনসভা করা হয়। এই সভায় কৃষকরা পার্টি সদস্যদের কাজকর্মের মূল্যায়ন ও সমালোচনা করেন এবং তাঁদের মধ্যে থেকে পার্টির নতুন প্রার্থী সদস্যে-র নামও প্রস্তাবিত হয়।

নতুন ধরনের মানুষ গড়ে তোলা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। ভিয়েতনামী কমরেডরা এটা স্বীকার করেন যে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় গণ-বিপ্লবী আন্দোলনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যত সহজ হয়েছিল শান্তিপূর্ণ গঠন কার্যের সময়ের কাজ ততটা সহজ নয়। এর পেছনে বাস্তব কারণ রয়েছে। ভিয়েতনামী শ্রমিকশ্রেণীর বেশির ভাগ অংশই এই প্রথম শ্রমিকের কাজে লেগেছেন। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার মতো কোনো বৃহদাকার উৎপাদন ব্যবস্থা নেই। কৃষকরাও এই প্রথম সমবায়ে এসেছেন, অল্প দিন আগেও তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে চাষ করতেন। দক্ষিণে যৌথ কৃষি এই সবে সতর্কতার সঙ্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। হস্তশিল্পী ও ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের অনুপাত এখন

বিশাল। জাতীয় সংখ্যালঘুরা জনসংখ্যার ১৬ ভাগ। এদের সামাজিক ও আর্থনীতিক বিকাশের স্তর দেশের সাধারণ মান থেকে এখনও নিচু। কিন্তু পার্টির একটানা ও উদ্দেশ্যমুখী প্রয়াসের ফলে ভিয়েতনামের সমাজতান্ত্রিক সমাজের নৈতিক ও রাজনীতিক ঐক্য ক্রমশ গড়ে উঠছে ও শক্তিশালী হচ্ছে।

প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদের চেতনায় শিক্ষিত করে তোলা—সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামে নতুন মানুষ গঠনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভিয়েতনামী কমরেডরা জোরের সঙ্গে বললেন, "মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে, প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে দেশপ্রেমকে যুক্ত করতে না পারলে বিজয় অসম্ভব। প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতার সত্যতা ও শক্তির এই নিশ্চয়তা, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে থাকার চেতনা—সি এম ই এ-তে দেশটির যোগদানের ফলে যা প্রতিপন্ন হয়েছে। আমাদের আমন্ত্রণকারীদের ভাষায় "সমাজতন্ত্র গঠনে পারস্পরিক সাহায্যের সংগঠন"—এ সবই ভিয়েতনামী জনগণকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শের জয়লাভের ক্ষেত্রে একটা প্রশান্ত আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। আমাদের সফরকালে এই দৃঢ়চেতা জাতিটির মধ্যে অনবরত আমরা এটাই উপলব্ধি করেছি।

এই প্রবন্ধটি ছাপার সময়ে আমরা এই আশংকাজনক সংবাদটি পাই যে চীনের সশস্ত্রবাহিনী ভিয়েতনাম আক্রমণ করেছে। এটা তখনই ঘটল যখন ভিয়েতনাম তার জনগণের খাদ্য সরবরাহের জন্য প্রচণ্ড প্রয়াস করছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের ক্ষত চিহ্ন এখনও মিলিয়ে যায় নি, দেশটি দীর্ঘদিন পরে শান্তিপূর্ণ ও সুখী জীবন গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছে। যে-বীর ভিয়েতনাম দুঃখ-যন্ত্রণার পরিপূর্ণ পেয়ালা নিঃশেষে পান করেছে, আবার তাকে আগ্রাসনের মোকাবিলা করতে অবতীর্ণ হতে হল।

ভিয়েতনামের পথ-প্রান্তরে আমরা হাজার হাজার কিলোমিটার ঘুরেছি। আমরা সাক্ষাৎ করেছি শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে, দেখা করেছি সৈন্য, পার্টির কর্মী, ডাক্তার ও শিক্ষকদের সঙ্গে। আমরা এ-সম্পর্কে নিশ্চিত যে আক্রমণকারী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে। যে-ভিয়েতনামী জনগণের পেছনে দুনিয়ার সমস্ত সৎ-মানুষের সমর্থন রয়েছে, তারা তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা করবেই।

বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব ও আজকের বিশ্বগ্রাসী সমস্যাবলী

একাডেমিশিয়ান ব্লাদিমির এঙ্গেলগার্ত
পরিচালক, ইনষ্টিটিউট অব মলিকিউলার বায়োলজী
সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাডেমি

যেসব বিশ্বগ্রাসী সমস্যায় মানুষ আক্রান্ত হয়ে আসছে, সেগুলো পুঁজিবাদের আমলে চূড়ান্ত সংকটের রূপ নিয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে হলে আজ আর মামুলি ব্যবস্থায় চলবেনা।

আদিম প্রাকৃতিক শক্তিগুলো ভূমিকম্প, জলপ্লাবন ও অনাবৃষ্টির মতো যেসব বিপর্যয় ঘটিয়ে আসছে, সেগুলোর সঙ্গে মানবসমাজের পরিচয় সুদীর্ঘকালের। এই সংকটগুলো স্থানীয় এবং সাময়িক। এগুলো মানুষের এক্তিয়ারে নেই। মানুষ এসব সংকটের শিকার। মানুষ এগুলোর কারণ নয়।

অপরদিকে, এমন সব সংকট আজ সারা বিশ্বকে গ্রাস করতে উদ্যত, যেগুলো মানুষের ব্যক্তিগত পুঁজির আচরণের ফল। এগুলোকে অ্যান্‌থ্রোপোজেনিক (anthropogenic) বা মনুষ্যজাত বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এগুলো হচ্ছে কাঁচামাল, জ্বালানি, খাদ্য, পরিবেশ এবং এধরণের অন্যান্য বিষয়ের সংকট।

উপরন্তু, এই বৈষয়িক সংকটগুলোর পাশাপাশি রয়েছে এমন সব বিশ্বগ্রাসী বিপদ যেগুলো মানুষের আত্মিক জগৎকে ধরেও টান দেয়। একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে সংবাদ বা তথ্যঘটিত বিপদ। এই বিপদটা শুধু এ নয় যে, সংবাদ সরবরাহ একটা বন্যার আকার ধরেছে এবং এটা আমাদের গ্রহণ-ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রকৃত বিপদটা এইযে, পুঁজিবাদী শ্রেণীর প্রাধান্যময় সমাজে সাজিয়ে-গুছিয়ে ভুল সংবাদ প্রচারিত হয়, সত্য খবরকে চাপা দেওয়া হয়। মানুষের মন ও মানসে এবং আচরণে এর ফল নেতিবাচক।

মানববিদ্যার বিভিন্ন বিভাগের গবেষকরা এই সংকটের নাম দিয়েছেন ব্যক্তিসত্তা বা পরিচয় বা 'আইডেনটিটির' সংকট। মানববিজ্ঞানীরা এই সংকটের সমাধানে বেশি বেশি করে মনোযোগী হচ্ছেন। এই সংকটের মর্মার্থ হলো, পুঁজিবাদী সামাজিক পরিবেশে মানুষ তার সামাজিক অবস্থান ও নিজ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মূল্যায়ন করার ধারণা হারিয়ে ফেলে। এই সংকট সারা বিশ্বে সংক্রামিত হতে পারে।

ব্যাপক জনতার সঙ্গে সঙ্গে সারাবিশ্বের সমগ্র মানবসমাজের ওপর যে সংকটগুলো বর্তাচ্ছে কিংবা বর্তাতে পারে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা যেন কখনো ভুলে না যান যে, মানুষ এবং তার ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিসত্তাই তাঁদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের দাবিদার। এ তাগিদটাকে সামনে রেখেই এখানে বিষয়টির উত্থাপন।

আজকের বৈজ্ঞানিকদের অনেকে শুধুমাত্র মানুষের বহিঃ-পরিবেশের সংকট নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। এই বহিঃ-পরিবেশের শুচিতা-রক্ষা ও পঙ্কিলতা-নিবারণের জন্যে নানারকম চেষ্টাচরিত্র চালানো হচ্ছে। জীবন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দাবি করে আসছে যে, মানুষের 'অন্তরের পরিবেশ' নিয়েও ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন সমধিক। এই জন্যেই ব্যাপক জনসমাজের ওপর যেসব সমস্যা চেপে বসছে কিংবা বসতে পারে, সেগুলোর কিনারা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকদের ব্রতী হতে হবে মানুষের আত্মিক ও বহিঃ-পরিবেশ-ঘটিত উভয় সংকট সমাধানেই।

এই বিশ্বগ্রাসী ও জনগ্রাসী সংকট সমাধানের বিশেষ দায়িত্ব এসে বর্তাচ্ছে বৈজ্ঞানিকদের ওপর। এর একটা বড় কারণ হলো এই যে, বিজ্ঞান হলো সেই শক্তি যাকে এই সমগ্র বিপজ্জনক পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকরা হলেন নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে বিজ্ঞানের নির্মাতা।

সুতরাং, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের প্রতি যে অভিযোগের পর অভিযোগ বর্ষিত হয়ে থাকে, তার পেছনেও যুক্তি রয়েছে। বস্তুতপক্ষে, আমাদের আলোচ্য সংকটগুলোর অধিকাংশই অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক কারিগরি-বিদ্যা প্রয়োগের ফলশ্রুতির অঙ্গ। বিজ্ঞানই এই কারিগরিবিদ্যার উৎস। উপরন্তু কারিগরিবিদ্যার অগ্রগতি এবং এর বিভিন্ন প্রয়োগের মূলে রয়েছে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব। সাধারণভাবে বিজ্ঞান যদিও অর্থনৈতিক উৎপাদনের কোনো অঙ্গশক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়না, তবু প্রত্যক্ষভাবে না করলেও পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান কার্যত সবচেয়ে শক্তিশালী উৎপাদকের ভূমিকা পালন

করে। এর কারণ হলো এইযে, যেসব নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কারিগরি-প্রগতির প্রবর্তক, বিজ্ঞান হচ্ছে সেগুলোরও উদ্ভাবক।

আমাদের কালের বিশ্বগ্রাসী বিভিন্ন সংকটের কারণগুলোকে অবশ্য পাওয়া যাবে সর্বোপরি পুঁজিবাদী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে। তবে এর মধ্যেই কারিগরি অগ্রগতির ফলাফলের ক্ষেত্রে গুণগত উল্লম্ফনে যে-সব আকস্মিক ওলটপালট ঘটে কিংবা যেসব নতুন নতুন আবিষ্ক্রিয়াকে অতিমাত্রায় কাজে লাগানো হয়, তাদের বিপজ্জনকতাকেও সংকটের হিসেবের মধ্যে রাখা দরকার। পারমাণবিক শিল্পে তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিপজ্জনক বিকীরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের অমিতব্যয়িতা, জনপ্রচার মাধ্যমের অন্ধ প্রয়োগ, এবং ক্ষতিকারকতার ব্যাপারে প্রতীকারের ব্যবস্থা ছাড়াই নিত্য নতুন ওষুধের ব্যবহার প্রভৃতি হচ্ছে উপরোক্ত বিপজ্জনকতার দৃষ্টান্ত। প্রত্যক্ষভাবে হোক অথবা পরোক্ষভাবে হোক, উদ্ভূত বিপজ্জনক সমস্যাগুলোর সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার যোগাযোগ দেখানো যেতে পারে। সেইজন্যেই পুরোপুরি না হলেও অন্ততপক্ষে আংশিকভাবে বিজ্ঞানকে উদ্ভূত পরিস্থিতির দায়িত্ব স্বীকার করে নিতে হবেই। সুতরাং, এখানে একথাটা পরিষ্কার বেরিয়ে আসছে যে, যেসব বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে উপকারক বা অস্তিবাচকের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিকারক বা নেতিবাচক ফলাফল বেরিয়ে আসতে পারে, তাদের ওপরেও সামাজিক সংকট-মোচনের দায়দায়িত্ব বর্তায়।

সমাজের প্রতি বৈজ্ঞানিকদের দায়িত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন অবশ্য সুদীর্ঘকাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রশ্নটি জটিল এবং বহুমুখী। এর তন্তুগুলো বিজ্ঞানের নৈতিক দিকের সাধারণ মৌল সমস্যাবলীর তন্তুর সঙ্গে গাঁথা।

বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্ম থেকে যে সার্বজনীন দায়িত্বের উদ্ভব, তার ধারক হতে হবে তাই বৈজ্ঞানিকদেরই। বৈজ্ঞানিকদের দায়িত্ব হচ্ছে তাঁদের নিজ-সৃষ্টির তাৎপর্যের কিনারা করে দেওয়া। কারণ একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে প্রত্যাশাই এইযে, তিনি তাঁর নিজসৃষ্টির প্রামাণ্যতার যাঁচাই-এর ব্যাপারে অপরের চেয়ে বেশি কঠোর হবেন। সহকর্মীদের উদ্ভাবনকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে সততা, নিজের উদ্ভাবনের বিশ্লেষণে পক্ষপাতহীন বিচার ও সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষেত্রে ত্রুটিহীন যৌক্তিকতার পরিচয় দিতে হবে বৈজ্ঞানিককে সর্বসমক্ষে। এগুলো হবে বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ববোধের প্রতীক।

ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। এই নিয়মগুলোকে নিয়েই কার্যত বৈজ্ঞানিকদের নৈতিকতা গঠিত। এটা আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনি রয়েছে।

বৈজ্ঞানিকের দায়দায়িত্বকে যখন কারিগরিবিদ্যা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে প্রযোজিত কাজকর্মের পদ্ধতি ও ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তখন সংকটের পরিমাপটা বিশদভাবে হিসেবের মধ্যে ধরা পড়ে। অবশ্য, কোনো একজন বৈজ্ঞানিক একটা সংকট কাটাতে সক্ষম অথবা তিনিই সংকটের সমাধানও দিতে পারেন বলে যদি কেউ মনে করেন, তবে সেটা হবে অতি-সরলীকরণ। আসল কথা এই যে, বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক রায় এবং গোষ্ঠীর বৃত্তিগত নৈতিকতাকে জড়িয়েই সংকটের উদ্ভব। এখানে তাই বৈজ্ঞানিকরা যৌথভাবে বিবেচ্য।

সংকটমোচনের দায়িত্বগ্রহণে বৈজ্ঞানিকদের যৌথ উদ্যোগের একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে। ঘটনাটা যথেষ্ট ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও বিজ্ঞাপিত। বিশ্বের বৈজ্ঞানিকেরা জীববিদ্যাসংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে 'জীন-ইনজিনিয়ারিং' বা বংশানুক্রমিকতার মৌল আণবিক উপাদানের লালন ও রূপান্তর-সাধনের প্রকৌশলী প্রচেষ্টাকে স্বেচ্ছায় একমত হয়ে স্থগিত রেখেছেন। এর কারণ হলো এই যে, বিজ্ঞানের এই অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রকৌশলী গবেষণার ক্ষেত্রে চাই পুরোপুরি বিপদমুক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ। এই ধরনের পদ্ধতি তৈরি করা না গেলে অথবা কোন ধরনের অসাবধানতা কিংবা অনবধানতা ঘটে গেলে মৌল প্রতিকারের উপাদানটাই বৈজ্ঞানিকদের অজানা থেকে যাবে। এর ফল হতে পারে এই যে, এতে এমন কোনো মড়কের বীজ বোনা হবে, যার বিরুদ্ধে কোনো ওষুধ কিংবা প্রতিষেধক বার করা যাবে না। এই ধরনের পরিণাম সারা বিশ্ববাসীর জন্যে বিপদ ডেকে আনতে পারে।

১৯৭৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসিলোমারে এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে এই প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছিল। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞেরা এতে যোগ দিয়েছিলেন। খুব একটা ঝাঁজালো আলোচনার পরে উপরোক্ত 'মোরাটরিয়া'ম বা স্থগিতকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে যে কোনো রকমের সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে সাবধানতামূলক বিস্তারিত ও সুচিন্তিত ব্যবস্থার নিশ্চয়তা-বিধান না হওয়া পর্যন্ত জীন সংক্রান্ত প্রকৌশল-গবেষণা মুলতুবি রাখা হয়। এই স্থগিতকরণের বিরোধীরা "বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের স্বাধীনতা"র কথা পেড়েছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাধারণ বুদ্ধিরই জয় হয়। অধিকাংশ

দেশেই এখন 'জীন'-প্রকৌশল-গবেষণার ব্যাপারে উপযুক্ত নিয়মাবলী গ্রহণ করা হয়েছে এবং কোন কোন দেশে উপযুক্ত আইনও বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিকদের এই যৌথ প্রচেষ্টার ফলে একটা বড় রকমের বিপদ নিবারিত হয়েছে। আসিলোমার সম্মেলনের সিদ্ধান্তটি বিপদের সম্মুখীন বৈজ্ঞানিকদের দায়িত্বশীল উদ্যোগের একটা আদর্শ পদক্ষেপের দাবিদার হতে পারে। এই বিপদ একটা ব্যাপক বিপর্যয়ের আকার নিতে পারতো এবং একটা সংকট ডেকে আনতে পারতো।

বৈজ্ঞানিকেরা একই ধরনের আরেকটা দায়িত্বের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায়। রোগনিবারক ভেষজ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। এহেরলিখ তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন প্রথম সিফিলিস-নিবারক ওষুধ '৬০৬' বটিকা উদ্ভাবন করে। সে সময়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ একটা বিশেষ নীতি-দ্বারা পরিচালিত হতো। আজও পর্যন্ত গ্রীক বিজ্ঞানী হিপোক্রেটাসের নামে যে শপথ নেন চিকিৎসকেরা, তা থেকেই একটা নীতি অলংঘ্য বিধান হয়ে রয়েছে। শপথ বাণীটি হলো: "সবচেয়ে বড় কথা, কোনো ক্ষতি যেন না হয়।" (Primum no noceus)। এহেরলিখ আরেকটা নীতির অবতারণা করেছিলেন এবং সাহসের সঙ্গে সেটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন: "সবচেয়ে বড় কথা, (লোকের) ভাল করতে হবে।" (Primum ut proficeas)।

বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ববোধ ও বিবেকের প্রতি প্রত্যক্ষ নির্দেশ হচ্ছে এই নীতি দুটো। এদের দ্ব্যর্থহীন ব্যাপকতম সার্বজনীন তাৎপর্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চালু কাঠামোটাকে ছাড়িয়ে চলে যায়। সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর উদ্ভব সদাসর্বদাই লেগে থাকে এবং এদের বিরুদ্ধে কোন একটা মাত্র নিবারক ব্যবস্থাপত্র দাখিল করা যায় না। বৈজ্ঞানিককে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অবস্থার সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে দেখতে হয় এবং সিদ্ধান্ত-গ্রহণের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়।

এহেরলিখ যখন তাঁর ওষুধটির প্রস্তাবনা করেন, তখন ঝুঁকিটা ছিল খুবই বড় রকমের। এক কথায় এই ঝুঁকিটাকে বিশাল বলা যেতে পারে। দাঁড়ি-পাল্লার একটি পাত্রে ছিল একটা ভয়ঙ্কর, অত্যন্ত ব্যাপক এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বগ্রাসী রোগ। পাল্লার অপর পাত্রে ছিল একটা প্রতিশ্রুতিবাহী ওষুধ, যার পুরো পরীক্ষানিরীক্ষা তখন পর্যন্ত হয়নি। এই ওষুধের ঔপসর্গিক প্রতিক্রিয়া বিপজ্জনক হতে পারতো। বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব ছিল খুবই ভারী।

কিন্তু এহেরলিখের মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, তিনি সঠিক ওষুধ তৈরি করেছেন এবং তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষাগুলো বিশ্বাসযোগ্য। এর ফলেই "সবচেয়ে বড় কথা, ভাল করো" নীতির জয়জয়কার হলো। ক্ষতিকরতার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও এহেরলিখ তাঁর তৈরী করা ওষুধটি ব্যবহার করাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এইভাবে একটা ভয়াবহ রোগকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

উদ্ভূত বিপদকে পরাস্ত করার সঠিক পথ বের করার জন্যে বৈজ্ঞানিককে বারবার তাঁর বিবেকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। বিশ্বগ্রাসী বিভিন্ন সমস্যা বৈজ্ঞানিককে নিঃসন্দেহে বাধ্য করবে এ ব্যাপারে। এটা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক সমাজের নাগরিক সচেতনতার সঙ্গে জড়িত। ক্ষতিকর ও মৃত্যুবাহী প্রতিক্রিয়ার আস্তানাগুলোর বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালানোর জন্যে এবং পরিণাম চিন্তা না করে গবেষণা চালিয়ে কিংবা না-জেনে না বুঝে বিভিন্ন বিশ্বগ্রাসী সমস্যা সৃষ্টি করে বলে বিজ্ঞান নিজেই যে ক্ষতি করে বসতে পারে, তার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে সুরক্ষিত করার জন্যে বৈজ্ঞানিকদের ব্যাপক জনগণের সঙ্গে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে।

সাম্প্রতিককালে পশ্চিমী বৈজ্ঞানিকদের কোন কোন পত্রপত্রিকা "প্রতি-বিজ্ঞানের আওয়াজ"কে সামনে এনেছে। দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনের মুখে এসে হাল ছেড়ে বসে যাওয়া ছাড়া এর আর অন্য কোন অর্থ হতে পারেনা। এটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতিতে 'ইতি' দেওয়ার জন্যে ডাক দেবার শামিল। জর্জেস পম্পিদু জাতিসংঘের শিক্ষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংসদ ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে যা বলেছিলেন, সেটা এরকমেই একটা ডাক। তিনি বলেছিলেন, "বিজ্ঞানের অগ্রগতি যে কারিগরি প্রগতির প্রসার ঘটাচ্ছে তা হলো মানুষের মনের সৃষ্টি। তৎসত্ত্বেও কি একে নিতান্ত বাহ্যিক, বিচ্ছিন্ন এবং ইতিমধ্যেই অসহনীয় হয়ে-ওঠা ব্যাপার বলে মনে করাই আমাদের পক্ষে সমীচীন নয়? আমরা যদি আমাদের যুক্তির ক্ষমতাকে মানুষের প্রকৃতির জগতের অজানিত শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্মিলিত করতে না পারি, তাহলে একটা আদিম অবস্থাতে অথবা বর্বরতার একটা নতুন কাঠামোতে ফিরে যাওয়াকে আমরা বিপদ হিসেবে না দেখে একটা অর্জনীয় উদ্দেশ্য হিসেবেও ঠিক করে নিতে পারি?"

পশ্চিমী পুঁজিবাদী জগতের একজন রাজনৈতিক নেতার এই বিবৃতিকে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ হিসেবে দেখা উচিত। যে বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের স্রষ্টা, তাদের বিরুদ্ধেও এটা অভিযোগ হিসেবেই বিবেচ্য।

আমার মনে হয়, যেখানে সমাজ বৈরিতামূলক বিরোধে ধ্বংসপ্রায়, সেখানে

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রগতির নেতিবাচক ফলাফলের কিছুটা দায়িত্ব বৈজ্ঞানিকদের ওপরেও বর্তাচ্ছে। এখানে বৈজ্ঞানিকেরা যদি দায়িত্ব এড়াবার জন্যে তাঁদের সহযোগিতাকে বস্তুতপক্ষে অসহযোগিতায় পরিণত করেন এবং যদি বিশ্বের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিনিধি মহলে তাঁদের অবস্থানকে "আমরা কোনকিছুরই মধ্যে নেই"-ধরনের একটা নতুন পদ্ধতি হিসেবে খাড়া করেন, তবু নেতিবাচক ফলাফলের দায়িত্বের ভাগ তাঁদের নিতেই হবে। মিউনিখ-চুক্তির আমলে আন্তর্জাতিক ব্যাপার-স্যাপারে "কোনকিছুর মধ্যে না থাকার" দুর্ভাগা-নীতির দুঃখময় ফলাফলের কথা পুরানোদের মধ্যে অনেকেরই স্মরণ আছে। একজন বৈজ্ঞানিকের আচারে আচরণে যখন "কোন কিছুর মধ্যে না থাকার নীতি" নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার মধ্যে থাকে অশুভের বীজ।

উপরোক্ত বিষয়কে বিবেচনার মধ্যে রেখে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরা বৈজ্ঞানিকের যৌথ দায়িত্বের বিবেচনাকে স্বাগত জানান।

বিশ্বে এখন বৈজ্ঞানিকদের জন-আন্দোলনে যোগ দেবার বিভিন্ন প্রশস্ত মঞ্চ গঠিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাগোয়াশ আন্দোলন এবং বৈজ্ঞানিক কর্মীদের বিশ্ব-ফেডারেশন ও বিভিন্ন দেশে তাঁদের বিভিন্ন স্বতন্ত্র সংগঠনের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজ্ঞানে সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্যে গঠিত বৃটিশ সমিতি "বৃটিশ সোস্যাইটি ফর সোস্যাল রেস্পনসিবিলিটি ইন সায়েন্সে"র মতো বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এখানে উল্লেখযোগ্য। ঠিক এই সময়েই বিশেষ করে এমন কতকগুলো বিশ্বগ্রাসী বৃহদাকার সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে যেগুলো আধুনিক জীবনের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করতে পারে। এই সময়েই বৈজ্ঞানিকেরাও তাঁদের দায়িত্ববোধের পরিচয় দিচ্ছেন। এই ঘটনাকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি বলে মনে করি।

ব্যক্তির পরিচয় বা আইডেনটিটির সমস্যা নিয়ে এবার কয়েকটি কথা বলবো। সম্প্রতি এই ব্যক্তিসত্তার আইডেনটিটি বা পরিচয়ের সমস্যা পুঁজিবাদী দেশ-গুলোতে বৃহৎ আকার ধারণ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি সংকলন গ্রন্থে বর্তমান বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের বিভিন্ন প্রশ্নের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এতে রোম-ক্লাব-প্রমুখ সংস্থা উপরোক্ত বিষয়টিকে গভীর ও ব্যাপকভাবে তলিয়ে দেখেছে।*

---

* ইয়োশিকারু সাকামোটো—
'টুওয়ার্ড গ্লোবাল আইডেনটিটি'। আমস্টার্ডাম থেকে ১৯৭৫ সালে এম এইচ মেগুলোভিচ কর্তৃক সম্পাদিত। 'অন দি ক্রিয়েশন অব এ জাস্ট ওয়ার্লড অর্ডার' পত্রে প্রকাশিত। পৃঃ ১৮৯-২১০।

এই ব্যক্তিসত্তামাত্রেরই পরিচয় বা আইডেনটিটি কথাটার অর্থ কি? খুব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের যে আন্তঃসম্পর্ক, তার সঙ্গে জড়িয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজের মূল্য-নির্দেশ হলো এই আইডেনটিটি বা তার ব্যক্তিসত্তার পরিচয়। অর্থাৎ, যে অগণিত ব্যক্তি তার মতো একই রকমের হয়েও তার থেকে ভিন্নরূপ; তাদের মাঝখানে মানুষের নিজের অবস্থানটিকে বুঝে নিতে পারাই হলো তার আইডেনটিটি বা পরিচয়। এটা হলো যেকোন একজনের নিজের গুরুত্ব, মূল্য এবং সর্বোপরি তার অস্তিত্বের তাৎপর্য। সামাজিক ব্যবস্থার প্রকৃতির ওপর নির্ভর করেই একক ও সমষ্টি, ব্যক্তি এবং গণ, মানুষ ও সমাজের সম্পর্কগত সমস্যাটির সমাধান নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে।

বর্তমান নগর-সম্প্রসারণের ব্যাপারটাকে "পরিচয়"-সংকটের একটা প্রধান কারণ রূপে দেখতে হবে। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে বেলজিয়ান কবি এমিল ভেরহায়রেন অক্টোপাস-নগরীকে আক্রমণ করে বলেছিলেন যে, এর নির্মম দাঁড়াগুলো ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে এবং গুলিয়ে যাওয়া ব্যক্তি-মানুষকে আঁকড়ে ধরে তার অন্তঃসারটিকে শুষে নিচ্ছে। এর ফলে মানুষ তার নিজের মূল্য সম্বন্ধে চেতনা হারিয়ে বসেছে।

নগর-সম্প্রসারণের যে সুবিধা এবং সৌকর্যের দিকও রয়েছে, সেটা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু যখন এই ব্যাপারটার চূড়ান্ত করে ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন সুবিধার বদলে বিপরীতটাই আসর গাড়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে এটাই ঘটেছে। প্রত্যাশিত বৈষয়িক উপকারের পরিবর্তে এই ব্যবস্থাতে মানুষ পাচ্ছে ভয়ানক রকমের আত্মিক দারিদ্র্য। সে অসংখ্য মানুষের ভিড়ের চক্করের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। এই চক্করের কাছে সে একটা নিঃসম্পর্কীয় লোক এবং এর কাছে তার অস্তিত্বটাই নিরর্থক। সভ্যতা, প্রগতি ও স্বস্তি এবং নিরাপত্তার উপহারের বদলে মানুষ পাচ্ছে অক্টোপাস-নগরীর হিমেল এবং নিষ্ঠুর দাঁড়ার আলিঙ্গন। নগর-সম্প্রসারণ-বাদের খড়্গ প্রথমত আঘাত করছে ব্যক্তিসত্তাকে। এই ব্যক্তিত্বহরণের পরিণাম হচ্ছে পরিচয় বা আইডেনটিটির বিলোপ।

উপরে উল্লিখিত সংকলনগ্রন্থের লেখকেরা নগর সমস্যার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এর অস্তিবাচক ও নেতিবাচক দুটো প্রবণতাই রয়েছে। এর নেতিবাচক প্রবণতা 'পরিচয়ের সংকট' সৃষ্টির একটা কারণ, এটাই তাঁদের অভিমত। তাঁদের বক্তব্যের বিস্তারিতে না গিয়ে দৃষ্টান্ত

দ্বারা বুঝিয়ে বলার জন্যে আমি পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তি পরিচয়ের বিভিন্ন অভিব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত সহজ ও সরল নির্ঘণ্টের মারফত দাখিল করছি। উল্লিখিত সংকলনগ্রন্থে ১৯৫নং পৃষ্ঠায় ব্যক্তিসত্তা-বিষয়ক অভিব্যক্তিগুলোকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন সাকামোটো :

আইডেনটিটি বা পরিচয় বা ব্যক্তিসত্তার সংকটের প্রকাশ

(সাকামোটোর ছক)

ব্যক্তিসত্তা	অস্তিবাচক সত্তা	নেতিবাচক সত্তা
বহির্মুখী :	সহমর্মিতা :	আগ্রাসী মনোভাব
সামাজিকতাপ্রবণ	অন্তর্ভুক্তি	বৈষম্য
	প্রতিযোগিতা	হিংসা
নিরপেক্ষ	নিজনিজ অধিকার	নিস্পৃহতা
	স্বাধীনতা	উপেক্ষা
	নিরাধিপত্য	আত্মসমর্পণ
অন্তর্মুখী :	আত্মপ্রতিষ্ঠা	আত্মবিধ্বংসিকতা
ব্যক্তিসত্তাপ্রবণ	জীবনব্যাপী শিক্ষা ও আত্মানুশীলন	মাদকদ্রব্যে আসক্তি, আত্মহত্যা

আজ এই 'পরিচয় সংকট'ই বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য ধরণের সংকট, যেমন জ্বালানি অথবা কাঁচামাল প্রভৃতির সংকট ব্যক্তি-মানুষকে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আঘাত করে। কিন্তু পরিচয়ের সংকট ব্যক্তি-মানুষকে সোজাসুজি আঘাত করে এবং তার অন্তর্জগত ও মূল্যবোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই কারণেই এই সংকটটাকে বাইরে থেকে অস্থায়ী বলে মনে হলেও এর আঘাতগুলো নিরন্তর ও নির্মম। একে যেন কোনভাবেই হাল্কা করে দেখা না হয়।

'পরিচয় সমস্যার' অন্তর্মুখিতার প্রবণতার ক্ষেত্রে এর অভিব্যক্তি বটে একান্তভাবে ব্যক্তিকে ধরে। অন্তর্মুখিতা কথাটার এটা অবশ্য আভাষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে পরিচয়-সমস্যার অন্তর্মুখিতার দিক থেকেও এটা বহু সংখ্যক মানুষেরই সমস্যা। এখানে 'নঞার্থক পরিচয়' একটা জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যা।

উপরোক্ত ছ'কে সর্বশেষ পংক্তিতে যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে গিয়ানার জোন্‌সটাউনের হৃদয় বিদারক ঘটনার স্মারক। এতে প্রায় ৯ হাজার প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। প্রাচীন ইজিপ্টে আদি খ্রীষ্টীয় আমলে এবং মধ্যযুগের অন্ধকারময় দিনগুলোতে যৌথ-আত্মহত্যা ঘটতো। কিন্তু জোন্‌সটাউনে হৃদয়বিদারী ঘটনার ব্যাপকতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন ঘটনা আধুনিক ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। শত শত পুরুষ ও নারী পুঁজিবাদী সমাজের অন্ধগলিতে আটকে পড়েছিল। নৈরাশ্যে ঘেরা জীবনের বেষ্টনী থেকে নিষ্কৃতির উপায় খুঁজছিল তারা। ঐশ্বর্য এবং সোনার শয়তানের মুল্লুকেই নিজেদের তারা হারিয়ে ফেলেছিল দারিদ্র্যের মরুভূমিতে। মৃত্যুর আগেকার মুহূর্তগুলোতে কী ভয়ঙ্কর অবস্থাই না হয়েছিল-তাদের মনের। যারা অন্যায় সমাজব্যবস্থার কাঠামোর ব্যবস্থাপক এবং যারা সমাজস্থ নরনারীকে জীবনের লক্ষ্য থেকে বঞ্চিত করে আত্মসত্তার সচেতনতা থেকে দূরে রেখেছে, তাদের বিবেকের ওপর উপরোক্ত ঘটনা নিরন্তর কষাঘাত করে যাবে নিশ্চয়।

'ব্যক্তিসত্তার পরিচয়ের এই সংকট' কতকগুলো সামাজিক যোগাযোগ ও ঘটনার পরিণতি। এর মূলে রয়েছে সমাজব্যবস্থার বিশেষ চরিত্র। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে যে বিশেষ ধরণের নগর-সম্প্রসারণের দরুণ ব্যক্তিসত্তারা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়, সেটা হচ্ছে এই সংকটের প্রধান কারণ। কিন্তু অন্যান্য কারণও রয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে যারা কাজকর্ম পাচ্ছে, তাদের ফুরসুৎ বাড়ছে, কিন্তু তাদের হাতে এমন কোন কিছু থাকছে না যাতে তারা কোন কিছু গড়ে তুলবার আনন্দ পেতে পারে। এই জন্যেই তাদের চারদিকে শূন্যতার চক্রব্যূহ। শূন্যতাবোধ তাদের মন ও মানসে নিয়ে আসে অনুভূতিহীনতা। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিসত্তাকে এর চেয়েও বেশি বিপন্ন করছে বেকার সমস্যা। এই বেকার সমস্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গায়ে এঁটে আছে এবং ছড়াচ্ছে এই বেকারত্বের বেষ্টনী। অগণিত ব্যক্তির মনে মূল্যহীনতার চিন্তা, অবাঞ্ছিত হওয়ার চিন্তা আসে এই বেকারত্ব থেকে। এই সমস্ত ব্যাপার যোগ হয়েই একটা "নঞর্থক সত্তার' সংকট তৈরি হয় এবং জীবনে নিয়ে আসে দিকভ্রান্তি ও আত্মিক বিপর্যয়।

বৈজ্ঞানিক এবং সর্বোপরি মানব-বিদ্যাসমূহে নিয়োজিত বৈজ্ঞানিকরা বঞ্চিত ও আত্মিক দারিদ্র্যে নিমজ্জিত মানুষ মাত্রের ব্যক্তিত্বধ্বংসী প্রাণঘাতী সংকটের গোড়ায় নেমে এর কারণগুলোর গভীর ও পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণ

করবেন এটাই আশা করা যায়। নৈরাশ্য ও আত্মহত্যাসহ 'নঙর্থক সত্তা'র বিভিন্ন চরম উপায়ে মানুষকে যেসব ঘটনা ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, বৈজ্ঞানিকদের কাজ হলো সেগুলোর কিনারা করা। এই সব কারণের মূলোচ্ছেদ করার উপায়-নির্ধারণও বৈজ্ঞানিকদের কর্তব্য।

কেউ হয়তো বলবেন, এসব সমস্যার জন্যে বৈজ্ঞানিকদের দায়-দায়িত্ব নেই, বৈজ্ঞানিকদের কাজকর্ম লক্ষ্যহারা মানব ও মানবীদের অন্ধকারময় জগতের জন্যে দায়ী নয়। কিন্তু তা বললে চলবে না। বিজ্ঞান কারিগরি বিদ্যার মাধ্যমে কারিগরি-প্রগতির মহাশক্তিধর চালকশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রগতি নির্ভর করছে সামাজিক ব্যবস্থার ওপর। সুতরাং প্রগতি মানুষ এবং তার লক্ষ্য থেকে, তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ থেকে দায়িত্ব তুলে নিয়ে সরে থাকতে পারে না।

বর্তমান সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ ব্যক্তির পূর্ণ আত্মবিকাশের জন্যে তার চিন্তার কথা জানায়, ব্যক্তিকে সদর্থক উপাদান দিয়ে জীবনের ক্ষেত্রকে ভরপুর করতে সাহায্য করে। সমাজ এখানে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে সর্বপ্রথমে সমগ্র নব-প্রজন্মের গড়ে ওঠার পরিচ্ছন্ন লক্ষ্যমাত্রা দাখিল করে। বয়স্কের পর্যায়ে যারা উন্নীত, সেই কর্মক্ষম ও কর্মোদ্যোগীদেরও সকলে সমাজের এই কার্যক্রমের শরিক।

আমাদের দেশের যুবসমাজকে সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে লিওনিদ ব্রেজনেভ বলেছেন, "যুবসমাজ এবং আমরা সবাই মিলে যা কিছু করছি এবং আমাদের নীতি ও বিশ্বাসের দরুন আমরা বয়স্ক ও তরুণ কমিউনিস্টরা স্বেচ্ছায় যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, তার গুরুত্বের এবং বিরাটত্বের ওপর আমরা জোর দিচ্ছি।" এই দায়িত্ববোধ আত্মিক শূন্যতাকে কোন অবকাশই দেয়না বাসা বাঁধবার। এই দায়িত্ববোধ ব্যক্তির জীবনকে সারসত্তা দেয় এবং পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও সদর্থক ব্যক্তিসত্তা বা পরিচয় গড়ে তোলার ভিত্তি তৈরি করে দেয়। সংকটের কোন অবকাশই থাকে না।

বিজ্ঞান এবং তার সেবক বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির শক্তিসমূহকে উন্মোচিত ও আয়ত্ত করার জন্যে আরও বেশি দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবেন। তাঁরা বোতলের মধ্যে থেকে যে দৈত্যদের বার করে আনছেন, তাদের আচরণ ও গুণপনাকে নিয়ন্ত্রিত করারও দায়িত্ব পালন করবেন তাঁরা। কিন্তু শুধুমাত্র এখানেই তাঁদের দায়িত্বের শেষ নয়। সমগ্র মানবসমাজের সামাজিক ভবিষ্যৎ রচনার কর্তব্য-কর্মে তাঁদের সমস্ত প্রগতিবাদী শক্তি এবং আন্দোলনের শরিক হতে হবে।

ডায়েরী

অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান ফ্রাঞ্জ মুহ্‌রী প্রাগে থাকার সময়ে ডাব্লিউ এম আর-এর প্রধান সম্পাদক কনস্তানতিন জারদভের সঙ্গে মিলিত হন এবং পত্রিকাটি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কারণ, পত্রিকাটি রাজনৈতিক ও আদর্শগত সংগ্রামে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করেছে। আলোচনাতে অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও ডাব্লিউ এম আর-এর মধ্যে আরও সহযোগিতা বৃদ্ধির কথা ছিল।

* * *

গুয়াতেমালার লেবার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, ডাব্লিউ এম আর-এর সম্পাদকীয় অফিসগুলো পরিদর্শন করেন। তিনি গুয়াতেমালার কমিউনিস্টদের কার্যক্রম এবং দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে পত্রিকাটির সম্পাদকীয় পর্ষদের সভ্যদের অবহিত করেন। তিনি গুয়াতেমালা কমিউনিস্ট পার্টি ও ডাব্লিউ এম আর-এর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির পন্থা সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর আমন্ত্রণে ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-এর প্রতিনিধিরা ঐ সমস্ত পার্টিগুলোর কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। ডাব্লিউ এম আর-এর সম্পাদকীয় পর্ষদের রুমানীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি বারবু জাহারেস্কু, মরক্কোর প্রগতি ও সমাজতন্ত্র পার্টির দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন এবং ডাব্লিউ এম আর-এর সম্পাদকীয় পর্ষদের ফিনল্যাণ্ড কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি এ্যালিস লিপ্পানেন, আয়ারল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির ১৭তম কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন।

* * *

জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আমন্ত্রণে ডাব্লিউ এম আর-এর সম্পাদক মণ্ডলীতে ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি মাক্কিয়া হুলেইমি এবং পত্রিকার সম্পাদকীয় পর্ষদের সুইডিস কমিউনিস্টদের লেফ্‌ট পার্টির প্রতিনিধি রোডনিওম্যান অগস্ট বেবেলের লেখা সমাজতন্ত্রে নারী বইটির শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন।

Vol. 7, No. 4 SANTI SWADHINATA
April, 1979 SAMAJTANTRA

MENDED-2008

আগামী সংখ্যার বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ

★ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের পুনর্গঠন

★ মার্কসবাদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলোচনা

★ সমাজতন্ত্র গঠনের অভিজ্ঞতার বিকৃতিসাধনের জবাব (ফরাসী কমিউনিস্টদের একটি গ্রন্থ সম্পর্কে সোভিয়েত বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য)

3 0 MAY 1979

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

★ বিপ্লব ও গণতন্ত্র

★ প্যালেস্টাইন আন্দোলনের উৎস

★ পশ্চিম জার্মান বহুজাতিক সংস্থা

★ বিষ্ণু দের ৭০তম বয়ঃক্রম জয়ন্তী

৭ম বর্ষ আগস্ট ১৯৭৯ ৮ম সংখ্যা

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

৭ম বর্ষ | আগস্ট, ১৯৭৯ | ৮ম সংখ্যা

সূচীপত্র

জন পিটম্যান : সল্ট-২ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ৩

John Pittman : Salt-II : The Treaty is Signed ; W. M. R

মত-বিনিময় : আলোচনা

: বিপ্লব ও গণতন্ত্র (আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন) ১৪

: Revolution and Democracy (International Scientific Conference) W. M. R

গুন্টার ক্রোবার : বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতিক সামাজিক ও মানবিক লক্ষ্য ৫৫

Gunter Krober : The Social and Humanist Orientation of Scientific and Technological Progress , W.M.R

তিমুর তিমোফিয়েভ : সামাজিক বৈর দ্বন্দ্বসমূহ গভীরতর হচ্ছে ৬০

Timur Timofeyev : Deepening of Social Antagonisms ; W. M. R

গ্রন্থ পরিচয়

জাহি কারকাবি	:	প্যালেস্টাইন আন্দোলনের উৎস	৮৯
Zahi Karkabi	:	Origins of the Palestinian Movement ; W. M. R	

তথ্য, সংখ্যা, সংবাদ

	:	পশ্চিম জার্মান বহুজাতিক সংস্থা	৯৫
	:	West German Multinationals ; W. M. R	
রণেশ দাশগুপ্ত	:	বিষ্ণু দের ৭০তম বয়ঃক্রম জয়ন্তী	১০১

সম্পাদক : জ্যোতি দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান

মনীষা গ্রন্থালয় [illegible]

৪/৩বি, [illegible]

সম্পাদকীয় দপ্তর

৪/৩এ, ওরিয়েন্ট রো

[illegible]কাতা-১৭

সল্ট-২ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল

জন পিটম্যান
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য, ডব্লিউ এম আর-এর সম্পাদকীয় মণ্ডলীর সদস্য

অত্যাধুনিক ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র-শস্ত্র সীমিতকরণ নিয়ে দ্বিতীয় চুক্তি (সল্ট-২) স্বাক্ষরিত হওয়ায় রাজনৈতিক দেঁতাতের সঙ্গে সামরিক দেঁতাতকে যুক্ত করার ধারাবাহিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটা নতুন দিক খুলে গিয়েছে।

অত্যাধুনিক ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে দেশগুলোর অর্থনৈতিক, কারিগরী ও সামরিক ক্ষমতা থেকে জাত সবচেয়ে আধুনিক দ্রব্যগুলো পড়ে। বিপরীত সমাজব্যবস্থা সম্পন্ন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী (অর্থনৈতিক ও সামরিক উভয় দিক থেকে) দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে পরিমাণ ও গুণের দিক থেকে এই জাতীয় মারাত্মক অস্ত্রের উৎপাদন সীমিতকরণ করা নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ঘটনাটি একটা সাধারণ সাদামাটা ঘটনা নয়। অসাধারণ জটিল অবস্থা অতিক্রম করে এই সাফল্য অর্জন করতে হয়েছে। ভিয়েনা বৈঠকের আগে একদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরভুক্ত সমস্ত দেশ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ও শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন, জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহ, শান্তি আন্দোলন এবং সমস্ত প্রগতিশীলশক্তি যখন এই চুক্তির আশু সম্পাদন দাবি করেছে সেই সময় আন্তর্জাতিক উত্তেজনা ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলতে থাকলে যাদের লাভ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর মধ্যেকার সেই কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন শক্তি আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করেছে—এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে আলোচনা চালাতে হয়েছে এবং এটা নিঃসন্দেহে উল্লেখ করার মতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর এই চক্র চুক্তি সম্পাদন বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল অথবা অন্তত না পারলে এই চুক্তির সঙ্গে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কিছু শর্ত যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এক তরফা কিছু সুযোগ-সুবিধা যা চুক্তির মূল নীতি অর্থাৎ সমান মর্যাদা, সম-নিরাপত্তা এবং সোভিয়েত ও মার্কিন স্বার্থসমূহের সম-ভাগের আদর্শ ব্যাহত করত। চীনকে তুরুপের তাস করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের

বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়িয়ে দেওয়ার যে-পরিকল্পনা কা
তাতে পরিস্থিতি আরো ঘোরালো করে তুলেছিল।

পরিস্থিতি যখন এই পরিমাণে প্রতিকূল তখন সম
শক্তি সল্ট-২ চুক্তি সম্পাদনের ঘোষণাকে যে স্বস্তি আর
জানাবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। পরমাণু অস্ত্রের প্র
করতে এবং অস্ত্র-শস্ত্রের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে
নিরস্ত্রীকরণের সেই চরম লক্ষ্য অর্থাৎ পরমাণু অস্ত্রের বং
এবং এই অস্ত্রের নতুন উৎপাদন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দিকে
চুক্তির ব্যবহার নতুন শক্তি যোগাবে।

১৯৮৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৈধ সল্ট-২ চুক্তি
গুলো কি কি?

প্রথমত সল্ট-২ চুক্তিতে পরিমাণ ও উৎকর্ষতা উভয় দি
ক্ষমতাসম্পন্ন মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের উৎপাদন সীমিত ব
আরোপ করা হয়েছে। চুক্তি কার্যকর হলে মার্কিন যু
ইউনিয়ন উভয়েই তাদের আন্তঃ মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক
বি এম), ডুবোজাহাজ বাহিত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র
মারাত্মক ধরনের বোমারু বিমান এবং আকাশ থেকে
ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের (এ এস বি এম) সংখ্যা সীমিত
টেনে আনবে।[১] এছাড়া ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে
অস্ত্রের উৎপাদন কমিয়ে ২ হাজার ২৫০ করবে।

এই সীমিতকরণ শর্তাদির মধ্যে আই সি বি এমের,
স্বয়ংক্রিয়তাকে সব দিকের লক্ষ্যে আঘাত করতে সক্ষম
এমের এবং ৬শ' কিলোমিটারের বেশি যাদের নাগা
পাহারাদারি ক্ষেপণাস্ত্র সমৃদ্ধ বিশালাকার বোমারু উৎপ
ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত উভয় দেশেই বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানে
অস্ত্র-শস্ত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে-অগ্রগতি ঘটবে
দু-দেশের নেতৃবৃন্দ অস্ত্র-শস্ত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সে
জ্ঞান কাজে না লাগাতে সম্মত হয়েছেন।

জাতীয় কারিগরী জ্ঞানের সাহায্যে অস্ত্রের অবস্থা

সম্পর্কে চুক্তিতে বলা হয়েছে একে অপরের তদারকী-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ চলবে না।

অত্যাধুনিক ক্ষমতা সম্পন্ন মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের সীমিতকরণ নিয়ে পরবর্তী আলোচনার জন্যে নীতি ও মৌলিক নির্দেশাবলী সম্পর্কিত যুক্ত বিবৃতিতে সল্ট-৩ নিয়ে আলোচনা ত্বরান্বিত করা এবং সে-ব্যাপারে একটি কাঠামো প্রস্তুত করার কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। এর দ্বারা এটা বোঝা যাচ্ছে যে অত্যাধুনিক ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র-শস্ত্র সীমিতকরণ সংক্রান্ত আলোচনা একটি ধারাবাহিক সচল প্রক্রিয়া।

পূর্বের ঘটনা থেকে এটা দেখা গিয়েছে সল্ট ২ চুক্তি সরাসরি অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে না পারলেও এই প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার গতি শ্লথ করতে পেরেছে। ১৯৭২ সালের মে মাসে মস্কোয় এবং ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে-এ ভ্লাডিভস্তকে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কের অন্তর্নিহিত মৌল নীতি অনুযায়ী এই চুক্তি ও সোভিয়েত-মার্কিন যুক্ত ইস্তাহার প্রণয়ন করা হয়েছে। মস্কোতে অনুষ্ঠিত আলোচনা থেকে দু-দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের মৌল নীতিসমূহ যা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে উভয়ে এই সত্য উপলব্ধি করেছে যে পরমাণু যুগে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের ওপর ভিত্তি করে পারস্পরিক সম্পর্কের বিকাশ করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নাই এবং তারা এই যৌথ সংকল্প গ্রহণ করেছে।

সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের কাঠামোগত ভিত্তি যে শক্তিশালী করা প্রয়োজন এবং সেই কারণে দু-দেশের সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করা প্রয়োজন ভিয়েনা বৈঠকে এই সত্য পুনরায় স্বীকৃত হয়েছে। সোভিয়েত-মার্কিন যুক্ত ইস্তাহারে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে "সম্পূর্ণ সমান মর্যাদা, সমনিরাপত্তা, সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং একে অপরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ওপর ভিত্তি করে এই সহযোগিতা প্রসারিত করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস করা এবং রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ধরে পারস্পরিক সুবিধাজনক সম্পর্কের বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করতে হবে এবং এইভাবে আন্তর্জাতিক স্থিতি ও বিশ্বশান্তির অগ্রগতি ঘটাতে হবে।" সল্ট-২ চুক্তিতে এই সব শর্ত পূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। সম নিরাপত্তার যে-নীতির ওপর ভিত্তি করে সল্ট-২ চুক্তি প্রণীত হয়েছে তা আজকের দিনে দেতাঁত ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দিক-চিহ্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমস্ত দেশের স্বার্থের এটা পরিপূরক।

সুতরাং সমস্ত দেশের জনগণ, তাদের গণসংগঠন ও সরকারগুলো সল্ট-২ চুক্তির যে-সদর্থক মূল্যায়ন করেছে চুক্তিটি যথার্থভাবেই সেই মূল্যায়নের যোগ্য। শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে এমন অঞ্চলে অস্ত্র প্রতিযোগিতা লক্ষণীয়ভাবে প্রতিরোধ করতে পারায় সল্ট-২ পরমাণু সংঘর্ষের বিপদ কমাতে সক্ষম হয়েছে। এই চুক্তির ফলে সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী দু-টি দেশের রণনীতিগত অবস্থান স্থিতিশীল করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে যার নিশ্চিত ফল স্বরূপ অন্যান্য দেশের সম্পর্কও ভালো হতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বাতাবরণ উন্নত করতে পেরেছে এবং বিভিন্ন শক্তির মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশ গড়ে তুলতে পেরেছে।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের প্রেসিডেন্ট এবং বিশ্ব-শান্তি আন্দোলনের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও অক্লান্ত রাজনীতিক লিওনিদ ব্রেজনেভ ভিয়েনা দলিল স্বাক্ষরকালে বলেছেন, "পরমাণু যুদ্ধের বিপদ থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার দায়িত্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তভাবে গ্রহণ করেছে। আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে এই যুদ্ধ না ঘটতে পারে। আজ যে-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার দ্বারা আমাদের সেই দায়িত্ব পালনের ইচ্ছাই পুনরায় প্রকাশ পেয়েছে। পরিমাণ ও উৎকর্ষতা উভয় দিক থেকেই অত্যাধুনিক ক্ষমতা সম্পন্ন মারাত্মক অস্ত্র সীমিতকরণ সল্ট-১ চুক্তিতে যা বলা হয়েছিল বর্তমান চুক্তিতে তার চেয়ে অনেক বেশি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এই চুক্তি কার্যকর হলে অত্যাধুনিক ক্ষমতা সম্পন্ন অস্ত্র শুধু সীমিত করা নয় তা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে।"

"সল্ট-২ চুক্তি সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে আমরা মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্ক এবং স্বাভাবিকভাবেই তার অনিবার্য ফল হিসাবে সমগ্র আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার সার্বিক উন্নতির পথে একটা বেশ বড় ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছি।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জেমস কার্টার তাঁর ভাষণে সল্ট-২ চুক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়ে বললেন, "ইতিপূর্বে সম্পাদিত সল্ট-১ চুক্তি, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র-বিরোধী চুক্তি পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা সীমিতকরণ চুক্তির মতো সল্ট-২ চুক্তিটিও আমাদের দুই দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রকৃত নিরাপত্তার ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে। উভয় পক্ষের সামরিক শক্তি এবং প্রস্তুতির ক্রম-

বর্ধমান প্রয়োজনীয়তার অবসান এই চুক্তির দ্বারা ঘটবে না তবে সল্ট-২ চুক্তিতে পরমাণু অস্ত্রের সংখ্যা ও উৎকর্ষতা উভয়ের ওপরেই গুরুত্বপূর্ণ নতুন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এবং কালক্রমে সল্ট-৩ চুক্তি সম্পাদনের দ্বারা এমন কি এর চেয়েও উল্লেখযোগ্য বিধিনিষেধ আরোপ করে ও সংখ্যা হ্রাস করে আরো নিরাপদ বিশ্ব গড়ে তোলার দিকে বর্তমান চুক্তি আমাদের পথ দেখাচ্ছে। সেই অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় আমরা বাধা সৃষ্টি করতে পারি না অথবা তা বিপদাপন্ন করে তুলতে পারি না।"

চুক্তি সম্পাদনের আগে কার্টার এই চুক্তির সমালোচক ও বিরোধীদের বক্রোক্তি খণ্ডন করেন। তিনি বলেন মার্কিন সিনেটের সংখ্যালঘু[২] অংশের এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হবে 'বিশ্ব শান্তির প্রতি একটি বিশাল ধ্বংসাত্মক আঘাত' যা বিশ্ববাসীর চোখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে 'যুদ্ধ-লিপ্সু' হিসাবে প্রতিপন্ন করবে'।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির এই সতর্কবাণী তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের দ্বারা পুনরুচ্চারিত হয়েছে। পররাষ্ট্র সচিব সাইরাস ভ্যান্স সমগ্র দেশে প্রচারিত এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এই চুক্তির কোনো অংশ সংশোধনের কথা বলার অর্থ সমগ্র চুক্তিটিই ধ্বংস করে ফেলার মারাত্মক ঝুঁকি নেওয়া। মার্কিন সিনেটের কোনো কোনো সদস্য চুক্তিটি সংশোধন করার যে-হুমকি ছেড়েছেন ভ্যান্স তার জবাব দিচ্ছিলেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, চুক্তির অনুমোদন যদি সিনেটে পরাজিত হয় তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নের[৩] সঙ্গে আবার এই চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালানো সম্ভব হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। ব্রাসেলসে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব হ্যারল্ড ব্রাউন বলেছেন, এই চুক্তি অনুমোদন না হলে ন্যাটো দেশগুলোর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরো জটিল করে তুলবে। কারণ, ন্যাটো প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা তাঁদের ইস্তাহারে বলেছেন, এই জোটের অন্তর্ভুক্ত সকল সরকারই 'নীতিগত-ভাবে এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে'।[৪]

সল্ট-২ চুক্তিকে কেন্দ্র করে যে-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সরকারি নেতাদের এই সব বিবৃতির মধ্যে দিয়ে তার বেশ কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। যেমন প্রথমত ভিয়েনায় চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে চুক্তিটির ব্যবহারিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া গিয়েছে কিন্তু মার্কিন সিনেট চুক্তিটি অনুমোদনের মাধ্যমে দ্বিতীয় পদক্ষেপ না-ও নিতে পারে।

দ্বিতীয়ত তাদের বিবৃতি থেকে জনগণ একথা বুঝতে পেরেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থপরগোষ্ঠী রয়েছে যারা আন্তর্জাতিক উত্তেজনা ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা জিইয়ে রাখতে চায় কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের এ-জাতীয় গোষ্ঠীর কোনো অস্তিত্ব নেই। তৃতীয়ত এই সব বিবৃতির মধ্যে দিয়ে একটি সত্য তারা স্বীকার করে নিয়েছে যে রাজনৈতিক দেতাঁতের সঙ্গে সামরিক দেতাঁত যুদ্ধ করার জন্যে বিশ্বব্যাপী যে-সংগ্রাম চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে তার প্রধান জাতীয় রণক্ষেত্র।

এই বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় যুদ্ধ বা শান্তির প্রশ্নে মার্কিন সমাজের দ্রুত মেরুভবন ঘটছে। গত সাত বছরে অর্থাৎ সল্ট-২ চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলাকালে মার্কিন জনমত গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাতে দেখা গিয়েছে শান্তির অনুকূলে মার্কিন জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্রমেই বাড়ছে (মোট জনগণের ৭৫ থেকে ৮১ শতাংশ) এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে বেড়েই চলেছে। ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া এবং লাওসের জনগণের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বছরের পর বছর ধরে যে কাণ্ডজ্ঞানহীন নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে তা জনমানসে গভীর ছাপ ফেলেছে। পেন্টাগণ ও তার সহযোগী ফিনান্স পুঁজিপতিদের, তার অতি লোভ (যারা একত্রে জনগণের বর্ধিত উৎপাদনের সবটাই ক্রমাগত উদরস্থ করে চলেছে) ক্রমশই জনগণের অসহ্য হয়ে উঠছে। স্থায়ীভাবে গণ-বেকারি দীর্ঘ দিনের পুরানো মুদ্রাস্ফীতির রোগ, ক্ষয়িষ্ণু শহরগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থা, একের পর এক অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দা—সংক্ষেপে বৈষয়িক ও মানসিক দিক থেকে নিরাপত্তা বোধের চরম অভাব—ক্রমবর্ধমান মার্কিন শ্রমজীবী জনগণের এটাই নিয়তি। শান্তির প্রশ্নটি ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং এই প্রশ্নে সকলকে সমবেত করতে পেরেছে। তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনের অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলী এবং মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার মতো রাজনৈতিক সমস্যাগুলোও শান্তির প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে।

জাতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ঘটনাবলী প্রভাবিত করার ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিকামী গরিষ্ঠ জনগণের যে আছে তার প্রমাণ বারবার পাওয়া গিয়েছে। পুনর্নির্বাচন প্রার্থী একজন রাষ্ট্রপতিকে তার প্রার্থী-পদ প্রত্যাহার করে নিতে শান্তিকামী মার্কিন জনগণ বাধ্য করেছিল এবং আর এক রাষ্ট্রপতিকে ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে বাধ্য করেছিল। শান্তিকামী

মার্কিন জনগণ বর্তমানে তার সংগঠনসমূহ পুনর্গঠন করছে এবং সল্ট-২ চুক্তির সমর্থনে শক্তি সমাবেশ ঘটাচ্ছে। পুরানো শান্তি সংগঠনগুলো আবার সক্রিয় করে তোলা হয়েছে এবং বহু নতুন সংগঠন গঠন করা হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ার একটি অপেক্ষাকৃত নতুন বৈশিষ্ট্য—শান্তি আন্দোলনে মার্কিন শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান অংশ গ্রহণ—ক্রমশই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। ১ই মে সল্ট-২ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, এই ঘোষণার আগেই দেশের তিনটি বৃহত্তম শিল্প ইউনিয়ন—ইউনাইটেড স্টীল ওয়ার্কার্স অফ অ্যামেরিকা (মোট সদস্য সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬০ হাজার), ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স (১৩ লক্ষ ৯৪ হাজার সদস্য এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ মেসিনিস্টস (৬ লক্ষ ৩০ হাজার সদস্য) সল্ট-২ চুক্তি অনুমোদন করেছিল এবং এই চুক্তির পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্যে প্রচার সংগঠিত করেছিল। শিল্প সংগঠনসমূহের শ্রমিক কংগ্রেসের মার্কিন ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদে সভাপতি জর্জ মিনি সম্পাদক-কোষাধ্যক্ষ লেন কার্কল্যাণ্ড এবং মার্কিন শিক্ষকদের ফেডারেশনের সভাপতি অ্যালবার্ট শঙ্করের নেতৃত্বে সল্ট-২ চুক্তি-বিরোধী শক্তিসমূহের, অপচেষ্টা শ্রমিকদের এই কাজের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হয়েছিল আর উল্লিখিত তিন ব্যক্তিই বর্তমানে দেশের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, শ্রমিক-বিরোধী, কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী এবং সোভিয়েত-বিরোধীগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত।

শান্তিকামী মার্কিন জনগণের নতুন সংগঠন 'সল্টের পক্ষে মার্কিন জনগণ'-র নেতৃত্ব দিচ্ছেন ছ-জন প্রখ্যাত মার্কিন নাগরিক: মারজোরি বেল্টন (নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে মার্কিন প্রতিনিধি,) ক্লার্ক ক্লিফোর্ড (প্রাক্তন প্রতিরক্ষা সচিব), রেভারেণ্ড থিয়োডর হেসবার্গ (নটরড্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি) টাউনসেণ্ড (মার্কিন ছুটস বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সহ-সচিব), হেনরি ক্যাবট লজ (প্রাক্তন মার্কিন সিনেটর এবং জাতিসঙ্ঘের প্রাক্তন দূত), চার্লস ইয়স্ট (জাতিসঙ্ঘে প্রাক্তন মার্কিনী দূত)। এই সংগঠনটি এবং এর সঙ্গে অন্যান্য সংগঠন যেমন নতুন পররাষ্ট্র ও সামরিক নীতির মোর্চা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি সংসদ, সামরিক ব্যয় হ্রাস জাতীয় কেন্দ্র ইত্যাদি মিলে মার্কিন জনগণের সকলশ্রেণী ও স্তরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

শান্তির প্রশ্নে মার্কিন জনগণের মধ্যে যে-মেরুভবন চলছে সেই প্রক্রিয়ায় এই জনপ্রবাদটি প্রমাণিত হয়েছে যে "ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায়"। সল্ট-২ চুক্তির শত্রুরা বর্তমানে দেশের চরম দক্ষিণপন্থীগোষ্ঠী ও ফ্যাসিবাদী

শক্তিসমূহের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে, যেমন জন বার্ক সোসাইটি, মার্কিন নাৎসী পার্টি, 'কাজের অধিকার' সংগঠন (এই সংগঠন শ্রমিক ইউনিয়ন-বিরোধী) কু ক্লাকস ক্লান এবং এই ধরনের উচ্ছিষ্টভোগী ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং স্থানীয় পুলিসের পোষা দালাল ইত্যাদি। নানা রঙের উচ্ছিষ্টভোগীদের এই বাহিনীতে দক্ষিণপন্থী এবং উত্তরাধিকার সূত্রে নকল বুদ্ধিজীবী, এ-জাতীয় দু-একজন তথাকথিত 'সম্মানীয়' ব্যক্তি বিরাজ করছেন। কিন্তু এরা সবাই আর্থিক-শিল্প-সামরিক সমাহারের পরগাছাদের যেমন কুখ্যাত 'মার্কিন নিরাপত্তা পরিষদ', 'শক্তির জোরে শান্তি প্রতিষ্ঠার মোর্চা' এবং দীর্ঘ দিনের পুরানো কট্টর সোভিয়েত-বিরোধী পল নিৎসের নেতৃত্বাধীন 'বর্তমান বিপদ সম্পর্কিত কমিটি'-র কাছ থেকে তাদের আদর্শগত শিক্ষা পেয়ে থাকে। এছাড়া, একচেটিয়া পুঁজিপতি পরিচালিত গণ-প্রচার মাধ্যমগুলোকে তাদের কমিউনিস্ট-বিরোধী ও সোভিয়েত-বিরোধী বিকারগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ-জাতীয় প্রচারে বেশি সময় এবং জায়গা দিয়ে থাকে।

নানান রকম মিথ্যা, যেমন কোথাও নিছক "রুশীরা এসে গেল" এই মিথ্যা কথা বলে প্রতারণা করা হচ্ছে, আবার কোথাও সেই পুরানো 'সোভিয়েত-হুমকির' কথাটা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে অথবা এ-প্রসঙ্গে খুব সাদামাটা-ভাবে 'আমেরিকার ক্রমবর্ধমান হীনমন্যতা ও দুর্দশার' কথা বলে সল্ট-বিরোধী প্রচার চালানো হচ্ছে। এই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'প্রথম আঘাত হানার সর্বাগ্রগণ্য ক্ষমতা' সম্পর্কে নানান জল্পনা-কল্পনা ছড়ানো হচ্ছে (এমন একটা দেশে এই জাতীয় জল্পনা-কল্পনা ছড়ানো হচ্ছে যে দেশের শীর্ষ স্থানীয় সমর নেতারা দিনরাত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত হানার ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে)। সোভিয়েত 'প্রতারণা' নিয়ে এবং চুক্তিতে সোভিয়েত ক্ষমতা যাচাই করার কোনো বাধ্য-বাধকতা না থাকার বিষয়টি নিয়ে অনেক জল ঘোলা করা হচ্ছে। সল্ট-২ চুক্তির বিরোধীরা 'জাতীয় নিরাপত্তা' নিয়ে অনেক 'উদ্বেগ' দেখাচ্ছে কিন্তু আসল কথা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের রণনীতিগত ক্ষমতার ভারসাম্যের বিষয়টি এরা হজম করতে পারছে না এবং এছাড়া সোভিয়েত-মার্কিন যুক্ত ইস্তাহারে কেউ সামরিক আধিপত্য অর্জনের চেষ্টা করবে না বলে যে-শর্ত দেওয়া আছে সেটাও এদের আকাঙ্ক্ষিত নয়।

একটু ধীর স্থির মাথায় পরীক্ষা করে দেখলেই এই সব যুক্তির অসারত্ব খুব সহজেই ধরা পড়ে যায়। সল্ট-২ চুক্তি উভয় দেশের মধ্যে একটি যুক্তিগ্রাহ্য

আপস। একতরফাভাবে কেউ ফায়দা কুড়াবার চেষ্টা করবে সল্ট ২ চুক্তিতে সে সম্পর্কে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং সমান নিরাপত্তা ও কোনো অবস্থাতেই তা হ্রাস করা হবে না এই নীতি থেকে সল্ট-২ চুক্তি প্রণয়ন করা হয়েছে। সল্ট-২ চুক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বেশি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগ তুলে যারা এর বিরুদ্ধে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছে তারা কিন্তু ভূগোল ও ইতিহাস কর্তৃক আরোপিত প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করে না। অপর তিনটি শক্তির পারমাণবিক সামর্থ্য এবং এদের মধ্যে দুটির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন নিয়ে তারা স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চুপ। আর এর বিপরীতে সমগ্র সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কাছে একমাত্র পারমাণবিক ছাতার কাজ করছে সোভিয়েত ইউনিয়ন—সল্ট-২ চুক্তির বিরোধীদের কাছে এটা সন্তোষেরই বিষয়। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিবেশী দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি রয়েছে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি সোভিয়েতের কোনো সামরিক ঘাঁটি নেই—সল্ট-বিরোধীরা এ বিষয়েও চুপচাপ। উপরন্তু সল্ট-১ চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের অতীত কাজকর্ম নিঃসন্দেহে সোভিয়েত 'প্রতারণা' নিয়ে যারা উদ্বেগ দেখানোর ভান করছে তাদের ভণ্ডামির মুখোস খুলে দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সল্ট-২চুক্তিতে সোভিয়েতের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্যে সুযোগ-সুবিধা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুবই কম বলে যে-যুক্তি হাজির করা হয়েছে তার অসারত্বও প্রমাণ করেছে।

কট্টর সোভিয়েত-বিরোধীদের এই সব মিথ্যাচারের সমুচিত ও নজির সৃষ্টিকারী জবাব শ্রমজীবী জনগণ দিয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স সল্ট-২ চুক্তির অবস্থান ব্যাখ্যা করে ইস্তাহার বিলি করেছে যাতে এই চুক্তির প্রতি সিনেটের অনুমোদনকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রবক্তাদের সনাতনী বিরোধিতা তীব্র ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে। এই ইস্তাহারে উল্লেখ করা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করদাতারা "গত ত্রিশ বছরে ২ ট্রিলিয়ন (১ ট্রিলিয়ন = ১০০০ কোটি) ডলার অযথা ব্যয় করেছে যা জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা, পূর্ণ কর্মসংস্থান ও আমাদের শহরগুলো পুনর্নির্মাণের কাজে ব্যয় হতে পারত"। এই ইস্তাহারে আরো বলা হয়েছে পেন্টাগনের এই বিপুল ব্যয় "আমাদের দেশের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা দূরে থাক তা" আরো হ্রাস করেছে। পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করার এটাই সময়"।(৫) কারিগরী মূল্যায়নের আধিবেশনিক দপ্তর থেকে ১৫ই মে যে-সমীক্ষা প্রকাশ

করা হয়েছে তাতেও এই সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে অত্যাধুনিক ক্ষমতা সম্পন্ন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে সর্ব-ব্যাপক যে-যুদ্ধ হবে তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যা ২২ কোটি থেকে কমে ৫ কোটি ৫০ লক্ষে দাঁড়াবে আর জীবিতরা 'মধ্য-যুগীয় অর্থনৈতিক অবস্থার সমতুল্য' অবস্থায় জীবন যাপন করবে।[৬]

সিনেটের কমিটিতে সল্ট-২ চুক্তি নিয়ে যে শুনানী হবে এবং গ্রীষ্ম অবকাশের পর সিনেট অধিবেশনে এই চুক্তি নিয়ে যে বিতর্ক হবে তাতে চুক্তি অনুমোদনের জন্যে সিনেটের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শান্তিকামী জনগণের সংগঠিত বাহিনীকে এগিয়ে যেতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি এই বাহিনীর অংশীদার হয়ে সল্ট-২ চুক্তিকে অনুমোদনের জন্যে সর্বতোভাবে সংগ্রাম চালাবে। অন্যান্য সংগঠনের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টিও এই গুরুত্বপূর্ণ সমাসন্ন সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্যে তার সকল সদস্যকে সমাবিষ্ট করেছে। পার্টি নেতৃত্ব জেলায় জেলায় ঘুরে এই প্রচারে জোয়ার সৃষ্টি করার প্রয়াস নিয়েছেন। এই সঙ্গে সল্ট-২ চুক্তি যারা সমর্থন করে এমন সিনেট সদস্যদের পক্ষে এবং সল্ট-২-বিরোধী সিনেট সদস্যদের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্যে পার্টি কর্মী ও নেতারা বাড়ি বাড়ি প্রচার চালিয়েছেন। সি পি ইউ এস এ-র সাধারণ সম্পাদক গাস হল এই প্রচার আন্দোলনে সাহায্য করার জন্যে সমগ্র দেশ সফর করেছেন। গত ২২শে মার্চ ডেইলি ওয়ার্ল্ডে'র কলামে গাস হল লিখেছেন "ইতিহাসের মানদণ্ডে সল্ট ২ চুক্তি আমাদের গ্রহে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে"। সি পি ইউ এস এ স্থির করেছে যে সিদ্ধান্তটি হবে জীবন।

পাদটীকা

১ আই সি বি এমের ৫ হাজার ৫শ' কিলোমিটারের বেশি নাগালের মধ্যে পড়ে, এস এল বি এম হ'ল সাবমেরিন বাহিত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, উড়ন্ত যান থেকে এ এস বি এম ছাড়া হয় এবং ৬শ' কিলোমিটারেরও বেশি এর নাগালের মধ্যে পড়ে। মোট সংখ্যার মধ্যে ভারী বোমারু সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই কিন্তু যার জন্যে এই বোমারুরা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ সেই আকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠে আঘাতে সক্ষম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সর্বাধিক সংখ্যা এতে নির্দিষ্ট করা আছে।

২ সল্ট ২ চুক্তির অনুমোদনের জন্যে মার্কিন সিনেটে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট প্রয়োজন। এর অর্থ সিনেটের মোট ১০০ জন সদস্যের মধ্যে ৩৪ জন (এরা চুক্তির বিরুদ্ধে ভোট করতে পারে) চুক্তিটির বিরুদ্ধে ভোট দিলেই তা আর অনুমোদন পাবে না। এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচকদের কাছে যে প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা হল বিশ্ববাসীর মরণ-বাঁচনের মতো একটি প্রশ্নের মীমাংসা কি সিনেট সদস্যদের সংখ্যালঘু অংশের দ্বারা নির্ধারিত হবে? সাংবিধানিক সংস্কার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রশ্নটি তাদের সামনে আজ খুবই প্রকট হয়ে উঠেছে।—লেখক।

৩ ইণ্টার ন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, ১৯৭৯ সালের ১৫ই মে সংখ্যা।

৪ এই পত্রিকার ১৯৭৯ সালের মে ১৭ সংখ্যা।

৫ ডেইলি ওয়ার্ল্ডের ১৯৭৯ সালের ১০ই মে সংখ্যা।

৬ ইণ্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন ১৯৭৯ সালের ১৬ মে সংখ্যা।

৭ ১৯৮০ সালে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে সরকারের সর্বস্তরের প্রশাসনিক অফিসাররা, কংগ্রেসের ৪৩৫ জন প্রতিনিধি এবং সিনেটের ⅓ অংশ সদস্য এই নির্বাচনে নির্বাচিত হবে।—লেখক।

বিপ্লব ও গণতন্ত্র

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-সম্মেলন

হাঙ্গেরিয় সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স' পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ পত্রিকার উদ্যোগে হাঙ্গেরির তিহানীতে গত এপ্রিল মাসের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত "বিপ্লব ও গণতন্ত্র" সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মেলনের কার্য-বিবরণী আমরা প্রকাশ করছি। সম্মেলনে উপস্থাপিত নিবন্ধগুলোকে এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। যে মুখ্য সমস্যাগুলি নিয়ে সম্মেলনে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় সেগুলিকে এই রকম কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত ও গণতান্ত্রিক রূপান্তর, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ও সামাজিক স্বার্থসমূহের বৈচিত্র্য, গণতন্ত্র ও বিপ্লবী প্রক্রিয়ার আন্তর্জাতিক উপাদান।

প্রথম প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে সম্মেলনে নিবন্ধ, বক্তৃতা ও আলাপ আলোচনায় যে মতামত প্রকাশিত হয় আমরা এখানে সেটা উপস্থিত করছি। প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে যাঁরা মত-বিনিময় করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন: ইটালীয় পত্রিকা নৌভারিভিস্তা ইন্ট্যারনাজিওনেল-এর সহ পরিচালক লুসিয়ানো এ্যামটোনেট্টি; ফিনল্যাণ্ড কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য এবং এ্যাজিটেশন ও প্রপাগাণ্ডা বিভাগের সম্পাদক অয়িত্তা ত্রিয়রকৃবাকা; কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির বিকল্প সদস্য পিটার বইচুক; ডাবলিউ এম আর পত্রিকায় বেলজিয়াম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি রবার্ট ফ্রান্সিস; সোভিয়েত বিজ্ঞান অকাদেমির সংযুক্ত সদস্য এবং ডাবলিউ এম আর-এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক ইভান ফ্রলভ; অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ব্রুনো ফার্চ; বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গিগিন গিগিনভ, ডি, এস সি (দর্শন); ইসরায়েল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য এমিলি হাবিবি; রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যাণ্টোনিও জান্নাজো; গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্ব ও ভাবাদর্শগত কমিটির সদস্য মনটি

জমস্টোন ; ডাবলিউ এম আর পত্রিকায় তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি কামাল কেরভান ; সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজ-বিজ্ঞান অকাদেমীর প্রো-রেক্টর অধ্যাপক ইভরি ক্রাসিন ; হাঙ্গেরিয় সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজ-বিজ্ঞান ইনসটিটিউট-এর পরিচালক সানডোর লাকোস ; ফিলিপিন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জোস লাভা ; মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোস লুই ম্যালো ড মোলিনা ; ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ঐতিহাসিক ক্লদ মাজাউরিক ; ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সদস্য সারদা মিত্র ; রুমানীয় পত্রিকা ইরা সোস্যালিস্তা-র সহ প্রধান সম্পাদক আওন মিত্রান ; দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবাদিক ইসপ পাহাদ, পি এইচ-ডি ; ডাবলিউ এম আর-এ গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি বার্ট রামেলসন ; মঙ্গোলীয় পিপলস রিপাবলিকের বিজ্ঞান অকাদেমীর ইতিহাস ইন্‌সটিটিউট-এর বিভাগীয় প্রধান মাগসারজাভিন সান্‌ঝ্‌দোরজা ডি-এস-সি (ইতিহাস) ; সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ লেনিনবাদ ইন্‌স্‌টিটিউটের বিভাগীয় প্রধান আলেকজাণ্ডার সোবোলেভ ডি এস সি (দর্শন) ; বুলগেরীয় পিপলস রিপাবলিকের রাষ্ট্রীয় পরিষদে পরামর্শদাতা, বুলগেরীয় আইনজীবী ইউনিয়নের সভাপতি বরিস স্পাসভ ; গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডিমিট্রিস সারাস ; উরুগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ইডুয়েরডো ভিয়েরা ; জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বোর্ডের সদস্য হোর্স্ট ভিলহেলম এবং ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-এর প্রধান সম্পাদক কনস্টান্টিন জারদভ ডি, এসসি (ইতিহাস)।

১ সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত ও গণতান্ত্রিক রূপান্তরের অনুসন্ধান-ধারা

বিপ্লবের তত্ত্ব সংক্রান্ত পদ্ধতিবিদ্যার প্রশ্নের মধ্যে প্রধান বিষয়-গুলো ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সমস্যাবলী সমাধানে সৃষ্টিশীল অনুসন্ধান-ধারার সংজ্ঞা নির্ধারণ, গণতন্ত্রের সংগ্রামের সঙ্গে আঙ্গিকভাবে সম্পর্কিত বিপ্লবী প্রক্রিয়ার ডায়ালেকটিকস-এর বিশ্লেষণ, সংগ্রামের নতুন নতুন

সম্ভাবনার মূল্যায়নে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা এবং প্রতিটি দেশের সাধারণ সমধর্মিতা ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলোর বিচার-বিবেচনা।

এডোয়ার্ড ভিয়েরা বলেন, আজ অনেকগুলো ধনতান্ত্রিক দেশে মেহনতি মানুষ গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক দাবি অর্জনে সাফল্য লাভ করায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমাজতন্ত্রে যাওয়ার জন্যে নতুন নতুন পথের অনুসন্ধান চলছে। এগুলোকে আমরা বর্তমান সমাজতন্ত্রের বিরোধী কোনো কিছু বলে মনে করি না। বিপ্লবী প্রক্রিয়ার গভীরতা ও বৈচিত্র্য এবং নতুন নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়ার ফলেই ঐ ধরনের অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। আর এই সব নতুন সম্ভাবনার অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে দুনিয়ার একটা বিরাট অংশে সমাজতন্ত্রের সাফল্য আসার কারণে। অক্টোবর বিপ্লব, তার পর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ও অন্যান্য জাতির বিজয় এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করতে, একদা নিপীড়িত জাতি-গুলোর সচেতনতা জাগ্রত করতে এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামকে উদ্দীপিত করতে সহায়ক হয়েছে।

গণতন্ত্রের মুখ্য প্রশ্ন হল ক্ষমতার প্রশ্ন—আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষমতার প্রশ্ন। গণতন্ত্র জয়লাভ করার প্রকৃত অর্থ হল ক্ষমতা মেহনতি জনগণের হাতে, শ্রমিক শ্রেণীর হাতে হস্তান্তরিত হওয়া। বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের ভাঙন এবং প্রলেতারিয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে এই ভাবধারাটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে বিকাশ লাভ করেছে।

গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সূচিত করার সম্ভাবনার মধ্যে গুরুতর ভাঙাগড়ার স্থান নেই, এমন কথা বলা যায় না। এমন কি গভীরতর রূপান্তর সাধনের প্রক্রিয়াও ঐ ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে শুরু হতে পারে। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সাফল্য নির্ভর করে শ্রমিকশ্রেণী তার নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে পারে কিনা এবং বিপ্লবী প্রক্রিয়ার ধারার মধ্যে নতুন ক্ষমতার ভ্রূণ সৃষ্টি হয়েছে কিনা, তার উপর। যেমন, রুশ দেশে সোভিয়েতগুলো উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংস শুরু হয় এবং সোভিয়েতগুলোর প্রজাতন্ত্রের আকারে একটা নতুন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলোতে জনগণতন্ত্র কায়েম হয়। ভিয়েরা আরও বলেন, ভবিষ্যতে আরও নতুন ধরনের ক্ষমতার কাঠামো গড়ে

উঠবে। তিনি এই কথাটির উপর জোর দেন যে, একমাত্র সুগভীর গণতান্ত্রিক সাফল্যই গৃহযুদ্ধ ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সুনিশ্চিত করতে পারে। শুধু চিলি এখন আমাদের কাছে একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়—যেখানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর সাধনের পর বিপ্লব পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল ; কারণ ক্ষমতার প্রশ্নটি চূড়ান্ত ভাবে মীমাংসিত হয় নি।

এই বর্তমান সময়টিকে তিনি গণতন্ত্রের জন্যে ব্যাপক মোর্চা ও গণ-আন্দোলনের কাল বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু বার বার গণতন্ত্রের প্রশ্নটি -কে শুধু উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় ; এই ঘটনাটি মোটেই নজরে আসে না যে হাজার হাজার বছর ধরে নিপীড়িত জাতিগুলো এমন সব ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে নতুন জীবন শুরু করছে, যেগুলো (কাঠামো) মোটেই নিখুঁত নয়। যেমন লাতিন আমেরিকায়, বিশেষ করে উরুগুয়ের মতো দেশে, ৪০০ অধিবাসী পিছু ১ জন রাজবন্দী রয়েছে। এখানকার প্রধান কর্মসূচী হলো গণতন্ত্রের প্রশ্ন, ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বকে উচ্ছেদ করার প্রশ্ন এবং তার পর আসে গণতান্ত্রিক সাফল্যগুলোকে প্রসারিত করার কাজ। ফ্যাসিবাদ উচ্ছেদের ফলে গোটা লাতিন আমেরিকার পরিস্থিতির উপর প্রভাব পড়বে। ভিয়েরা বলেন, দুঃখের বিষয় কিছু বিজ্ঞানীর মত হলো লাতিন আমেরিকার একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে ফ্যাসিবাদী আখ্যা দিয়ে আমরা ভুল করছি। তাঁরা এটা বিচার করতে ব্যর্থ হচ্ছেন যে, এই সব বেশির ভাগ একনায়কতন্ত্র বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অগ্রগতির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের পাল্টা অভিযানের ফল।

আলেকজাণ্ডার সোবোলেভ বলেন, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং একচেটিয়া বিরোধী ও সামাজিক প্রগতির অন্যান্য কর্তব্য সমাধানের সংগ্রামে গণতন্ত্র এখন সংগ্রামের মুখ্য রূপ হয়ে উঠেছে। ঐ কর্তব্যগুলো সমাধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যে রূপান্তরিত হয়। একটি নতুন ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে উন্নত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংগ্রামের স্বাধীন গণতান্ত্রিক স্তরের উদ্ভব এই সত্যটির সঙ্গে জড়িত যে বিকাশ-প্রক্রিয়ার জটিল ও আঁকাবাঁকা চরিত্রের জন্যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের আওতায় গণতান্ত্রিক কর্তব্যের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দিকগুলোর গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। মার্কসবাদী বিজ্ঞানীদের এই প্রামাণ্য তত্ত্ব ধনতন্ত্রের সামাজিক-আর্থনীতিক বিশ্লেষণ আরও সমৃদ্ধ করে তোলার পক্ষে সহায়ক এবং ধনতন্ত্র গণতন্ত্রের সমস্যাবলীর সমাধানে সক্ষম—এই ভুল ধারণাও সংশোধন করতে পারে।

বক্তা আরও বলেন, বিপ্লবের তত্ত্বে এই সব সমস্যা উদ্ভবের কারণ হলো দুনিয়ার বিকাশ-ধারার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো। প্রথমত, সমাজতন্ত্রের সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিপক্কতা, এর অর্থনৈতিক ক্ষমতার সংহতি, সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং এবং বিভিন্ন দেশে নতুন সমাজ ব্যবস্থার বিস্তৃতি। এসব কিছুই বিপ্লব ও গণতন্ত্রের পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতার উপযোগী এক নতুন ও অনুকূল সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় উপাদান হল ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট গভীরতর হওয়া। আমরা এখন এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করছি যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নি। ধনতন্ত্র তার আত্মরক্ষা ও শক্তিবৃদ্ধির জন্যে এক বিশাল যন্ত্র গড়ে তুলেছে। যদিও ইতিহাসের বিচারে তার দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। এই গোটা যন্ত্রটি মূলগতভাবে জনবিরোধী এবং সেই জন্যে এটা একচেটিয়ার দ্বারা শোষিত শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের মধ্যে গণতন্ত্রের জন্যে এবং একচেটিয়াদের নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে অথচ সমাজতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত সমস্যাগুলোর সমাধানে তখনও প্রস্তুত হয় না। আবার এই সঙ্গে অনেক গণতান্ত্রিক কর্তব্যও সামনে এসেছে। অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এখন গুণগতভাবে একটা নতুন চরিত্র অর্জন করেছে এবং জীব-পরিবেশ বজায় রাখার সংগ্রামের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।

এইভাবেই শ্রেণী-সংগ্রামের গণতান্ত্রিক ও একচেটিয়াবিরোধী পর্যায় সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে এখন এমন সব নতুন দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে যার সমাধানের রাস্তা বেরিয়ে আসছে মেহনতি জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। এই সংগ্রামের মধ্যে রয়েছে সমাজতন্ত্রের উপাদান, বিকাশের ডায়ালেকটিকস এই জায়গাতেই। এরপর সোবোলেভ সিদ্ধান্ত টানেন, এটাই সাধারণ চিত্র কিন্তু এর সবটাই হয়তো নতুন নয়। গণতন্ত্রের সংগ্রাম এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সংগ্রামের মধ্যেকার পারস্পরিক জটিল ক্রিয়াশীলতার ভেতরে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয় সেগুলো সমাধানের একমাত্র বাস্তব উপায় হলো গণতান্ত্রিক রূপান্তরের কাঠামোর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক উপাদান বৃদ্ধি করা।

ক্লদ মাজাউরিক বলেন, আমাদের বিপ্লবী দায়িত্ব হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন এখন অবশ্য-কর্তব্য, সম্ভব এবং ঐতিহাসিকভাবে ঘনিষ্ঠ প্রয়াস—এ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীরা প্রতিক্রিয়াশীল ও সংস্কারবাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে নীতিনিষ্ঠ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার

অপরিহার্যতাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। কারণ এইসব ভাবধারার উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্রকে ধোঁয়াটে করে রাখা। সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধ সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অস্তিত্ব এই ভাবধারার সংগ্রামের মধ্যে এমন উপাদান সঞ্চার করেছে যার ফলে এটা পরিণত হয়েছে—একদিকে বিপ্লবী শক্তিগুলো ও অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রবণতার মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। মানুষের সামাজিক মুক্তির ইতিহাসে বর্তমান সমাজতন্ত্র যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে তার সঠিক মূল্যায়নের সাহায্যে এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে।

বক্তা আরও বলেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্ন অথবা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে প্রভাবিত করার নির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলির সমস্যাটি বা এর সম্ভাব্য রূপান্তরের প্রশ্ন বা যে নীতিগুলো সমাজতান্ত্রিক সমাজের কলাকৌশল এবং নতুন দ্বন্দ্বগুলোর তাৎপর্য বিচার-বিশ্লেষণের দৃষ্টি-ভঙ্গিকে উপলব্ধি করার পক্ষে সহায়ক হয়, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যেকার বিরোধ সংক্রান্ত বক্তব্যে উপরোক্ত সমস্যাগুলির এখনও উত্তর পাওয়া যায় না। তাছাড়া, এই বক্তব্যের বাইরে যেতে না পারলে নেতি-বাচক ফলাফলও দেখা দিতে পারে: যেমন দেখা দিতে পারে নানা পথে সমাজতন্ত্রে যাওয়ার তত্ত্ব নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করতে গিয়ে অদূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি।

বক্তা এটা জোরের সঙ্গে বলেন যে, এই কারণে, ভাবাদর্শগত সংগ্রামে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলির পক্ষে দাঁড়ানো ছাড়াও আমরা যাতে বিপ্লবী-শক্তি হিসেবে এবং বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের চাহিদার আলোকে কাজ করতে পারি সেজন্যে তত্ত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেও আমাদের সক্রিয়তা প্রয়োজন।

মাজাউরিক বলেন, আমাদের বিপ্লবী রণনীতিকে এই সূত্রটির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। গণতান্ত্রিক পন্থায় ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রের রূপায়ন। এর বিশদ প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করে বক্তা এর দুটি স্তর উল্লেখ করেন: প্রথমত, রূপান্তর-কালীন বিপ্লবী স্তরে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার পর্যায়ে—উভয় ক্ষেত্রেই একচেটিয়াবিরোধী সামাজিক শক্তিসমূহ ও রাজনৈতিক শক্তি-গুলোর বহুমুখী মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার; তারপর ১৯৭৬-এ, প্রলে-তারিয় একনায়কত্বের ধারণা ও এর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বর্জন। এই পরি-বর্তনের কারণ হলো প্রথমত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার শক্তিগুলোর

ভারসাম্যে পরিবর্তন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অস্তিত্ব। বক্তা আরও বলেন, এদের সাফল্য সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনাকে বাস্তব সম্ভাবনায় পরিণত করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের চেতনায় রূপান্তর এনেছে, এমনকি যারা বারবার না ভেবেচিন্তে বস্তাপচা সোভিয়েত-বিরোধিতার শিকার হতো তাদের উপরও প্রভাব ফেলছে। দ্বিতীয়ত, একচেটিয়ার নিপীড়ন ও ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দ্বন্দ্ব থেকে গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্মতা নিশ্চিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের গণ-তান্ত্রিক অধিকারও বেশ খানিকটা প্রসারলাভ করছে। তৃতীয়ত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লব উৎপাদনী শক্তিগুলোর যে বিকাশ ঘটিয়েছে—যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার রূপায়নের জন্যে উৎপাদকদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এমন একটা পরিস্থিতিতে উৎপাদনীশক্তিগুলোর অগ্রগতি ঘটেছে যেখানে জাতীয় ভিত্তিতে বিকাশলাভ করে নতুন বহুজাতিক মূলধন মুনাফার তাড়নায় মেহনতি জনগণের দক্ষতার মান নামিয়ে দিচ্ছে, তাদের দেশান্তরী হতে বাধ্য করছে এবং বেকারী বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বক্তা আরও বলেন, আমাদের সময়ে এ সমস্তই পরিণতি লাভ করছে নতুন নতুন গণতান্ত্রিক অধিকারের শক্তিশালী সংগ্রামে। এইসব গণতান্ত্রিক অধিকার, শাসকশ্রেণী যা দিতে পারে, সেইসব খুচরো সুযোগ-সুবিধার সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। শ্রেণীগত নিপীড়নকে শেষ পর্যন্ত সহনশীল করে তোলার উপযোগী পার্লামেন্ট ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনে প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার যে-পুরনো দাবি এতদিন ছিল, গণতন্ত্র প্রসারের সংগ্রাম সেই সীমা অতিক্রম করছে।

মাজাউরিক বলেন, আমাদের গণতন্ত্রের কর্মসূচীতে সমস্ত ক্ষেত্রের জন্যে সংগ্রামের বিষয়বস্তু রয়েছে, এতে নতুন কর্তব্য হাজির করা হয়েছে। বিশেষ করে সংকটের পরিস্থিতিতে দৈনন্দিন কর্তব্য কী হবে তাও নির্ধারিত হয়েছে। এর অর্থহলো প্রকৃত অধিকার ও স্বাধীনতা; এর অর্থ হলো "গৃহ যুদ্ধ" ব্যতি-রেকে, সমস্ত সম্ভাব্য উপায়কে ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক ভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে ব্যাপকতম সংগ্রাম পরিচালনা করা; এর অর্থ হলো উত্তরণ পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর আগেকার অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো রক্ষা করা।

মাজাউরিক বলেন, এটাই আমাদের রণনীতি। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি এটাকে কোনো "মডেল" হিসেবে দাঁড় করায় নি কারণ পার্টি অন্যান্য

পার্টির অভিজ্ঞতাকে মর্যাদা দেয় অথবা এটাকে কোনো "মডেল বিরোধী", বিশেষ করে, বর্তমান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর বিরোধী হিসেবে দাঁড় করায় নি। পার্টি ফ্রান্সের জন্যে তার নিজস্ব পথ, তার স্বকীয়, মৌলিক পরিকল্পনা হাজির করেছে।

বক্তা আরও বলেন আমরা একটা ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছি। এটা কঠিন পথ। গণতন্ত্রের সংগ্রামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরে আনার কাজে ব্যবহার করতে হবে, মৈত্রীর ব্যাপক নীতি কার্যকর করার মধ্যে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য অংশের রাজনৈতিক চেতনা উন্নত করে তুলতে হবে। কিন্তু এখানে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকাকে ধোঁয়াটে করে রাখলে চলবে না। কমিউনিস্ট পার্টির কাছে প্রধান বিষয় হলো মেহনতি জনগণের অগ্রাধিকার সম্পন্ন দাবিগুলো পূরণ করার এবং নতুন সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রামে নির্ধারক প্রভাব বিস্তার করা। যে-কোনো আমলাতান্ত্রিক বা গোষ্ঠীতান্ত্রিক "ঐক্যের" আমরা বিরোধী, সোস্যাল ডেমোক্রাসিকে পুনর্বাসন দিতে আমরা চাই না। এটা এখন ফ্রান্সে সমস্ত রকম সংস্কারবাদী ধারার ঐক্য-বিধায়ক শক্তি; সম্ভাব্য সর্বপ্রকার উপায়ে সংকট-জর্জরিত ধনতন্ত্রকে খাড়া রাখার জন্যে এর প্রয়াস চালাচ্ছে। এটা কঠিন পথ, কারণ লেনিন যেমনটি বলেছিলেন, আমাদের কাজ করতে হবে জনগণকে এটা বোঝাবার জন্যে যে গণতন্ত্র যতই ব্যাপক হোক না কেন, এটা সামাজিক শক্তি প্রয়োগের একটা হাতিয়ার হয়েই থাকবে, আর এই শক্তির প্রকৃত ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ধারিত হয় তার শ্রেণীগত মর্মবস্তুর দ্বারা।

মাজাউরিক বলেন, পরিশেষে আমাদের রণনীতি ব্যাপকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশের অনেকগুলো কমিউনিস্ট পার্টির কিছু রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং বাস্তব কাজকর্মের সঙ্গে। কিছু বিশ্লেষক এই বিজড়িত অভিন্নতাকে নিজেরা নামকরণ করেছেন "ইউরো-কমিউনিজম" বলে। এই নামটি নিয়ে আমরা কোনো প্রশ্ন তুলছি না, এটা সুবিধাজনক এবং সংজ্ঞা হিসেবে সঠিক কিন্তু আমাদের একটা অনুরোধ হলো এটাকে "মডেল" কিংবা এখনও বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের মৌল প্রত্যয় (ক্যাটিগরি) হিসেবে দাঁড় করানো উচিত নয়। "ইউরো-কমিউনিজম" সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের অথচ কাছাকাছি চিন্তাধারাকে গ্রথিত করে গণতন্ত্র ও সংগ্রামের সমস্ত

সম্ভাবনাকে জনগণের দ্বারা ব্যবহার করতে চায়। অংশত, এর মমবস্তুকে আমরা অন্যান্য ইউরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টির বহু সমস্যা সম্পর্কে অভিন্ন মতামত হিসেবে দেখি।

এমিলি হাবিবি বলেন, কোনো না কোনো নির্দিষ্ট দেশে, এমনকি কোনো অঞ্চলে শ্রেণী সংগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্দিষ্ট শব্দে প্রকাশ করার ইচ্ছা উপলব্ধি করা যায়। এর মধ্যে কয়েকটি তো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, যেমন "ব্রিটিশ পথ" ইত্যাদি। অবশ্য আমি মনে করি "ইউরো-কমিউনিজম",-এর মতো আঞ্চলিক ধারণা অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য মূল্যায়নের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। আমার মনে হয়, এটা অন্যান্য দেশের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের আরও কতকগুলো নির্দিষ্ট নাম বাতিল করে না।

সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নতুন ও মৌলিক রূপের জন্যে নীতিনিষ্ঠ ভিত্তিতে সৃষ্টিশীল অনুসন্ধানের গুরুত্ব সমর্থন করেও কয়েকজন আলোচক এই তথ্যটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে "সমাজতন্ত্রের গণতান্ত্রিক পথ" কথাটি বিপ্লবী অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খায় না। গিগ্লিন গিগ্লিনস্ক ও য়ুরি ক্রাসিন বলেন প্রত্যক্ষ না হলেও এ কথাটির মধ্যে এমন একটা ইঙ্গিত রয়েছে যে সমাজতন্ত্রের অন্যান্য পথ অগণতান্ত্রিক। প্রতিটি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের অবস্থা খেয়াল রেখে প্রতিটি দেশের বিশেষ পথের কথা বলা আরও সঠিক হবে।

নতুন পরিস্থিতির আলোকে রণনৈতিক লাইন নির্ধারণ করার জটিল প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেন ব্রুনো ফার্চ। তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অষ্ট্রীয় ধাঁচের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র গড়ে উঠেছে সোস্যাল ডেমোক্রাসি ও তার বুর্জোয়া শরিকদের মাধ্যমে "সামাজিক অংশীদারত্ব ও শ্রেণী-সহযোগিতার" ব্যবস্থার দ্বারা। অনুকূল আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই ব্যবস্থাটি চলছে। এর ফলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে আমাদের পার্টি ভাবাদর্শ ও তত্ত্বগত দিক থেকে উপযুক্তভাবে তৈরি নয় বলে প্রতিভাত হয়েছে। এটা অবশ্য প্রথমেই বোঝা যায় নি, ধীরে ধীরে বুঝতে পারা গিয়েছে। বহু কমিউনিস্ট এমন সব মৌল প্রত্যয় (ক্যাটিগরি) নিয়ে চিন্তাভাবনা করে যাচ্ছিলেন যেগুলো আর নতুন প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য করছিল না, ভ্রান্ত সমাধান দিচ্ছিল। কেউ কেউ সমাজের নেতৃস্থানীয় শক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর উপর আস্থা হারিয়ে

ফেলে নানারকম খামখেয়ালী বুর্জোয়া উদার নীতিবাদের দ্বারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে "সমৃদ্ধ" করে তুলছিলেন, এমন কি বিপ্লবী তত্ত্বের যাথার্থ্য নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করছিলেন। আবার বিপরীত দিক থেকে অন্যেরা মতান্ধতা ও সংকীর্ণতাবাদের অবস্থানে নিজেদের আটকে ফেলছিলেন।

ফার্চ আরও বলেন এইসব ধ্যানধারণা কাটিয়ে তোলার জন্যে দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রাম চালাতে হয়। এর ফলে পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে ক্ষতি হয় তার সামাজিক প্রভাবের এবং শ্রমিকশ্রেণীর আস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সংগ্রাম শুরু করতে হয়েছিল সামাজিক-আর্থনীতিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে এবং অস্ট্রিয়া যে-পথে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে এগিয়ে যেতে পারে সেই পথ-সংক্রান্ত সাধারণ ধারণাগুলিকে ঐ অবস্থা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিশদ করে। এই পথ হলো গৃহযুদ্ধ ব্যতিরেকে একচেটিয়াবিরোধী গণতন্ত্রের জন্যে এবং দেশী-বিদেশী একচেটিয়াপতিদের ক্ষমতা সংকুচিত ও তারপর তাকে নির্মূল করার জন্যে সংগ্রাম। একচেটিয়াপতিদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গভীরভাবে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো রক্ষা ও জনগণের অধিকার সম্প্রসারিত করার জন্যে। শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে সঞ্জীবিত করা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নত করে তোলার জন্যে এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়।

ফার্চ বলেন, ১৯৭৮-এ অস্ট্রিয়ার সোস্যালিস্ট পার্টির গৃহীত কর্মসূচীর সঙ্গে পার্টির ঐ ধারণার পার্থক্য সুস্পষ্ট। এই কর্মসূচীতে বলা হয় "নতুন ক্ষেত্রকে অনবরত গণতন্ত্রের ধ্যানধারণা দিয়ে ভরাট করতে হবে" এবং "সোশ্যাল ডেমোক্রাসিকে কার্যকর করতে হবে।" এটাই হলো অস্ট্রিয়ার সোশ্যালিস্ট পার্টির "সমাজতন্ত্রের" বিকল্প। এদের প্রথম যুদ্ধোত্তর কর্মসূচীতে এই কথাটি এখনও দেখতে পাওয়া যাবে। তাতে এরা বলেছিল যে তারা একটা "তৃতীয় পথ" নিতে চায়, এ সম্পর্কে তারা আর এখন কিছুই বলছে না।

বিপ্লবী প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত সমস্যাবলী সংক্রান্ত বিষয় প্রসঙ্গে ফার্চ অস্ট্রিয়ান "মডেল" সমেত যে কোনো "সমাজতন্ত্রের মডেল" খাড়া করার অকার্যকারিতার উপর জোর দেন। অস্ট্রিয়ার পক্ষে উপযোগী গুণগতভাবে বিশিষ্ট "সমাজতন্ত্রের মডেল" বিশ্লেষণ করার সৌখিনতা আমরা বর্জন করেছি। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ সমধর্মিতা অনুযায়ী; একে দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং একমাত্র জাতীয় রূপের আধারেই একে কার্যকর করা

সম্ভব। এই সব সমধর্মিতার মধ্যে বিশেষ করে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র-ক্ষমতা কায়েম করা। শ্রমিকশ্রেণীর এই ভূমিকা প্রয়োগ করাকেই মার্কসীয় রাষ্ট্র-তত্ত্বে প্রলেতারিয় একনায়কত্ব বলা হয়; এর অর্থ হলো সমস্ত মেহনতি মানুষ ও প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে ব্যাপকতম গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা বাস্তবায়িত করা।

কনস্টান্টিন জারদভ বলেন, গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে কমিউনিস্টদের বিপ্লবী রণনীতির দুটি মুখ্য লাইনের ডায়ালেকটিক ঐক্য প্রকাশ পায়। বারংবার গণতন্ত্রকে এই ঐক্যের প্রধান দিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। গণতন্ত্র ও এর সুসঙ্গত বিকাশকে সমাজতন্ত্র অর্জনের অপরিহার্য ও যথেষ্ট অনুকূল অবস্থা বলে তুলে ধরা হয়েছে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কি সঠিক? মার্কসীয় তত্ত্ব গণতন্ত্রকে শ্রেণী সংগ্রামের একটা গুরুত্বপূর্ণ রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়। এটা শ্রমিকশ্রেণীকে বেশ খানিকটা সুযোগ দেয়, শক্তি যোগায় এবং এটা সব সময়েই কাম্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ একটা রূপ। যেকোনো ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী শ্রেণী-স্বার্থ, তাদের সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এর মর্মবস্তু হিসেবেই থাকে। জারদভ এটা জোর দিয়ে বলেন, সেই জন্যে আমরা মনে করি যে বিপ্লবে গণতন্ত্রের ভূমিকা বিচার করতে গিয়ে রূপের সীমাটিকে একটা চূড়ান্ত কিছু মনে করে এই সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়, আর এই অর্থে মর্মবস্তু হয়ে পড়ে রূপের অধীন।

আর একটি প্রশ্নের সঙ্গেও এটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমাদের সময়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতিকে ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের আরও অনুকূল পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে। এই পথটিকে প্রায়শই শান্তিপূর্ণ, সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক পথ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। অবশ্য পরিভাষা কোনো সমস্যা নয়, যদিও এটা আলোচনার একটা বিষয় হতে পারে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্যে যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে, শুধু তার একটা সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়াই নয়, যে সীমার মধ্যে ঐ সম্ভাবনাগুলোকে বিপ্লবী শক্তি কাজে লাগাবার সুযোগ পায় তার চিত্র পাওয়াটাও এখানে সমস্যাটির মর্মকথা। এমন কি মূলধন-শাসিত সবচেয়ে উন্নত বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও অত্যন্ত গণতান্ত্রিক সংবিধানও শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়াশ্রেণীর মৌল স্বার্থ রক্ষা করে

এবং তার সেবা করে। প্রায় দেড়শো বছর আগে মার্কসবাদ এই ইউটোপীয় মোহ ভেঙে দিয়েছিল যে, শ্রেণী-বহির্ভূত বা শ্রেণীর ঊর্ধ্বে কোনো রকম গণতন্ত্র হতে পারে। তাছাড়া মার্কস ও এঙ্গেলস "বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের" প্রবক্তাদের প্রতিক্রিয়ার সম্ভাব্য সমর্থক বলে মনে করতেন। কেন? কারণ গণতন্ত্রের রাজনৈতিক সংস্থা ও রীতিনীতির প্রকৃত সামাজিক ভূমিকা বিচার না করে সেগুলিকে শ্রেণীগত মর্মবস্তু বর্জিত কোনো কিছু বলে ভাবা, স্বাধীন মূল্য-সম্পন্ন বলে তাদের সমর্থন করা, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই শ্রেণীকে নির্দোষ বলে অব্যাহতি দেওয়ার সামিল। অথচ বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করাই ঐ সংস্থাগুলির প্রধান কাজ।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন; কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির মুখ্য হাতিয়ারগুলি যদি বিপ্লবী শক্তির হাতে আসে, যদি বুর্জোয়া শ্রেণীর বদলে ঐ শক্তিগুলো নিজেদের স্বার্থে প্রচলিত গণতান্ত্রিক বৈধতা, সাংবিধানিক রীতিনীতি ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলিকে কাজে লাগায় তাহলে? সেটা খুবই সম্ভব। কিন্তু সেটা গণতন্ত্রের শ্রেণীগত মর্মবস্তুর পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ কাঠামোর মধ্যে এবং গণতান্ত্রিক বৈধতার ভিত্তিতে মেহনতি জনগণের হাতে ক্ষমতা এলে তাদের অনিবার্যভাবেই এই উভয় সংকটের সম্মুখীন হতে হবে: হয় বৈধতা মেনে চলার তাগিদে শোষকদের মৌল শ্রেণীস্বার্থ সংকুচিত করার কাজ পরিত্যাগ করতে হবে অথবা এর যেসব রীতিনীতি মূলধনের বিরুদ্ধে ও শ্রমের স্বার্থে সমাজের সামাজিক আর্থনীতিক ভিত্তির সুসঙ্গত রূপান্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাকে উপেক্ষা করতে হবে। সংখ্যালঘু শোষকরাও অনুরূপ উভয় সংকটের মুখে পড়বে; হয় বৈধতা ও এই বৈধতার উপর নির্ভরশীল বিপ্লবী ক্ষমতার কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে হবে, যার অর্থ হলো তাদের সম্পদ, মুনাফা ও সুযোগ-সুবিধা হারানো, নতুবা তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার্থে গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধকারী সমস্ত রীতিনীতিকে পদদলিত করতে হবে। এই অবস্থাটি অনিবার্যভাবেই দেখা দেবে। এটা মোটেই নিছক অনুমান নয়। এই চিত্রটি বাস্তবে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে।

আরদন্ত বলেন বিশ্ব-বিপ্লবের সমস্ত অভিজ্ঞতায় এটা বেশ ভালভাবেই দেখা যায় যে, প্রতিটি গণতন্ত্র ও বৈধতার শ্রেণীগত মর্মবস্তু বিস্মৃত হওয়াটা গুরুতর বিভ্রান্তির দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

তিনি এরপর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কতকগুলি মূল্যবান উপাদানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন: গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য স্বাভাবিকভাবেই

প্রতিটি দেশের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা এবং শ্রেণী-সংগ্রামের বাস্তব ধারার মধ্যে দিয়ে নির্ধারিত হয়। এই রকম একটা ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এই দিক থেকে দু' ধরনের: গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যজাত বিপ্লব এবং এমন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত বিপ্লব যেখানে এই রকম ঐতিহ্য অনুপস্থিত বা প্রায় নেই বললেই হয়। আমাদের ভাবাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রায়শই অক্টোবর বিপ্লবকে দ্বিতীয় ছকে ফেলেন। কিন্তু এই ধরনের মূল্যায়ন বা ঐ রকম ছক কতটা সঠিক?

জারদভ জোরের সঙ্গে বলেন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে কোনো দেশের পার্লামেন্টারি সরকার ও রাজনৈতিক পার্টিগুলোর বৈধ অস্তিত্ব বা এই ধরনের ব্যাপারে পর্যবসিত করা ভুল হবে। বুর্জোয়া সমাজে এই ধরনের সংস্থার দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্ব এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এগুলির জন্যে সংগ্রাম নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান ঐতিহ্য। রুশ দেশে এই ধরনের ঐতিহ্য সত্যিই দুর্বল ছিল।

কিন্তু আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের শক্তি, গভীরতা ও গতিশীলতা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তাদের ভূমিকা নির্ধারিত হয়েছিল ১৮২৫ সালে ডিসেম্ব্রিস্টদের অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে প্রায় পরবর্তী শতাব্দীকাল ব্যেপে। বিপ্লবী ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাতে ঐগুলি গড়ে উঠেছিল। এরপর ঐ ঐতিহ্য ঘোষিত হয়েছিল আলেকজাণ্ডার হার্জেনের কলোকল (ঘণ্টা) গ্রন্থে। এই ধারার উত্তরসূরী ছিলেন অনভিজাতশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা ও নিকোলাই চের্ণিয়ভস্কি। এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য জনগণের ব্যাপক অংশ, কৃষকদের চেতনা ও জীবনযাত্রার মধ্যে গভীরভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল। এইসব ঐতিহ্য, বিশেষ করে কৃষকদের গ্রাম-সমবায়ের ঐতিহ্য, বলশেভিকদের বিচার-বিবেচনায় রুশদেশে কৃষি সমস্যার গণতান্ত্রিক সমাধানের অন্যতম ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯১৭ সালে জমি সংক্রান্ত ডিক্রি এবং সোভিয়েত শক্তির পরবর্তী আইনগুলোর মধ্যে এটা ঘোষিত হয়।

লেনিনের মতে রুশ দেশের প্রলেতারিয় আন্দোলন দেশের মহত্তম ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেছিল। তিনি বলেছিলেন এইসব ঐতিহ্য জাতির গৌরবময় সম্পদ। ১৯০৫-১৯০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লব এবং ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে এগুলি আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই ধারার মধ্যে দিয়ে জনগণের সৃষ্টিশীল কার্যকলাপ সোভিয়েতের আকারে এক ধরনের গণতন্ত্র সৃষ্টি করে। রুশ দেশের বিপ্লবে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি বুর্জোয়াশ্রেণীর কর্তৃত্বে না হয়ে হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে। পৃথিবীর প্রথম বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লবের সঙ্গে এই ঐতিহ্যের আঙ্গিক সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছিল তার সাচ্চা গণতন্ত্রের মধ্যে।

আগুন মিজান বলেন, মার্কসবাদী চিন্তার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব অপরিবর্তনীয় বা অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। এক সময়ে এই ধারণা প্রবল ছিল যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটবে ধনতান্ত্রিক সমাজে কিছু আর্থনীতিক বিপর্যয়ের সময়ে। পরবর্তীকালে লেনিন বিপ্লবের সমস্যাগুলোকে ব্যাপকতর, দুনিয়াজোড়া পটভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষত, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলশ্রুতি-স্বরূপ সামাজিক-রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত করে বিচার করেন। এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে, তাঁর ধারণা বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই বিপ্লবী প্রক্রিয়াই বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন সম্ভব করেছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রুমানিয়া-সমেত পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলোতে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত করেছে।

তিনি আরও বলেন, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বর্তমান অবস্থার পটভূমিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের ক্ষেত্রে কেউ নতুন নতুন উপাদানের কথা তুলতে পারেন। আমাদের কালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্য বদলে যাওয়ায়, বর্তমান সমাজতন্ত্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং সামরিক ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবের ফলেও আগ্রাসী বুর্জোয়া মহলগুলি সভ্যতাকে সত্যিকারের বিপদের সম্মুখীন না করে বিশ্বযুদ্ধকে নীতিগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না। আবার এই সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লব এবং উৎপাদনের পরিমাণ ও শ্রমোৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। যদিও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির দ্বন্দ্ব ও কাঠামোগত দোষ-ত্রুটি অব্যাহত রয়েছে এবং সেগুলো আরও প্রকট হয়ে উঠছে, কিন্তু সেগুলো অনিবার্যভাবেই উৎপাদনে নিশ্চলতা নিয়ে আসবে না। যে পরিস্থিতি ধনতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক তাকে এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল ধনতন্ত্র আয়ত্ত করেছে। কিন্তু তার আর্থনীতিক কার্যকলাপের মীমাংসাতীত দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তি অর্জনে সে অক্ষম। আর এই দ্বন্দ্বই তার অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। অনেকগুলো ধনতান্ত্রিক দেশে অসংখ্য দ্বন্দ্ব ও সামাজিক সংঘাত অতি মাত্রায় কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বে একটা সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আজকের দিনে বিপ্লবী বিকল্পের জন্যে সংগ্রাম আর্থনীতিক বা

সামরিক রাজনৈতিক বিপর্যয়ের বিপদকে প্র ভরো
ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লবী প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত
কাঠামোগত রূপান্তরের ক্রমিক প্রক্রিয়ার মধ্যে
পরিবর্তিত হতে পারে।

বক্তা আরও বলেন বিপ্লবের তত্ত্বকে আরও
প্রায় ক্ষেত্রেই সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের
দেশের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্কের প্র
তান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য-সমষ্টি অনবরত প্রকৃত বাস্ত
যায়, এর একই রকম বাস্তবায়নের তাৎপর্য ছাড়া
রূপান্তরগুলোর বৈচিত্র্যের অর্থ হলো সাধারণ
কাঠামোর মধ্যে বৈশিষ্টগুলোকে অনবরত সুচি
প্রতিটি সমাজের মধ্যে যেসব সম্ভাবনা রয়েছে বি
বাছাই করা।

মিত্রান মনে করেন বিপ্লব ও গণতন্ত্রের মধ্যে
রয়েছে। তাই শুধু বিপ্লবের তত্ত্বকেই সমৃদ্ধ করলে
গণতন্ত্র সমেত গণতন্ত্রকে গভীরতর করে তোলার ঐ
মেটাতে হবে।

গণতন্ত্র এমন একটা মৌলিক রাজনৈতিক পা
ভাবাদর্শগত বিতর্ক চলছে। এই বিতর্ক থেকে
পরিভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বাস্তবতাকে চিহ্নি
হয়। কেউ কেউ এই নৈরাশ্যবাদী সিদ্ধান্তে পৌ
গণতন্ত্র "সমুদ্রতীরে নির্মিত একটি বালি-মূর্তি।"*
কোন ধরনের, কোন সামাজিক শ্রেণীর গণতন্ত্রের
উপর। বিপ্লবই এক চমৎকার যৌথ ভাস্কর যে গণত

২ ক্ষমতার কাঠামোতে রূপান্তরে

আলোচনার অন্যতম মুখ্য ধারা
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ক্ষমতা-কাঠা
কৌশলকে পর্যালোচনা করা। এই

* ল' ভেনির দ্য লা ডেমোক্রাট, বিতর্ক, পারী, ১৯

মেহনতি জনগণের কল্যাণে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংস্থানগুলোকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা, শ্রেণী সংগ্রামে ধনতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর গণতন্ত্রীকরণের ভূমিকা ও স্থান এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কাজে সমগ্র ক্ষমতা-কাঠামোর মধ্যে গুণগত পরিবর্তনের সমস্যা।

জোস লুই মালো ডি মলিনা বলেন সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির জন্যে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সংস্থাগুলোর উচ্ছেদসাধন কোনো অপরিহার্য ব্যাপার নয় বরংচ সেগুলিকে রক্ষা করাই প্রয়োজন। সেগুলিকে নবরূপ দেওয়া ও তার বিকাশ ঘটানো স্পেনের শ্রেণীসংগ্রামের রণনীতির একটা মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে চিন্তাটি হলো পার্লামেন্ট ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থাগুলিকে একচেটিয়া কেন্দ্র (এরা আর্থনীতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে) গুলির কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার বিরুদ্ধে শুধু কার্যকর করে তোলাই নয়—রাষ্ট্রের যেসব আমলাতান্ত্রিক সংস্থা তাদের কার্যকলাপ ও যোগ্যতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি ও বহুমুখী করতে চায়, তাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিরুদ্ধেও পার্লামেন্ট ও নির্বাচিত সংস্থাগুলিকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। যারা একচেটিয়ার স্বার্থ বোঝে এই রকম কিছু লোককে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচিত করার মধ্যেই যেখানে জনগণের অধিকার সীমাবদ্ধ, সেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের কলা-কৌশল শুধু যাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যেই নিঃশেষ না হয়ে যায় তা প্রতিরোধ করা প্রয়োজন।

মেলো ডি মলিনা বলেন, আমরা এমন একটা রাজনৈতিক গণতন্ত্র কায়েম করতে চাই যা শুধু আর্থনীতিক জীবনে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠাতেই সক্ষম হবে না, উৎপাদন সম্পর্ককে বিকশিত করে তুলতে পারবে এবং শাসক-শ্রেণীগুলিরও পরিবর্তন ঘটাবে। তাঁর মতে এর অর্থ হলো এমন এক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যা নিপীড়নের বদলে সমমত ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে সমাজ-তান্ত্রিক রূপান্তরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে সাহায্য করবে। এই গণতন্ত্র পরিকল্পিত অর্থনীতির বিকাশ, সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের পুনর্গঠন এবং এক-চেটিয়া ধনতন্ত্রের স্বৈরতান্ত্রিক ও গণতন্ত্রবিরোধী প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।

গণতন্ত্রের উন্নত ব্যবস্থা পরিচালিত হবে এমন একটা পার্লামেন্টের দ্বারা যার মধ্যে সমগ্র জনগণের আকাঙ্খার প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এই সঙ্গে এই

ব্যবস্থার ভিত্তি হবে জনগণের মধ্যে গভীরভাবে সন্নিবিষ্ট সংস্থাগুলির এক বহুমুখী কাঠামো। এই রকম কাঠামো রাজনৈতিক দল, নির্বাচন ও পার্লামেন্টর ভূমিকাকে কোনো ভাবেই দুর্বল না করে পার্লামেন্টের শক্তি বৃদ্ধি করবে। স্বায়ত্তশাসনের প্রতিটি রূপকে এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ভূমিকাকে উন্নত করে তুলবে।

তিনি আরও বলেন গণতন্ত্রকে গভীরতর করার প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে রচিত এই ধরনের একটি বিকল্পই স্পেনকে স্বাধীনতার পরিবেশে ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যেতে পারে। রাজনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে শ্রম ও সংস্কৃতির শক্তিগুলি দিনে দিনে রাজনৈতিক ক্ষমতায় শক্তিশালী অবস্থান অর্জন করবে এবং নেতা হতে সক্ষম হবে। বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের আরও সমবণ্টনের লক্ষ্য-সমন্বিত উৎপাদনী শক্তি ও বিজ্ঞানের বিকাশ-ভিত্তিক ঐ প্রক্রিয়াটি নতুন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটাবে এবং আরও কার্যকর গণতন্ত্রের রূপ লাভ করবে।

ই, ভিয়েরা বলেন, আমি এটা যোগ করতে চাই যে স্বাধীনতার পরিবেশে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার ধারণা স্ববিরোধী। এই বক্তব্যের তাৎপর্য হলো সমাজতন্ত্র ছাড়াও স্বাধীনতা হতে পারে। কিন্তু বিষয়টি হলো ব্যাপকতম মেহনতি জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতার ভিত্তিমূলক সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও সামাজিক আর্থনীতিক রূপান্তর সাধন ব্যতীত সমাজতন্ত্রে কোনো রকম উত্তরণের কথা ভাবাই যায় না।

এল, এ্যানটোনেট্টি বলেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী, কমিউনিস্ট ও মিত্র শক্তিগুলোর বিজয় এবং ইটালীতে গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ এই ধারণাটিকেই প্রতিপন্ন করে যে "গণতন্ত্র বুর্জোয়া শ্রেণীকে খতম করে।" নতুন সংবিধানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঘোষিত হয়: শ্রম-ভিত্তিক ইটালীয় প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্রের নতুন পররাষ্ট্রনীতি, প্রথমেই ভূস্বামীতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে কৃষি-সংস্কার; এই সংবিধান মালিকদের অধিকার সংকুচিত করে ও মেহনতি জনগণের অধিকার প্রসারিত করে এবং রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক করে তোলার উপযোগী সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করে। অবশ্য ঘোষণা ও তার রূপায়ণ এক জিনিস নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হয় আমাদের সংবিধানটিকে বুর্জোয়া সংবিধান বলা যায় না। বর্তমানে রাষ্ট্রের অনেকগুলো মুখ্য অধিকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে, রাষ্ট্র-

প্রশাসনের সংস্কার সাধিত হয়েছে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটছে, এটা জনগণের বিভিন্ন অংশ ও যারা নতুন ক্ষমতা ভোগ করছে তাদের নিকটতর হচ্ছে। আমাদের গণতন্ত্রকে আরও প্রগতিশীল মর্মবস্তুতে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্যে সংগ্রাম চলছে।

ইটালীতে এমন সব শক্তি রয়েছে যারা সাবেকী ধনতান্ত্রিক ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে। এই ক্ষেত্র পার্লামেন্টের কার্যকলাপকে হ্রাস করতে চায় এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে কারিগরিবিদ্যার দিক থেকে সামাজিক অর্থনীতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আরও হস্তক্ষেপ পছন্দ করে। বক্তা আরও বলেন পার্লামেন্টের জন্যে সংগ্রাম, এর ক্ষমতা উন্নত করা এবং এর কাজকর্মকে আরও প্রসারিত করা সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির জন্যে আমাদের রণনীতির অন্যতম প্রধান উপাদান।

বক্তারা পার্লামেন্টের ভূমিকা এবং বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার সম্পর্কে নানারকম মূল্যায়ন করেন। মন্টি জনস্টোন বলেন আমরা পার্লামেন্টকে বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ক্ষমতার এমন অঙ্গ বলে মনে করি না যাকে উড়িয়ে দিতে হবে। এটাকে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সার্বভৌম হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা যায়। এমিল হাবিবি এতে আপত্তি করে বলেন কিন্তু পার্লামেন্ট কি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের একটা অঙ্গ নয়? গণতন্ত্রের জন্যে ঐতিহাসিক সংগ্রামের পরিণতি স্বরূপ পার্লামেন্ট গড়ে উঠেছে একথা স্বীকার করেও প্রশ্নটি থেকে যায়ঃ কার কাছ থেকে এটা স্বাধীন? মন্টি জনস্টোন এর উত্তরে বলেন পার্লামেন্টকে ধনতান্ত্রিক ক্ষমতার একটা অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু আমরা একে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে এক করে দেখি না, কারণ জনকল্যাণের কাজে একে ব্যবহারের সংগ্রাম এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

বরিস স্পাসভ বলেন বুর্জোয়া সমাজের অনেকগুলো গণতান্ত্রিক সংস্থাকে বুলগেরিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়ে কাজে লাগানো হয়েছিল। তাই জনগণের ক্ষমতা য়েস্রব বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করে (শিল্প প্রতিষ্ঠান, খনি, বৃহদাকার ভূসম্পত্তির জাতীয়করণ), সেগুলোও বিপ্লব-পূর্ব বুর্জোয়া পার্লামেন্টে গৃহীত আইনের ভিত্তিতেই কার্যকর করা হয়। একমাত্র ফ্যাসিস্ট আইনগুলোকেই (রাষ্ট্র ও পুলিস রক্ষাসংক্রান্ত সংসদীয় আইন) বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করা হয়। ১৯৪৭ সালে সমাজতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত টাইরনোভো বুর্জোয়া সংবিধানের বিধিবিধান অনুযায়ী প্রায় সমস্ত সংসদীয় কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছিল। এই অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করে

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে জনগণের ক্ষমতা দখলের পরেই বুলগেরিয়াতে পুরনো সংস্থাগুলো কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছিল।

রবার্ট ফ্রান্সিস বলেন, এখন জনগণ তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংসদীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে গভীর অবিশ্বাস পোষণ করে। কারণ নির্বাচকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন সব রাজনীতির খেলা চলে যার ফলে নানা ধরনের গোষ্ঠী মূল বিষয়গুলোর সমাধানের ক্ষেত্রে তাদের চাপ ও প্রভাব কাজে লাগায়। কিন্তু সংসদীয় পন্থা একেবারে অগ্রাহ্য করা মারাত্মক ব্যাপার। সমস্ত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলোর জন্যে নতুন নতুন উপায় ও সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্যে এবং তাদের নতুন অবয়ব দেওয়ার জন্যে সংকট-জর্জরিত পার্লামেন্টের মধ্যে কাজ করার প্রয়োজন আছে।

সমকালীন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ছক-বাঁধাভাবে শ্রেণীগত একনায়কত্বের অঙ্গ হিসেবে উপস্থিত করা কঠিন—এই একনায়কত্ব পুরোপুরিভাবে দমন ও পীড়নমূলক। বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতাও অধীনস্থ শ্রেণীগুলির একাংশের সঙ্গে চুক্তির উপর নির্ভরশীল। এই শ্রেণীগুলি কখনও কখনও বেশ বড়ো। "রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শগত সংস্থা"র (স্কুল, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, প্রচার যন্ত্র) মুখ্য প্রভাবশালী ভাবাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে এই চুক্তি অর্জিত হয়েছে। রাষ্ট্রের ভূমিকা আর "দমন ভাবাদর্শ" সূত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সেটা এখন বেশ প্রসারিত হয়েছে, বিশেষ করে সামাজিক ক্ষেত্রে—এখানে জনসাধারণ সম্পর্কে রাষ্ট্রের অনেকগুলো ইতিবাচক করণীয় রয়েছে। শেষ পর্যন্ত অর্থনীতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রের কাঠামো স্বভাবতই বুর্জোয়াশ্রেণীর, বিশেষ করে, একচেটিয়াদের স্বার্থ রক্ষা করে। ফ্রান্সিস রাষ্ট্রকে শ্রেণীগুলোর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসম্পন্ন সংগ্রামের ক্ষেত্র বলে বর্ণনা করেন। রাষ্ট্র শুধু শাসক গোষ্ঠীগুলোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের দ্বারাই প্রভাবিত হয় না, শাসক ও নিপীড়িত শ্রেণীগুলোর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের দ্বারাও প্রভাবিত হয়। রাষ্ট্রযন্ত্রে প্রগতিশীল শক্তিগুলো শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছলে এবং গণসংগ্রামের ফলে সমাজের শক্তিগুলির ভারসাম্য পাল্টে গেলে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রগুলি দক্ষিণপন্থীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার মতো সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং গণতন্ত্রীকরণের পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রমশ রাষ্ট্রের সমগ্র কাঠামো পরিবর্তন করে ফেলা যাবে। যদি "ভিতরের" সংগ্রামকে "বাইরের" গণ-আন্দোলনের কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল

করে তোলা যায়, তাহলে এটা অর্জন করা যেতে পারে। বাইরের এই গণ-আন্দোলন মুখ্য গুরুত্বসম্পন্ন।

বেলজিয়ামে যেসব গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা বজায় রয়েছে, (যে-গুলিকে আরও প্রসারিত করা প্রয়োজন) সেগুলি বুর্জোয়াশ্রেণীর দান নয়, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফল। শ্রমিকশ্রেণীর সাফল্য সেগুলিকে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করে তুলেছে এবং অভিজাতদের মধ্যে সেগুলোকে সীমাবদ্ধ না করে গোটা সমাজ-কাঠামোর মধ্যে প্রসারিত করেছে। ক্রান্সিস বলেন এইভাবে "সকলের জন্যে গণতন্ত্রের" ধারণাটি স্থায়ী ঐতিহাসিক মূল্য-সম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

বক্তা আরও বলেন, বেলজিয়ামে এখন প্রধান আলোচ্য সমস্যা হলো গণ-তান্ত্রিক সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্যে সমাজতন্ত্রের গণতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করা। সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ পথের কর্মসূচী বিশদ করা কোনো অর্থেই সংস্কারবাদী নিয়তিতে বিশ্বাসী ধ্যানধারণা গ্রহণ করা নয়।

স্তানডোর লাকোস বলেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের দিকে আরও নজর দেওয়া প্রয়োজন। পার্লামেন্ট ও নির্বাচনী সংস্থাকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংস্থাগুলিকে আরও গণতান্ত্রিক ও জনস্বার্থের দিক থেকে আরও কার্যকর করে তোলার জন্যে সেগুলির রূপান্তর সাধনেরও প্রয়োজন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংস্থাগুলি প্রধানত বিপ্লবী সংগ্রামের সাফল্য এবং এগুলি বুর্জোয়া শাসনের যন্ত্রে পরিণত হওয়ায় মেহনতি মানুষের সংগ্রামের ক্ষেত্রে এইসব সংস্থার গুরুত্ব খাটো করে দেখা ঠিক হবে না; কারণ এগুলি একটি দেশের শ্রেণীশক্তিগুলির ভারসাম্যের নির্দেশক। আবার এগুলিকে বাড়িয়ে দেখাও ঠিক হবে না। এদের সম্পর্কে কোনো মোহ পোষণ করাও ভুল হবে। শাসকশ্রেণীরা ক্রমশই এই সংস্থাগুলিকে সুকৌশলে ব্যবহার করছে; এগুলি সমগ্র জনগণের স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করে না। যদি কেউ শুধু সংসদীয় নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তাহলে এই ধরনের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি সংসদের বাইরের রাজনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্বকে উপেক্ষা করার দিকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বিষয়টি হলো এই সংগ্রাম একাই খোদ পার্লামেন্টে সুস্পষ্ট ফলাফল অর্জনের পক্ষে সহায়ক হতে পারে।

তিনি এটা জোর দিয়ে বললেন, বুর্জোয়া পার্লামেন্ট ও নির্বাচনী ব্যবস্থা ক্রমশই জনসাধারণকে কৌশলে প্রবঞ্চিত করার মাধ্যম হয়ে উঠছে। পার্লামেন্টকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্র বলে গণ্য করা ঠিক হবে না। উন্নত ধন-

তান্ত্রিক দেশগুলিতে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তাবলী পার্লামেন্টের বাইরেই গৃহীত হয়। ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি—সামরিক ও শিল্পচক্রগুলি, একচেটিয়া-পুঁজিপতিরা, সৈন্যবাহিনীর উচ্চতম সংস্থাগুলি ও পুলিস—জন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কার্যত পার্লামেন্টও তাদের নিয়ন্ত্রণ করে না।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি ও সাফল্যে গণতন্ত্রও একটা বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। তার ফলে গণতন্ত্রের বিকাশ ও উন্নতিসাধনের ক্ষেত্রে সফল বিপ্লব গুণগতভাবে নতুন ও অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। মেহনতি জনগণ তাদের নিজেদের কল্যাণে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ব্যবস্থাগুলিকে সুসঙ্গতভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। কিন্তু শাসকশ্রেণীগুলোও বসে নেই। সুতরাং প্রশ্ন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর ভিতর থেকে সামাজিক রূপান্তর ঘটানোর কাজ কোন্ কোন্ দিক দিয়ে ব্যাহত হতে পারে? লাকোস এ প্রসঙ্গে বললেন, 'এটা পরিষ্কার যে, ক্ষমতার চরিত্রের ক্ষেত্রেই একটা গুণগত পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেবে একসময়ে। এই অবস্থাটা হবে একটা সিদ্ধান্তমূলক মুহূর্ত।'

ইউরি ক্রাসিন বললেন, একচেটিয়া পুঁজির রাজনৈতিক ক্ষমতার একটা অঙ্গ হিসেবে উন্নত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলে এসেছে এর পাশাপাশি। এই কারণে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই সংগ্রাম ও আন্দোলনের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে এবং এদের বেশ কিছু বিষয়বস্তু এই ব্যবস্থার মধ্যে অঙ্গীভূত হয়েছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরে তাই এমন কতকগুলো সেতুমুখ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, যেগুলোকে শ্রমিকশ্রেণী বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে ব্যবহার করতে পারে। এখানে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলোকে কাজে লাগাবার ব্যাপক সুযোগ শ্রমিকশ্রেণীর আওতায় রয়েছে। এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের সাধারণ বিকাশের অব্যাহত ধারার বজায় থাকার দিক। কিন্তু এতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য চাপা পড়ে না। এই বিপ্লব হচ্ছে গণতন্ত্রের শ্রেণী-বস্তুর পরিবর্তন সাধন। এজন্যে দরকার রাষ্ট্র-ক্ষমতার যাবতীয় সংস্থাগত ব্যবস্থার আমূল রূপান্তর সাধন করা।

বর্তমানে যে পর্যায় উপস্থিত হয়েছে তাতে পার্লামেন্ট, স্থানীয় স্বায়ত্তসংস্থা, পৌরসভা এবং এমনকি সরকারের মতো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও যোগ দেবার প্রভূত সুযোগ শ্রমিকশ্রেণী, কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সামনে উন্মুক্ত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ইউরি ক্রাসিন বললেন যে,

সমসাময়িক পুঁজিবাদী সমাজের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রবেশ করে কমিউনিস্টরা এমন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যার সমাধান করতে হবে তত্ত্বে এবং কাজে উভয় দিক দিয়েই। কমিউনিস্টদের একদিকে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের কথা বলতে হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সমগ্র রাজনৈতিক অধিকাঠামোর ব্যাপার-স্যাপারগুলোকেও হিসেবের মধ্যে রাখতে হয়। এই গুলো পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের ধারার বিধিবিধান অনুযায়ী কাজ করে। এই ব্যাপার স্যাপারগুলোর একটা প্রবণতা থাকে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ এবং তার লক্ষ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার। এখানেই উদ্ভব হয় প্রকৃত বিপদের। সেই বিপদটা এই যে, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির ব্যবস্থায় প্রবেশ করায় বিপ্লবী পরিপ্রেক্ষিতই নষ্ট হয়ে বসতে পারে এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে অঙ্গীভূত হবার দিকেই ঝোঁক এসে যেতে পারে।

বর্তমান বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েও এগিয়ে চলার যে সেতু-মুখগুলো রয়েছে, সে-গুলোকে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নিলেই সেটা সংস্কারবাদী অবাস্তব জগতের চিন্তা হয়ে যায় না। কিন্তু যেটা অবাস্তব চিন্তা সেটা হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার "ভিতর থেকে" ক্ষমতার সংস্থায় মৌল পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে বলে ধারণা করা।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একটা বহুস্তরের অন্তর্বিরোধের জটিল কাঠামো। এই অন্তর্বিরোধগুলোকে এক কিস্তিতে এক কোপে সমাধান করা যাবে, এমন চিন্তা দুরূহ। তবে এধরনের সমাধানের সম্ভাবনাকে উড়িয়েও দেয়া যায় না। ক্রাসিন বললেন, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদী ক্ষমতার ব্যবস্থাতে যেসব ওপরের স্তরের লোক জড়িত, তাদের সঙ্গে প্রথমে জনগণের বিভিন্ন অংশের বিরোধের ফয়সালা করে নিতে হবে।

এই ঘটনাটা ঘটাতে পারলে এমন সব অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষমতা-সংস্থা তৈরীর পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে, যেগুলো সমাজতান্ত্রিক না হলেও পুঁজিবাদী সমাজের প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোকে ছাড়িয়ে আসবে। এই উপায়ে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে যাবে, কারণ একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই অন্তর্বর্তীকালের এই ধরনের গভীর রূপান্তর সম্ভব হতে পারে।

বার্ট রামেলসন এই প্রসঙ্গে বললেন যে, গৃহযুদ্ধকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলোতে কমিউনিস্টদের অংশ-গ্রহণের সমস্যার কোন তাত্ত্বিক সমাধান এখনও পাওয়া যায়নি বলে যে কথা

জোর দিয়ে বলা হয়, সেটা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুতপক্ষে এ ধরনের সমাধান প্রস্তাবাকারে এসেছে। তবে একথা মানতেই হবে যে, এই প্রস্তাবগুলো পরিকল্পনা-মাত্র এবং জীবনই প্রমাণ করবে, এরা তত্ত্বগতভাবে সঠিক না বেঠিক।

'প্রত্যেক খেলায় একটা নিয়ম' মেনে চলতে হয় বলে যে তাগিদ দেয়া হয়, সে সম্পর্কে বার্ট রামেলসন জিজ্ঞেস করলেন, এই সব নিয়ম যদি অগণতান্ত্রিক হয়, তবু কি সেগুলোকে মানতে হবে? সত্তরের দশকের শুরুতে ব্রিটেনে "খেলার নিয়মগুলির" একটা নিয়ম ছিল এই যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির ধর্মঘট করার একটা সীমা থাকবে। কিন্তু ব্রিটিশ শ্রমিকরা এই নিয়ম অনুসারে খেলেননি। তাঁরা এই নিয়মটাকে তুলে দেন। গৃহযুদ্ধ ছাড়া সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ধারণাগুলোকে বাস্তবায়িত করতে হবে সাংবিধানিক উপায়ের সঙ্গে পার্লামেন্ট-বহির্ভূত সংগ্রামের সম্মিলন সাধন করে। এখানে অবশ্য খেলার নিয়ম নয়, পার্লামেন্ট-বহির্ভূত সংগ্রামই হবে সিদ্ধান্তসূচক।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে এর সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ার ঝোঁক সম্বন্ধে রামেলসন বললেন, এ বিপদ সদা বিদ্যমান। তবে কোন বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে কোন কাজ করা প্রায় অসম্ভব। এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত হবার পরে যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে, এই বিপদকে এড়িয়ে চলা এবং সেটাই হচ্ছে আসল কথা।

রামেলসন বললেন, আমার সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, নির্বাচন ও গণ-আন্দোলনকে যেন অবশ্যই পরস্পর থেকে আলাদা করা না হয়। গণ-সংগ্রাম এমন একটা স্তরে পৌঁছতে পারে যেখানে নির্বাচন হলেই সমাজতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ অধিকাংশ পার্লামেন্ট জয়ী হবে। কিন্তু এখানে থামলেই চলবে না। কারণ এরপরে অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরকে কার্যক্রমের মধ্যে বাস্তবায়িত করা। এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে দরকার হবে গণ-সংগ্রাম, গণসংগঠন এবং পার্লামেন্টের বহির্ভূত সংস্থা-সমূহের। এই সংস্থাগুলি বেরিয়ে আসবে গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সরকারের ওপর দিতে হবে নিরন্তর চাপ।

রামেলসনের এই বক্তব্যের জবাবে ইউরি ক্রাসিন বললেন, বিপ্লবীতত্ত্ব সব সময়েই প্রয়োগের ব্যাপারে মুক্ত। জীবন সব সময়েই এমন সব সমস্যা এনে হাজির করে যেগুলোর সমাধানের জন্যে তাত্ত্বিক চিন্তাকে বার বার ব্যাপৃত

হতে হয়। এক্ষেত্রে সমস্যাটা এমন ব্যাপারে, যাকে নিয়ে মার্কসবাদীরা লেনিনের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে, বিপ্লবী চিন্তায় বিশ্লেষিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাত্ত্বিক সন্ধান চালিয়ে যাবেন।

গণতন্ত্রের অব্যাহত ধারা কথাটাকে মেনে নেয়া হলে যদি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের খেলার নিয়ম মেনে নেয়া হলো বলে ব্যাপারটাকে অভিহিত করা হয়, তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। সমস্ত কমিউনিস্টই যতক্ষণ পর্যন্ত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে কাজ করেন, ততক্ষণ তাদের স্বভাবতই এই গণতন্ত্রের "খেলার নিয়ম" মেনে চলতে হয়। বলশেভিকরা যখন জারের আমলের পার্লামেন্ট 'ডুমাতে' ঢোকেন, তখন এর নিয়ম কানুন পদ্ধতির ভিত্তিতে তাঁদের কাজ করতে হয়েছিল। এখানে ধর্মঘটের অধিকার সংকোচনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রয়োজনীয়তার যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, সেটা অন্য জিনিস। একটা বিশেষ বিধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তাবকে সামাজিক-সংস্কারবাদীরাও গ্রহণ করবে, যদি অবশ্য এই বিধি বদলাতে গিয়ে সামাজিক কাঠামোতে কোনো মৌল পরিবর্তন না আনতে হয়।

আমাদের আলোচ্য প্রশ্ন এই বিধিকে নিয়ে নয়। বুর্জোয়া "গণতন্ত্রের খেলার নিয়ম" মেনে চলে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করা যাবে কি যাবে না, সেটাই মূল প্রতিপাদ্য। এই প্রতিপাদ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন পূর্ববর্তী বক্তা। ইউরি ক্রাসিন বললেন, সমস্যাটা হচ্ছে এ ব্যাপারে কি করে দুটো চরম পন্থাকে এড়ানো যায়। প্রথম চরম পন্থা হচ্ছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে যেসব গণতান্ত্রিক সংস্থা আদায় করা হয়েছে সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেওয়া। এর অর্থ হচ্ছে অতিবাম, অতি-উগ্র এবং নৈরাজ্যবাদী প্রবণতায় উপনীত হওয়া। আর একটা চরম পন্থা রয়েছে। সেটা হলো, ক্রমবাদের চরমে যাওয়া। এর অর্থ হচ্ছে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার সিদ্ধান্তসূচক গুণগত উল্লম্ফনের নাম নিশানা মুছে দেওয়া। এই উল্লম্ফনের নাম বিপ্লব। দ্বিতীয়োক্ত চরম পন্থায় বিপ্লব ক্রমবাদের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, রূপান্তরের পদ্ধতি যতই ক্রমবাদী হোক, সাবেকী প্রতিষ্ঠানগুলো যতই ব্যবহৃত হোক, এই পথে চলেও দেখা যাবে, একটা সঙ্গীন মুহূর্ত আসবেই, যখন সম্পূর্ণ ও প্রভূত ক্ষমতা শ্রমিকশ্রেণীর হাতে চলে যাবে এবং সমগ্র গণতন্ত্রের সার বস্তুই বদলে যাবে। এই সঙ্গীন মুহূর্তের উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বার্ট

রামেলসন মন্তব্য করলেন, আমি শুধু একথাটাকে জোর দিয়ে বলতে চেয়েছি যে, গৃহযুদ্ধকে বাদ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজে পৌঁছবার লড়াইকে নিছক নিয়মতান্ত্রিকতাবাদী খেলায় যোগ দেওয়া বলাটা ভ্রমাত্মক।

পিটার বইচুক বললেন, পুঁজিবাদ কোন মতেই নিজেকে তার নিজের বিধিবিধান বা সাংবিধানিক রীতিতে দায়বদ্ধ করে রাখে না। এই বিধিবিধান ও নীতি তার শ্রেণীর লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা করলে সে এদের বর্জন করে। উপরন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলোতে যখনই জনগণ তাদের সতর্কতাতে সামান্যমাত্রও শিথিল হয়, তখনই দেখা যায়, গণতন্ত্র লোপাট হবার উপক্রম হয়েছে। শাসকশ্রেণীগুলো অধিকার ও স্বাধীনতাকে পদদলিত করে। আবার একই সময়ে এটাও ঘটেছে যে, বিপ্লবী প্রক্রিয়া তীব্র শ্রেণী সংগ্রামে উপনীত হয়েছে এবং একে পার্লামেন্টারীয় নিয়মকানুন নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এই সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের সাফল্য তখন গণতান্ত্রিকতার প্রক্রিয়াকে আরও কিছুটা এগিয়ে দেয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিমুখিন করে।

কামাল কেরভান বললেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের গণ্ডি পার না হতে পারলে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো অসম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে এটা মনে হতে পারে যে, ক্রমে সেই অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব যার ফলে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সহজতর হতে পারে। যাই হোক না কেন, শত্রু-শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজে শ্রেণী-বহির্ভূত কোন "ঐক্যমত" গঠিত হতে পারে না, "সকলের জন্যে কোন গণতন্ত্র" হতে পারে না যা থাকবে শ্রেণীর ঊর্ধ্বে। এই সমাজে অনিবার্যভাবে এমন একটা অবস্থা আসবে যখন বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের গণবিরোধী স্বৈরাচারী চেহারা বেরিয়ে আসবে, যদিও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় উদ্দেশ্যগুলো ছিল একেবারেই ভিন্নরূপ। তাছাড়া, বিপ্লবী শক্তিসমূহ তাদের প্রচেষ্টা পুরোপুরি সম্পন্ন করবে এবং তাদের শ্রেণীশত্রু শান্তভাবে তা দেখবে, এটা ধরে নেয়াই হবে বিপজ্জনক মোহ।

শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির প্রয়োগের পথেই যে সাফল্যের নিশ্চয়তা রয়েছে তা নয়। শাসকশ্রেণী যখন নিজেকে নির্বিঘ্ন মনে করে, তখন আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, শান্তিপূর্ণ পথে চলা যাচ্ছে। কিন্তু সংগ্রাম যতই এগোয়, শ্রেণীশত্রুর প্রতিক্রিয়াও ততই তীব্রতর হয়। ক্রমে সম্পূর্ণ নতুন অবস্থার উদ্ভব হয়। এই অবস্থা নিজে থেকে আসে না, এর উদ্ভবের মূলে থাকে শ্রেণীশত্রুর প্রতিক্রিয়া। সংগ্রাম ও আন্দোলন যেমন আরও বেশি অগ্রসর হয়, তেমনি শ্রেণীশত্রুও বেশি বেশি করে মরিয়া হয়ে লড়াই করে।

জোস লুই ম্যালো দ্য মোলিনা বললেন, কথাটা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক সংগ্রামে একটা গুণগত উল্লম্ফন অবশ্যই থাকবে। এর কারণ হলো এই যে, রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রের পরিবর্তন সমস্ত বিপ্লবেরই মূল প্রশ্ন। আমরা প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের স্বাধীনতাগুলোকে না ঝেঁটিয়ে ফেলেই এই গুণগত উল্লম্ফন সম্পন্ন করতে চেষ্টা করছি। তাত্ত্বিকভাবে এরপরে আর কোন প্রত্যাবর্তন ঘটবে না বলেই আমরা ধরে নিতে পারি। ক্ষমতাদখল এবং সমাজতান্ত্রিক ধরনের পরিবর্তনের পরে আবার পিছন দিকে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। প্রতিবিপ্লবের বিপদ থাকবে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই নির্ভর করবে সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তির ওপর, সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্যে জনগণের সাধারণ সমাবেশের ওপর।

মোলিনা আরও বললেন, পশ্চিম ইউরোপে এবং অন্ততপক্ষে স্পেনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সারবস্তু প্রকাশ পায় জনগণের স্বাধীনতা ও সম্ভাবনাগুলোকে সীমিত করার প্রয়াসের মধ্যে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিশেষত্বের কথা বলতে গিয়ে ক্লদ মাজাউরিক বললেন যে, গণতন্ত্রের এই বিশেষ ধারণাটা শুধু রাষ্ট্রের শ্রেণী সত্তাতেই নিবদ্ধ নয়। ক্লদ বললেন, এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরও একটা উদ্ভব ও বিকাশের প্রক্রিয়া রয়েছে। দীর্ঘকালব্যাপী এর একটা কাঠামো থাকার দরুন এর মধ্যে বিভিন্ন শক্তির ভারসাম্যের গতিধারা এবং জনগণ ও শাসকশ্রেণীর লড়াই প্রতিফলিত হয়েছে। এই গতিধারা ও লড়াই একই সঙ্গে শ্রেণী সমাজের কাঠামোর মধ্যেকার বৈজ্ঞানিক কারিগরি বিপ্লবের প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী থেকেছে। অর্থাৎ, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে বলতে হবে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। ক্লদ বললেন, এভাবে বিষয়টিকে দেখলে আমাদের রাজনৈতিক রণনীতির অর্থ বুঝতে কষ্ট হবে না।

বার্ট রামেলসন বললেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে বড় বড় ফাঁক আছে যেগুলোকে নিয়ে সমালোচনা করা যায়। কিন্তু উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে গণতন্ত্রের অস্তিত্বই নেই এবং যা আছে তা ধাপ্পাবাজি এবং শব্দ নিয়ে ধাঁধার সৃষ্টি। পুঁজিবাদ তার স্বভাব বশেই জনগণকে কাজের অধিকার কিংবা নিজ নিজ কৃতিত্ব অনুসারে নিজেদের গড়ে তুলবার অধিকার দিতে পারে না। এই ধরনের অত্যাবশ্যকীয় গণতান্ত্রিক অধিকারের ব্যবস্থা করা পুঁজিবাদের ক্ষমতার বাইরে। এই ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রেই সম্ভব। একথা বলেই অবশ্য রামেলসন এ প্রসঙ্গে সাবধানবাণী দিয়ে বললেন, সমাজতান্ত্রিক

গণতন্ত্রের বিশেষত্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার এবং পুঁজিবাদের বিশেষত্ব রাজনৈতিক অধিকার—এইভাবে বিষয়টাকে খাঁজ কেটে দেখবার যে চেষ্টা সাধারণত করা হয়, সেই ফাঁদে যেন আমরা কিছুতেই না পড়ি।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশের কোন নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়া নেই। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত হয় না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি সংগ্রাম করে যে সাফল্য অর্জন করে, তার ওপরেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ভিত্তি তৈরি করে নিয়ে এই সাফল্যগুলির প্রতিবন্ধকতাগুলোকে অপসারিত করে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এই ভিত্তি নিয়েই সেইসব অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা ঘটায়, যেগুলো পুঁজিবাদের ব্যবস্থাগত সামর্থ্যেরই বাইরে।

মাগ্‌সারঝাভিন সান্‌ঝ্‌দোরঝ বললেন, গণতন্ত্রীকরণের মধ্য দিয়ে সমগ্র বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোকে ক্রমান্বয়ে নতুন ছাঁচ দেবার তত্ত্ব বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শ্রেণী-প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করার এবং এই রাষ্ট্রটাকেই উৎখাত করার প্রশ্নকে সামনে রাখতে চায় খোলা তাগিদ হিসেবে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাঠামোগত উন্নতিবিধান কিংবা এই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক বিকাশেই সাব্যস্ত হয়ে যায় না যে, একে উচ্ছেদ করার আর প্রয়োজন পড়বে না। এর সমগ্র অস্তিবাচক বস্তুগুলিকে বহাল রেখেও একে বিলুপ্ত করার প্রয়োজন থেকেই যায়। ক্ষমতা দখল করার জন্যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যবহার করার অর্থ এটা হবে না যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা যেতে পারে, কিংবা সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার জন্যে একে যন্ত্ররূপে কাজে লাগানো যেতে পারে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে চেহারাই ধারণ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত এর শ্রেণীবস্তুর কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস অবশ্যম্ভাবী। যাই হোক, বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে ব্যবহার করার চিন্তা তত্ত্বের ক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য নয়। সারা বিশ্বের পরিমাপেও এর প্রয়োগ সম্ভব নয়। এর প্রয়োগের ব্যাপারটা শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মঙ্গোলিয়ার দৃষ্টান্তই ধরুন। এখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজনের দিক দিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে বাইরের জিনিস বলে প্রমাণিত হয়েছে। মঙ্গোলিয়া বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া ধরনের গণতন্ত্রের দিকে না গিয়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছে।

অয়িভা বিয়রক্‌বাকা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ক্ষমতাব্যবস্থাতে কমিউনিস্ট-দের অংশগ্রহণের নীতির দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্টরা বর্তমানে সরকারে শরিক হলেও তাঁদের মনে এমন কোন মোহ নেই যে, দেশে

এখন বেশী গণতন্ত্র রয়েছে। তাঁরা ভাবছেন না যে, সরকারে যোগ দেবার আগে গণতন্ত্র কম ছিল, সরকারে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তা বেড়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, যেদিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন, সরকারে আমাদের অংশগ্রহণের ফলে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের অভ্যন্তরে "ওপর থেকে চাপ" সৃষ্টি করে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ আদায়ের সংগ্রামে নতুন নতুন সুযোগের সৃষ্টি হচ্ছে। অবশ্য এইসব সুযোগের ব্যবহার এবং এগুলোকে ফলপ্রসূ করার কাজ সর্বোপরি নির্ভর করছে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সম্ভাবনা, শক্তি এবং সংগঠনের ওপর, অর্থাৎ "তলা থেকে চাপ সৃষ্টির" ওপর।

একটা নতুন অধিকাঠামোর উদ্ভব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জোস লাভা মন্তব্য করলেন, রাষ্ট্রক্ষমতার ভিতরে অথবা বাইরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াসমূহের উন্মোচনকে ভাগ করে ভিতরের অথবা বাইরের হিসেবে দেখে এদের একটাকে অন্যটার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো ঠিক হবে না। এদের আন্তঃক্রিয়ার সম্ভাবনা-গুলোকে ফলিয়ে তুলতে হবে।

ইউরি ক্রাসিন জোর দিয়ে বললেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পদ্ধতি যতই না ক্রমান্বিত হোক, শুধুমাত্র বর্তমান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহের কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে তার সম্বন্ধে ধ্যানধারণা করা যায় না। এইসব প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এমন কতকগুলো বিভিন্ন ধরনের মৌল সংগঠন গড়ে উঠেছে, যেখানে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার সমস্ত অন্তর্বর্তী বিকাশকে প্রথমে সাধারণভাবে এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তমূলকভাবে প্রভাবিত করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, একটা বুর্জোয়া-বিপ্লব ঘটবার প্রক্রিয়ার মধ্যে জ্যাকোবিন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এ পর্যন্ত যত জায়গায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছে, সেখানেই দেখা যাবে, বিপ্লবের আগে এই জ্যাকোবিন ক্লাবের ধরনের মৌল সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল।

এইসব মৌল সংগঠনকে বিভিন্নরূপে ঢেলে নতুন ক্ষমতা-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করা হবে কি হবে না সেটা একটা পৃথক বিষয়। সোভিয়েত ক্ষমতা এই ধরনের ব্যাপারে একটা ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত। সোভিয়েতসমূহ বা গণপঞ্চায়েতগুলি পুরানো রাষ্ট্র ক্ষমতাকে অপসারিত করে অধিষ্ঠিত হয়েছিল পৃথক রাষ্ট্র-ক্ষমতা হিসেবে। এটা ছিল একটা সম্পূর্ণ নতুন রাষ্ট্রীয় সংস্থা। আজকের বিভিন্ন উদ্ভূত প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপকতরভাবে এইভাবেই কাজে লাগানো যায়। লেনিন থেকে শুরু করে গ্রামচি এবং অন্যান্যদের মারফত এই চিন্তাটা সচল রয়েছে। পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে কার্যকরীভাবে ইতিমধ্যেই এই চিন্তাকে

রূপায়িত করা হয়েছে। ইউরি ক্রাসিন আরও বললেন, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিভিন্ন শক্তির অপরিমেয় অধিকাংশ অনুকূল থাকলে শ্রমিকশ্রেণী বর্তমান সংস্থাগুলোতেই নতুন শ্রেণীবস্তু ভরে তাদের রূপান্তরিত করে নিতে পারবে। এ অবস্থায় কোন বিকল্প ব্যবস্থা খাড়া করার দরকার পড়বে না।

বিপ্লবী রূপান্তরসমূহের দিকে ঝোঁক ঃ প্রাথমিক উপকরণসমূহ, পর্যায়সমূহ, প্রশ্নাবলী

সম্মেলনে উত্থাপিত আরেকপ্রস্থ প্রশ্নের বিষয়গুলি হচ্ছে নিম্নরূপ :

যে ঝোঁক জনগণকে সামাজিক বিপ্লবের দিকে নিয়ে যাবে, তার জন্যে অবস্থা সৃষ্টি করার উপায় ; বিপ্লবী প্রক্রিয়ার জটিলতা এবং একে যে কয়েকটা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে সে সম্বন্ধে ধারণা ; শ্রমিকশ্রেণী কতকগুলো নতুন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এবং এদের মধ্যে বিশেষভাবে কতকগুলো সমস্যা রয়েছে যেগুলো সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক এবং বিপ্লবের আন্তঃক্রিয়া থেকে উদ্ভূত ; জনগণকে সমাজতন্ত্রের পক্ষাবলম্বী করার জন্যে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত স্থাপনের গুরুত্ব।

জার্মেন ফেডারেল রিপাবলিকে একটা উন্নত রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। এখানে গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করতে গিয়ে হোর্স্ট্ ভিলহেল্ম্স দেখালেন যে, নিকট ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক ও সামাজিক প্রগতির দিকে এই দেশের দ্রুত মোড় ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বললেন, বর্তমান কালপর্বের জন্যে নির্ধারিত কার্যক্রম এখন পুঁজিবাদী কাঠামোকে বিবেচনার মধ্যে রেখে তাতেই নিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু এই কাঠামোর মধ্যেও এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে তাতে একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতি চক্রকে খর্ব করার পক্ষে সহায়ক হবে এবং এইভাবে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী শক্তিগুলির অবস্থানগুলোকে দৃঢ়তর করা যাবে। মৌল পরিবর্তন অবশ্য তখনই আসবে যখন এই সংগ্রাম একটা একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। আমরা এই ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গভীরগামী গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া বলে মনে করি।

কিন্তু এই একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কখনই আমরা একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে দেখছি না। জার্মেন ফেডারেল রিপাবলিকের বর্তমান অবস্থা ও শ্রেণীসংগ্রামের পটভূমিতে আমরা

মনে করি যে,নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে যাবার বিপ্লবী উত্তরণ আনার জন্যে উপরোক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটা সম্ভবপর সংস্থা। ভিলহেল্‌ম্‌স আরও বললেন, এই প্রস্তাবিত একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী গণতন্ত্রের সংগ্রাম একটা সমগ্র কালপর্ব জুড়ে চলবে। এই পর্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কিছু কিছু টিকে যাওয়া উপাদান সমাজতন্ত্রের প্রারম্ভিক উপকরণের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া হবে।

জার্মেন ফেডারেল রিপাবলিকে সমাজতন্ত্রের পথ খোলার জন্যে গণতান্ত্রিক ও সামাজিক প্রগতির দিকে দ্রুত মোড় ফেরাবার এবং একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী জন-গ্রহণযোগ্য সংগ্রামের রূপ। আমরা একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী সামাজিক রূপান্তর এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরকে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার অন্তর্বর্তী বিপ্লবী প্রক্রিয়ার দুটি আন্তঃসম্পর্কিত পর্যায় বলে মনে করি।

এই প্রশ্নটিতেই জোস লুইস দ্য মোলিনা ভিন্ন মনোভাব ব্যক্ত করলেন। তিনি একটি প্রত্যুত্তরে মন্তব্য করলেন যে, সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম যেহেতু একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা সেজন্যে বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন পর্যায়ে বা পর্বে ভাগ করে দেখার বিশ্লেষণকে আমরা নিরর্থক বলে মনে করি। এই বিশ্লেষণকে আমরা সাবেকী বলে অভিহিত করি। এতে দেখানো হয় যে, সংগ্রামের প্রক্রিয়ার প্রথমে থাকে গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম এবং এর পরে মূলত একে আরও শক্তিশালী করার এবং একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী রূপান্তর সাধনের সংগ্রাম।

ডিমিট্রিস টসরাস বললেন, গ্রীসে বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো বিপ্লবী প্রক্রিয়ার পর্যায়গুলিকে নির্দিষ্ট করা। আমরা মনে করি, আমাদের ক্ষেত্রে একটা সাম্রাজ্যশীল বিপ্লবী প্রক্রিয়াতে ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত দুটো পর্যায় থাকা দরকার। এই দুটো পর্বের প্রথম পর্বে একটা একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতন্ত্র, তথা একটা জন-গণতন্ত্র সম্পন্ন করা হবে। এর প্রধান সারবস্তু হবে সাম্রাজ্যবাদের ওপর আমাদের দেশের নির্ভরশীলতাকে বিদূরিত করা, স্থানীয় এবং বৈদেশিক একচেটিয়া পুঁজির সংস্থাগুলোকে উচ্ছেদ করা এবং সামাজিক জীবনকে গণতান্ত্রিক করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে আসবে সেই রাষ্ট্রক্ষমতা যাকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তার ধ্রুপদী রচনাতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বলে অভিহিত করেছে।

একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজির ক্ষমতা গণতান্ত্রিক সংস্কারের পথরোধ করে রয়েছে। প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম শুধু বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাঠামোর অভ্যন্তরে গণ-

তান্ত্রিক সাফল্যের প্রসার ঘটানোতেই সীমিত থাকবে না। এই সংগ্রাম অবধারিতভাবে একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতিচক্রের উচ্ছেদের জন্যে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্যে সংগ্রামে প্রসার লাভ করবে। বিপ্লবী সংগ্রামের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডিমিট্রিস টসারাস জোরের সঙ্গে মন্তব্য করলেন যে, যদি একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতিচক্র তথা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো হিংসার আশ্রয় নেয়, তাহলে আমাদেরও মতাদর্শগতভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে অ-শান্তিপূর্ণ পথে চলবার জন্যে। তিনি আরও বললেন, যে দৃষ্টিভঙ্গীতে অশান্তিপূর্ণ পথকে অগণতান্ত্রিক বলা হয়, আমরা তাকে প্রত্যাখ্যান করি। এর কারণ হলো এই যে, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে দাঁড় করানো হয় এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে শুধু সেইগুলোই গণতান্ত্রিক যেগুলো বুর্জোয়াদের কাছে গ্রহণযোগ্য।

অ্যান্টোনিও জান্নাজো তাঁর স্বদেশ ইটালিতে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার জন্যে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির বিশ্লেষণের মতাদর্শগত উপাদানসমূহ সম্বন্ধে বক্তব্য বললেন। তিনি দেখালেন যে, ইটালীয় মার্কসবাদ ইতিহাসের গতিধারায় সমাজতন্ত্রকে একটি সংগ্রামী বিষয়বস্তু হিসেবে দেখে এসেছে। সমাজতন্ত্র তাঁদের কাছে শুধু একটা চিরকালের জন্যে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় দৃষ্টান্ত নয়। সমাজতন্ত্র হচ্ছে একটা গভীরগামী ও সন্ধানী অভিযাত্রা, যার লক্ষ্য একটা মানব নগরীর রচনা। এখানে ব্যক্তি তার সমস্ত পারদর্শিতাকে বিকশিত করে তুলতে সক্ষম হবে। এই ধারণা বর্তমান ঐতিহাসিক পর্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এই পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী তাদের সংগ্রাম ও সামাজিক অর্থনৈতিক টানাটানির ফলে পরস্পরকে ধ্বংস করে বসতে পারে এমন বিপদও রয়েছে। আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে নাগরিক সমাজের জটিল গ্রন্থনার মধ্যে প্রতিমূর্ত করতে হবে দৈনন্দিন সংগ্রামে। জান্নাজো বললেন, এই সংগ্রামগুলো শীতের প্রাসাদ দখল করার চেয়ে অনেক কম আবেগের দাবিদার, কিন্তু এদের গুরুত্ব সমপর্যায়েরই।

জান্নাজো আরও বললেন, ইটালীয়-সমাজতন্ত্রের দুর্দমনীয় গতি এবং "তৃতীয় পথের" জন্য এর সন্ধান এসেছে একটা বিশেষ বোধ থেকে। সেটা হলো এই যে, সমাজতন্ত্রীকে বহু বিচিত্র অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হবে। জান্নাজো বললেন, যেসব সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে-বিপ্লবী

পথে রূপান্তরিত করতে পারে নি, তাদের নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলোকে এই তৃতীয় পথ পরিহার করে চলবে।

বর্তমান বাস্তবতাগুলোকে ঠিক যেমনটি রয়েছে তেমনিভাবে রম্য নিকেতনে পরিণত করার প্রলোভনের কাছে সমাজতন্ত্র পরাভব স্বীকার করবে না। পুঁজিবাদী যুক্তিজালের সংকটের জটিলতম গোলক ধাঁধার মধ্যে যে সব শক্তি লড়াই করে টিকে থাকতে এবং নতুন মূল্যবোধের সন্ধান দিতে পারবে, তাদের মঞ্জরিত করে তুলতে সহায়ক হবে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র নতুন ছাঁচের ব্যক্তিত্বকে, সমাজমনা শ্রমজীবীকে বিকশিত করে তুলবে। এই সমাজমনা শ্রমজীবীর কাজকর্ম শিল্পসংস্থার রীতিসিদ্ধ কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না, সর্বশেষ কারিগরি বিদ্যার সাফল্যের ভিত্তিতে কুশলী সমাজসেবামূলক নবনব কার্যক্রমে অভিব্যক্তি পাবে। সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রীমনা মধ্যশ্রেণীর মানুষকেও বিকশিত করে তুলবে। এই শ্রেণীগুলো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পৌঁছে পরগাছাসুলভ খাটাখাটনির বদলে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের অর্থ বুঝতে পারবে।

এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের ফলে এটা সম্ভব হবে যে, বিভিন্ন শ্রেণী তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলবে না এবং দম ফুরিয়ে যাওয়া "নিষ্ক্রিয়" বিপ্লবের বিপদকে এতে এড়ানো যাবে। এই ধরনের নিষ্ক্রিয় বিপ্লব সম্বন্ধে গ্রামচি বিপ্লবী শক্তিসমূহকে হুঁশিয়ার করেছিলেন। 'নিষ্ক্রিয়' বিপ্লব অর্ধ-পথে থেমে যায় এবং আরব্ধ রূপান্তর সাধনকে অসমাপ্ত রাখে। জান্নাজো বললেন, আমি যদি ভুল না দেখে থাকি, তাহলে বর্তমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও এই ঘটনার প্রমাণ রয়েছে। তিনি আরও বললেন, মার্কসবাদকে নিজের সম্বন্ধে আরও বেশি বিশ্লেষক হতে হবে। মার্কসবাদকে এমন বিজ্ঞান হতে হবে যা সমগ্র বাস্তবতাকে যুক্তিসিদ্ধ করার দাবি করবে না কিংবা তার চাহিদার কাছে এই সমগ্র বাস্তবতাকে জোর করে নত করবে না। পরন্তু এই বিজ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ততার উপাদানগুলোকে স্বীকৃতি জানাবে এবং তাদের জন্যে জায়গা করে দেবে।

গ্রামচি বলেছিলেন যে, পার্টি মার্কসবাদকে একটি নিখুঁত পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করে। পার্টির কাছে মার্কসবাদ হচ্ছে ভবিষ্যতে সন্ধানী অভিযান চালাবার নির্ভুল যন্ত্র বা প্রিসিসন ইনস্ট্রুমেন্ট। এই যন্ত্র দ্বারা প্রধান প্রধান ঘটনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়, তাদের নিয়ন্ত্রিত করা যায় এবং (সুতরাং) তাদের আয়ত্তেও আনা যায়।

জান্নাজো বললেন, যদি সঠিক পদ্ধতি হয়েও থাকে, তবু ঐতিহাসিক লেনিনবাদ পাশ্চাত্য দেশগুলোতে "গতিশীল যুদ্ধ"কে ছড়াতে পারে নি। গ্রামচি এই সিদ্ধান্ত দাখিল করেছিলেন যে, পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বিপ্লব হবে একটা বিলম্বিত প্রক্রিয়া। একে কার্যকরী করতে হবে ঐক্যমত দ্বারা। এতে কোন গণ-সন্ত্রাসের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে না। যেসব অসংখ্য প্রতিরোধ সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক শক্তি দিয়ে নাগরিক সমাজের কাঠামো তৈরি, তাদের ক্রমে ক্রমে বিপ্লবের পক্ষে টেনে আনতে হবে।

জান্নাজো গণতন্ত্ররক্ষার এবং প্রাথমিকভাবে বর্তমানে গণতন্ত্রের লড়াই যে অর্থে সমন্বিত হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দিলেন। এই বিষয়টাকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ "রক্ষা" কথাটা থেকে এই ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, এতে শুধু অতীতের তথা বুর্জোয়া জগতের অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধগুলোই সংশ্লিষ্ট। অথচ লড়াইটা করণীয় হতে পারে সেই মূল্যবোধগুলোর জন্যে, যেগুলোকে ছেড়েও দিতে হতে পারে অথবা যেগুলোকে সম্পূর্ণ নাও পাওয়া যেতে পারে। যে কমিউনিজম আধুনিক উৎপাদক শক্তিসমূহের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে, তার বিকাশ সম্ভব শুধুমাত্র গণতন্ত্রের একটা ধারণার কাঠামোর মধ্যে। এই ধারণাটা অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সামাজিক বিকাশের, দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত রচনার সঙ্গে সামাজিক সংগঠনসমূহের ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতার এবং কার্যকর প্রশাসন ও গণতান্ত্রিকতার সঙ্গে অর্থনৈতিক দক্ষতার সামঞ্জস্য বিধান করে।

জান্নাজো এইবলে উপসংহার টানলেন যে, কার্যকর গণতন্ত্র ছাড়া বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিপ্লব মুষ্টিমেয় সংখ্যক মাতব্বরের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং এর ফলে সামাজিক সম্পর্ক বিভিন্ন শ্রেণীর বিপর্যয়মূলক ভারসাম্যের কিনারায় এসে দাঁড়ায়। এর ফল হতে পারে নতুন নতুন ধরনের স্বৈরাচারী শাসন। একমাত্র গণতন্ত্রই নতুন প্রয়োজনসমূহের পরিমাপ ও গুণাত্মকতা জোগাতে পারে। গণতন্ত্রই পারে এই প্রয়োজনসমূহের সঙ্গে উৎপাদক-যন্ত্রকে নিয়োজিত করতে।

জান্নাজো যেসব সাধারণ তাত্ত্বিক মত উত্থাপন করেন, সেগুলি সম্বন্ধে অন্যেরা তাঁদের মতামত দেন।

এসপ পাহাদ বললেন, "তৃতীয় পথ"টি প্রধানত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতেই প্রয়োগ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ লক্ষণীয়ভাবে পরস্পরের মধ্যেকার পার্থক্যের কথা জানিয়েছে। সমাজতন্ত্রে

উত্তরণের পথের বৈচিত্র্যের ধারণার মধ্যেই এই চিন্তা প্রতিফলিত। অবশ্য উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কতকগুলো সহজাত বৈশিষ্ট্য এই দেশগুলোতেও সাধারণভাবে উপস্থিত। এই সব বৈশিষ্ট্যের কথা বিচার করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং এই ধরনের অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাকুক দক্ষিণ আফ্রিকাকেও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের পাশে রাখা যেতে পারে। কিন্তু আমরা জানি, সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভিন্ন ধরনের পথ নেয়া হচ্ছে।

সোস্যাল ডেমোক্রাটরা তাদের চিন্তাধারার প্রয়োগ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলে যে, এইসব চিন্তাধারাকে বেশ কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় দেশে কাজে লাগানো হয়েছে এবং তৃতীয় বিশ্বের বিশেষ অবস্থাতে এদের কাজে লাগানো যেতে পারে। এরা তৃতীয় বিশ্বের জন্যেও একটা "তৃতীয় পথ" বাতলেছে। পাহাদ বললেন, এদের "তৃতীয় পথ" অবশ্য ভিন্ন জিনিস। কিন্তু আরেকটা "তৃতীয় পথ" নিয়ে প্রস্তাব করার মধ্যে—যুক্তির জায়গা কোথায়?

আলেকজান্দার সবোলেভ বললেন, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শীত-প্রাসাদ দখল করার ব্যাপারটা অতীতের বস্তু। আজ বোধ হয় আর বুরবন, বাকিংহাম, কুইরিনাল এবং অন্যান্য "শীতপ্রাসাদ" দখল করার প্রয়োজনই পড়বে না। কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই এই অপ্রয়োজনীয়তাকে সাধারণ নীতি হিসাবে চালানোটা কি 'জল্দি' সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে না? যে কোন শক্তিই সমাজতন্ত্রের জন্যে বাস্তব প্রয়াস চালাচ্ছে, তাদের ওপর আঘাত হানার জন্যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়েছে এবং আঘাত হেনেছেও। এই আঘাত ঠেকানোর উপায় কি?

গির্গিন গির্গিনভ বললেন, "ইটালীয় মার্কসবাদ" হচ্ছে একটা আলঙ্কারিক প্রয়োগ, ঠিক যেমন "বুলগেরীয় গণিত।" বিজ্ঞানকে এবং এর আওতার মধ্যেই মার্কসবাদকে জাতিগত বহুত্বের ধারণা দ্বারা ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না। মার্কস-বাদ বহু পূর্বেই বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এই বিজ্ঞান সারসত্তার দিক দিয়ে বিশ্লেষক এবং আত্মবিশ্লেষক বিজ্ঞান। "সমগ্র বাস্তবতাকে যুক্তিসিদ্ধ" করার অথবা এই বাস্তবতাকে জোর করে নিজের প্রতিপাদ্যের অভিমুখী করার দাবি এই বিজ্ঞান করে না। এই বিজ্ঞান সামাজিক জীবনকে বুঝতে চায় এবং একে শ্রমজীবী জনগণের কাজে লাগাবার জন্যে বদলাতে চায়।

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বর্তমান বাস্তবতাকে নিয়ে মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিকেরা একটা তত্ত্ব খাড়া করতে চায় না। গির্গিন গির্গিনভ বললেন,

আমাদের জনগণ যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলেছে তাকে আমরা আদর্শ স্থানীয় কিংবা পূর্ণাঙ্গ বলে অভিহিত করতে চাই না। আমরা চেষ্টা করছি কমিউনিস্ট সমাজের দিকে এর অগ্রগতির কার্যক্রমগুলোকে নির্ধারিত ও পরিচালিত করতে। এই অর্থে, উন্নত সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রসরমান রূপান্তরগুলো পূর্ণাঙ্গতার জন্যে হাত বাড়াচ্ছে। এ জন্যে সময় লাগবে। কিন্তু কমিউনিজমের অভিমুখী সারা পথ এখনও চলার বাকি রয়েছে বলে কি শুধু এই কারণেই অর্ধপথে দাঁড়িয়ে পড়ার কথা বলা সঙ্গত হবে?

ইউরি ক্রাসিন বললেন, মার্কস বলেছিলেন যে বিপ্লবগুলো কোনো কোনো সময়ে এগিয়ে চলতে চলতেই থমকে থেমে যায়। তাঁর এই কথার যথার্থতা তাঁর জীবিতকালেই প্রমাণিত হয়েছিল। ক্রাসিন প্যারি কমিউনের দৃষ্টান্ত দিলেন। এর পরে আসে ১৯০৫ সালের বিপ্লব। এই বিপ্লব পরাস্ত হয়েছিল, কিন্তু এই পরাজয় থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল। আজকের দিনের বাস্তবতা থেকেও একই ধরনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে। চিলির বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের কথাই ধরা যাক। কিন্তু যদি ঐতিহাসিক বাস্তবতার নীতি অনুসরণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, থমকে যাওয়ার চিন্তাটি উন্নত সমাজ-তন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উন্নত সমাজতন্ত্র একটা নতুন সমাজ গড়ার সৃজনশীল কাজগুলোকে বাগে আনতে চেষ্টা করছে। এই সমাজেরও সমস্যা রয়েছে, তবে পর্যায়ে পর্যায়ে এসব সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। ক্রাসিন জোর দিয়ে বললেন, মাঝপথে কোথাও থামে না সমাজতন্ত্রী সমাজ।

"ঐতিহাসিক লেনিনবাদ" পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে "গতিশীল যুদ্ধ"কে ছড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে যেকথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে, সে সম্বন্ধে ইউরি ক্রাসিন মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন; প্রথমত এই "গতিশীল যুদ্ধে"র ব্যাপারটা যে কি তা পরিষ্কার নয় আমাদের কাছে। দ্বিতীয়ত, লেনিনবাদ এমন ধরনের কোনো লক্ষ্য কখনও ঠিক করে নি। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে টেরাসিনির সঙ্গে লেনিনের সুবিদিত তর্কের প্রসঙ্গ টেনে ক্রাসিন বললেন, লেনিন ইটালির বিপ্লবীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন ইটালির নিজস্ব পথ বার করার জন্যে। লেনিন তাঁদের বলেছিলেন তাঁরা যেন রাশিয়ার অভিজ্ঞতাকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ না করে। নবীন ইটালীয় কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন প্রতিনিধি এবং বিশেষ করে এ বর্ডিগা অতিবাম পন্থার কথা পেড়েছিলেন। লেনিনের বক্তব্য ছিল তার জবাব।

ব্যাপক অর্থে লেনিনবাদের ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ক্রাসিন বললেন, পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিস্টরা এবং বিশেষ করে ইটালির কমিউনিস্টরা যে নিজস্ব পথের সন্ধান করছেন, তার শিকড় বিদ্যমান রয়েছে এই ঐতিহাসিকতায়। মার্কস ও এঙ্গেলস যতটা রাশিয়ার অবস্থা বিবেচনা করেছিলেন, তার চেয়ে বেশি পশ্চিম ইউরোপীয় অবস্থার শক্তিশালীতা লক্ষ্য করে তার ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের চিন্তাসূত্রকে উপস্থাপিত করেছিলেন। আমি এখানে তাঁদের বক্তব্য আনছি না। আমি শুধু বলতে চাই যে, এই পথের উদ্ভব-সূত্রকে লেনিনের লেখাতে পাওয়া যাবে। গ্রামচি তাঁর ধারণাগুলির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সোজাসুজি লেনিনের বক্তব্যের দিকে নির্দেশ করেছেন।

শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণীসংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টান্তস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বললেন অয়িভা বিয়র্কবাকা। তিনি বললেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে যদি সমাজতন্ত্রের পথ খুলতে হয়, তবে পুঁজিবাদী উৎপাদন কাঠামো এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গভীর গণতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। একটা সমস্যা হচ্ছে এই যে, সমাজতন্ত্র শুধু পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম-মূলক বিকল্পের প্রস্তাবই করে না, সমাজতন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে একটা সমাজব্যবস্থা হিসেবে সত্যিকার অর্থে বহালও রয়েছে। এই অবস্থায় সমাজতন্ত্রকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখারও ব্যাপার রয়েছে।

বিয়র্কবাকা জোর দিয়েই বললেন, সমাজতন্ত্র নিঃসন্দেহে একটা বিশাল ও প্রগতিশীল অগ্র পদক্ষেপের ফলশ্রুতি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এটাও বিবেচ্য যে, কয়েকটি সমাজতন্ত্রী দেশের বিকাশের হার যতই না কেন উঁচু হোক, এখনও তারা মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর সমকক্ষ হতে পারে নি। পক্ষান্তরে, পাশাপাশি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বহুসংখ্যক অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম এতটা এগিয়েছে যে, এর ফলে এই সব দেশে সামাজিক-নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং জীবনযাপনের মানোন্নয়ন সাধিত হয়েছে। অবশ্য পুঁজিবাদী সমাজে বেকার-সমস্যা বিপজ্জনক থেকে যাওয়ায় জনগণ-মনের প্রতিনিয়তই নিরাপত্তাধীনতার আশঙ্কা। কিন্তু এ প্রশ্নেও মনে রাখতে হবে যে, আমরা শুধু এই নিরাপত্তা-হীনতার কথা তুলে কিংবা শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন অংশের দুর্ভার জীবনের কথা বলে শ্রমজীবী জনগণকে সমাজতন্ত্রের দিকে টানতে পারবো না। শ্রমিক

শ্রেণীর আন্দোলন এইসব দেশে ব্যাপকতর এবং বেশি বেশি করে বুনিয়াদি দাবি উপস্থাপিত করেছে। তারা চেয়েছে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা, উচ্চতর গুণগত জীবন, স্বাস্থ্যকর ও আধুনিক কাজের এবং বসবাসের শর্ত, পরিবেশের সুবিধা, শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নতি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অবস্থায় যে কোনো সমাজতন্ত্রী দেশের তরফের কর্তব্য হলো এই যে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর শ্রমজীবীরা যে নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, সেইসব ক্ষেত্রে কিভাবে শ্রমজীবীরা এগিয়ে যাবে তা নির্দিষ্ট বিষয় ধরে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া।

উন্নত-পুঁজিবাদী দেশসমূহের শ্রমজীবীরা বিভিন্ন জরুরী সামাজিক সমস্যা এবং গণতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রের প্রশ্নগুলোর উত্তর চাইছে। এ ব্যাপারে সমাজতন্ত্রী দেশসমূহ তাদের সামনে সমস্যা সমাধানের দৃষ্টান্তস্বরূপ। এই অবস্থায় কখনও কখনও প্রশ্ন জাগে এই যে, পুঁজিবাদী দেশসমূহের জনগণ সমাজতন্ত্রের জন্যে উঠেপড়ে লাগে না কেন? এই উঠেপড়ে না লাগার কারণ হিসেবে অন্ততপক্ষে আমাদের ফিনল্যাণ্ডে প্রচারযন্ত্র ও মতাদর্শগত প্রভাবের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের কব্জা রয়েছে বলে শুধু তাদের ওপর দায় চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রমজীবীরা সংগ্রাম করে যেসব সাফল্য অর্জন করেছে সেগুলোর নিজস্ব মূল্য রয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ওপর এই মূল্য নির্ভরশীল নয়। স্বভাবতই যে শ্রমজীবীরাও সমাজতন্ত্রে উত্তরিত হতে চাইছে, তারা তাদের অধিকারগুলোকে রক্ষা করতে এবং প্রসারিত করতে চাইবে। কিন্তু এখানে সেটা কিভাবে কার্যকরী করা হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আমাদের। এ বিষয়ে আমাদের তরফ থেকে প্রচুর পরিশ্রমও করা দরকার। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সমস্ত নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি এবং প্রত্যেকটি সংশ্লিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থার কথা আমাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে। বিয়র্ক বাকা বললেন, আমরা সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের অভিজ্ঞতাকে খতিয়ে দেখছি। ফিনল্যাণ্ডের বিশেষ অবস্থার বিশ্লেষণের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, যান্ত্রিকভাবে আমরা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহকে অনুকরণ করবো না।

সারদা মিত্র বললেন, সমাজতন্ত্রের পথের ওপর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। এর কারণ হচ্ছে এই যে, জাতীয় বিশেষ অবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রতিসারিত আলোর মতো সাধারণ ঐক্যের উপাদানগুলি বিভিন্নমুখী

হয়ে যায়। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থাকার দরুন আলোচনা ও সমালোচনাও স্বাভাবিক। তবে সমস্ত সমালোচনা গঠনমূলক হয় না।

যে সমালোচনা গঠনমূলক কাঠামোকে ছাড়িয়ে যায় এবং বর্তমান সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতাকে অবমূল্যায়িত করার জন্যে আমাদের শত্রুদের প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে যায়, সারদা মিত্র তার প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করলেন। তিনি বললেন, এই ধরনের সমালোচনা অসমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মনে রাখা দরকার, বর্তমান সমাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত জনগণের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কমিউনিস্টদের হাতে শক্তিশালী অস্ত্র বিশেষ।

সারদা মিত্র আরও বললেন, বর্তমান সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় সমালোচকরা নিজেদের দেশে যে ধরনের সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চান সেই ছাঁচেই বক্তব্য রাখেন। প্রথমে সাধারণত "আকাঙ্ক্ষিত সমাজতন্ত্রের" একটা "আদর্শ নমুনার" ছক উপস্থাপন করা হয়, তারপর এর সঙ্গে ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্রে উপনীত দেশের সমাজকে তুলনা করে দেখানো হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা হাতের কাছে পাওয়া গেলেও সেটা কাজে লাগানো হয় না। এখানে বরঞ্চ দাবি করা হয় যে, বাস্তব সাফল্য নমুনাকে অনুসরণ করবে। যুক্তি দেওয়া হয় যে, এইভাবে নমুনাটা আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠলে তাতে সমাজতন্ত্রের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে নমুনাটার পক্ষে বক্তব্য রাখা এবং তার সারবত্তা প্রমাণ করা সহজ হবে। এ ধরনের ব্যাপার কি সমাজতান্ত্রিক বিকাশের প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ওপর জুলুমবাজি নয়? তাহলে, প্রত্যেক দেশের বিশেষ অবস্থাতে সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করার পরে সামাজিক বিকাশের সাধারণ ঐক্যমূলক উপাদানগুলোর ভিত্তিতে প্রত্যেকটি জাতির সমাজতন্ত্রের নিজস্ব পথ নেবার যে অধিকার রয়েছে, সেসম্বন্ধে আমাদের করণীয় কি? করণীয়, এই অধিকারটিকে বুঝিয়ে দেওয়া।

সারদা মিত্র বললেন, আরেকটি বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন হচ্ছে, একজন যা অপছন্দ করে সেটাকেই আরেক জনের পছন্দসই বলে প্রমাণ করার চেষ্টা। বাস্তবকে বুঝতে পারা এবং ব্যাখ্যা করাটাই প্রয়োজনীয়। একে সঠিক প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন পড়ে না। মিত্র বললেন, যারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবকে বিচার করতে বসে, তাদের জিজ্ঞেস করতে হবে, আপনাদের বিচারের দৃষ্টিভঙ্গী কি, কোন্ শ্রেণীর অবস্থান নিয়ে? আপনাদের রায় থেকে কারা উপকৃত হবে?

আইভান ক্রলোভ বললেন, একটা আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ঘটনাকে তার

বিশুদ্ধ রূপের মধ্যে রেখে বিশ্লেষণ করলে সেটা অবশ্য বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশের এবং কিছু সংখ্যক ধারণার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যে বাস্তব প্রক্রিয়াগুলোর, বাস্তব উপকরণগুলোর এবং সংগঠনের মাধ্যমে বিপ্লব গণতন্ত্রের সঙ্গে বিশেষ করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে একত্রিত হয়, সেগুলোর সঙ্গে যেন এই বিশ্লেষণ সংঘাত না বাধায় সেটা দেখতে হবে। এই ধরনের প্রক্রিয়াগুলো সমাজতান্ত্রিক দেশ-সমূহে ঐতিহাসিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রত্যেকের কাছেই এটা পরিষ্কার যে, আমরা যে ফল এপর্যন্ত পেয়েছি সেগুলো স্পন্দমান জীবনের সঙ্গে তত্ত্বের আন্তঃক্রিয়া থেকে সঞ্জাত। উল্টো চলার অথবা আমাদের বিপ্লবের প্রক্রিয়াতে কারুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খসে পড়ে যাওয়া কোন কিছুকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা একেবারেই নিরর্থক। যে বাস্তব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ঘটে গিয়েছে, তার ওপর দাঁড়িয়ে নীতিবাক্য আওড়ানোর কোন অর্থ নেই। এ কথাটাকে বুঝতে হবে এবং আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে একে একটা উপকরণ করে নিতে হবে।

ফ্রলোভ জোরের সঙ্গে বললেন, আমরা আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিকাশের একটা নতুন পর্যায় হিসেবে কমিউনিস্ট সমাজ তৈরী করছি। এই লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করে এবং এর দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে আমরা আমাদের বিকাশের সমস্ত পর্যায়ের প্রতি আত্মসমালোচনামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করছি। এই সমস্ত পর্যায়ের মধ্যে গণতন্ত্রের বিকাশও বর্তমান। একই সঙ্গে, একথাটা এখানে জোরের সঙ্গে বলা দরকার যে, আপাতত, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের চেয়ে পূর্ণতর গণতন্ত্র আর নেই।

বিপ্লব এবং গণতন্ত্রের দ্বান্দ্বিক আন্তঃসম্পর্কের বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে একথাটার ওপর বেশি করে গুরুত্ব আরোপ করা দরকার যে, বিপ্লব একটামাত্র গোলা ছোঁড়ার ব্যাপার নয়। এ-দেশে অথবা ও-দেশে অথবা একসঙ্গে কয়েকটি দেশে বিকাশের সমগ্র ঐতিহাসিক যুগ জুড়ে চলেছে এই বিপ্লবের প্রক্রিয়া। এ কারণেই এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কোন একটা অংশের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত টানলে, সেগুলো সবসময়ে দৃঢ় যুক্তির ওপর দাঁড়ায় না। অবশ্য বাঁধানো পথ দিয়ে কেউ কাউকে চলতে বাধ্য করে না। কে কোনটা বেছে নিল তার ওপর স্বাভাবিকভাবেই সবকিছু নির্ভর করে। তবে গণতন্ত্রের সঙ্গে আন্তঃ সম্পর্কিত বিপ্লবের পথ সম্বন্ধে বিচারকে ব্যাপক বাস্তবের প্রেক্ষিতের ওপর দাঁড়াতে হবে। সঠিকভাবেই বলা যায়, এই ব্যাপক বাস্তবের অস্তিত্ব হচ্ছে জীবন।

ফ্রলোভ বললেন, আমার কথা হলো এই যে, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া কখনও কোন এক-হারা সম্পর্ক দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না এবং এধরনের সম্পর্ক পরিণতিও লাভ করে না। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হচ্ছে বহু বৈচিত্র্য সম্পন্ন প্রক্রিয়া। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিপ্লব ও গণতন্ত্রের সমস্যাকে দেখে আমাদের বিশ্লেষণে শুধুমাত্র একটি ঘটনাকে পরীক্ষা না করে বিভিন্ন ধরনের ব্যতিক্রমী ঘটনাকে খতিয়ে দেখতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বুর্জোয়ারা যখন দেখে যে বিপ্লব আসন্ন, তখন তারা সমস্ত গণতন্ত্রকে বিসর্জন দেবার চেষ্টা করে। এটা হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের ঘটনা। আরেক ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে আরেক-ভাবে উল্টো দিক থেকে। গণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য ঘটানোর চেষ্টা হয় সেটাও এক ধরনের ঘটনা। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে বিপ্লবকে সরিয়ে রেখে গণতন্ত্রকে (বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অর্থে) সার্বভৌম করার চেষ্টা। সোস্যাল ডেমোক্রাটরা এখন শুধু এর কথাই বলছে।

সর্বশেষে ফ্রলোভ বললেন, এখানে আলোচনাতে যে অবস্থান সামনে এসেছে সেটা হলো বিপ্লব ও গণতন্ত্রের ঐক্য, এবং একাত্মতা।

ফ্রলোভ এর পরে সমসাময়িক কার্যপ্রণালীতে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিপ্লব নামে অভিহিত জটিল প্রক্রিয়ার ক্রমবর্ধমান ভূমিকার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এই জটিল প্রক্রিয়া দ্বারা এখন সামাজিক বিপ্লবকে সমাজের প্রগতির সঙ্গে বুনে দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত প্রক্রিয়াকে বিবেচনার মধ্যে না রাখলে আজকাল গণতন্ত্রের পরিস্থিতিতে বিপ্লবের বিকাশের রাজ-নৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ দুরূহ ব্যাপার।

বহু ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিপ্লবের প্রভাবের আওতায় শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে মৌল পরিবর্তন ঘটছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার উপাদানের গুরুত্ব বৃদ্ধির দিকে চলেছে এবং বিপ্লব ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের ধারণায় এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হচ্ছে। ফ্রলোভ বললেন যে, তাঁর মতে, "ক্ষমতা অধিগ্রহণের ধারণাও কোন কোন দিক দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।" তিনি বললেন, পরিচালনের কাজটা বর্ধিতহারে বিজ্ঞান ও বৃত্তিতে রূপান্তরিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ব্যাপারে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণকে বাস্তবায়িত করার সমস্যা এখন আমাদের সামনে। গণতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হওয়া কার্যপ্রণালীর সঙ্গে এর সম্পর্ক কি রকমের হবে? এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য কি? আমরা

জানি যে, শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক কাজ এবং সামাজিক গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিত প্রসারিত হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর এই ভূমিকার সঙ্গে সাধারণভাবে প্রচলিত সম্পত্তিগত সম্পর্কের কিধরনের যোগাযোগ রয়েছে? এবং ক্ষমতা সংক্রান্ত সম্পর্কের সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের মালিকানার সম্পর্কের যোগাযোগই বা কি ধরনের? এই জ্ঞানবিজ্ঞান নতুন ধরনের ঘটনা এবং বহু ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্জয় ধরনের বস্তুগত শক্তি? এই প্রশ্নটির ব্যাপারে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। যে সমাজ আজ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিপ্লবের চাপে পরিবর্তিত হচ্ছে, তাতে বিপ্লব ও গণতন্ত্র-সংক্রান্ত সাধারণ জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যাবে উপরোক্ত প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর থেকে।

যে সব দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এখনও একটি সম্ভাবনামাত্র, সেখানেও বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিপ্লব ইতিমধ্যেই বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলেও বহুসংখ্যক নতুন নতুন অভিনব সমস্যা সমাজবিপ্লবকে ঘিরে ধরছে। এই সমস্যাগুলো এখন মৌল ভূমিকা পালন করবে, কারণ সর্বোপরি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা বিপ্লবকে একটা বাস্তবতা দিয়েছে। এরা সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রভাব রাখছে। এর ফলে একটা মোহেরও সৃষ্টি হচ্ছে।

নতুন নতুন সমস্যাগুলো উদ্ভাবনের সৃষ্টি নয়। ফ্রলোভ বললেন, তবু আমরা, বোধ হয়, পুঁজিবাদী সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের বিভিন্ন ধারার বিশ্লেষণে এই নতুন নতুন সমস্যাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই না। আমরা এদের অবমূল্যায়িত করে থাকি। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিপ্লবের, বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের আওতায় সমাজতন্ত্রের রূপ কি হবে, সে সম্বন্ধে এপর্যন্ত আমরা সামান্যই ব্যাখ্যা দিয়েছি। মার্কসবাদ এই সমস্ত সমস্যার জন্যে উন্মুক্ত। বহু ক্ষেত্রেই ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের অগ্রাধিকার মার্কস-বাদের পক্ষে রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতির সামাজিক ও মানবিক লক্ষ্য

অধ্যাপক গুন্টার ক্রোবার, ডি. পি. এইচ
তত্ত্ব, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সংগঠন প্রতিষ্ঠান, জি ডি আর
বিজ্ঞান আকাদেমির ডিরেক্টর

প্রঃ আপনি কিভাবে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতির সামাজিক ও মানবিক রূপ পরিমাপ করবেন? কয়েকটি ক্ষেত্রে এর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া আছে যেগুলি মানবজাতির পক্ষে অবাঞ্ছিত বা এমন কি বিপজ্জনক?

উঃ মানুষ, তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং তার বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক দুনিয়ার ওপর বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতির বহুমুখী প্রভাব রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু কাম্য বিষয় রয়েছে যেমন শ্রমের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ক্ষমতা এবং তার ফলশ্রুতিস্বরূপ ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমৃদ্ধি, আবার এর মধ্যে এমন সব অবাঞ্ছিত বিষয় রয়েছে যা সমাজপ্রগতি ও মানব সমাজের অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলেছে। আমি জোর দিতে চাই যে আলোচ্য প্রশ্নটি বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতির ফলাফলের চেয়েও বেশি কিছু। এ ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলোর উদ্ভব হয় সেগুলো পুরো মাত্রায় বিজ্ঞান ও প্রকৌশলগত উন্নতি ও এই উন্নতির পূর্ব শর্ত হিসেব পাওনা।

এ সমস্যাগুলো উন্নত পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে প্রধানত একই রকম। কয়েকটি সমস্যার মধ্যে পড়ে জ্বালানি, প্রাথমিক মাল-মশলা ও আবহাওয়া। কখনও কখনও তাই যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে সমস্যাগুলো একই রকম বলে সমাজব্যবস্থার প্রকৃতির ওপর তারা নির্ভরশীল নয়। কিন্তু একমাত্র সাদৃশ্য থেকেই এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

বিজ্ঞান ও তার সাফল্যগুলো কাজে লাগাবার ব্যাপারে পুঁজিবাদের বিকাশ কয়েক শতাব্দী ধরে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, মাত্র কয়েক দশকের সমাজতান্ত্রিক বিকাশ এর বদলে পুরোপুরি নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করে উঠতে পারে নি, বিশেষ করে সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল। ১৯৭০-এর দশকের আগ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিপ্লবের সাফল্যগুলোর সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক অর্থ-

নৈতিক ব্যবস্থার সুবিধাগুলো যুক্ত করার বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক কাজ ঠিক করা হয় নি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সমাজতন্ত্রের চাহিদা মেটাবার জন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে উৎপাদনকে যুক্ত করার ঐতিহাসিক সমস্যা সমাধানের কাজে হাত দিয়েছে।

বুর্জোয়া তত্ত্ব হচ্ছে 'বৈজ্ঞানিক সভ্যতা' সামাজিক দিক থেকে নিরপেক্ষ। আজকের অধিকাংশ বিজ্ঞান, বিশেষ করে প্রকৃতি বিজ্ঞান, যে একটি বৈর শ্রেণী সমাজে রূপ নেয় সেটাকেই অস্বীকার করা এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য। তথাকথিত সমাজব্যবস্থা নিরপেক্ষ বিজ্ঞানের সমস্যাবলীর কথা বলতে গিয়ে প্রায়শই বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত অগ্রগতির "জীব পরিবেশগত অসঙ্গতি"র (অর্থাৎ পরিবেশের ওপর এর নেতিবাচক ক্রিয়া)-এর নজির তোলা হয়। এটা কিন্তু নিছক এই প্রগতির ফল নয়। বস্তুত প্রকৃতিকে জানার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতার মতোই বিশ্বের পরিবেশগত পরিস্থিতি উন্নত করার উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতাও অশেষ। অবশ্য কেবল অনুকূল সামাজিক অবস্থাতেই বিজ্ঞান অসীম সামাজিক প্রগতি লালন করার ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক লক্ষ্যে প্রতিসৃত সামাজিক সম্পর্ক বিজ্ঞানের ক্ষমতা বাস্তবায়িত করার পথে অন্তরায় হয় বা এতে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন এ সব ক্ষমতা তখনই বিঘ্নিত হয় যখন, জ্ঞান লাভের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় না করে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয় করা হয়। আরেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে একচেটিয়ারা কোনো না কোনো ক্ষেত্রে গবেষণা সংকুচিত বা বন্ধ করে দিয়ে বিজ্ঞানের ক্ষমতাকে অবরুদ্ধ করে।

যারা বর্তমান অর্থনৈতিক কার্যকলাপের লক্ষ্য ও পদ্ধতিগুলো স্থির করেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তাদের দীর্ঘ মেয়াদী ও বিশ্বের চাহিদাগুলোর কথা মাথায় রাখতে বাধ্য করে। সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক পর্বে যেটি প্রায়শই সবার আগে প্রাধান্য লাভ করে তা হচ্ছে তীব্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী কালবিলম্ব না করে সমাধানের প্রয়োজনীয়তা, বিশেষকরে যেখানে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তিক্ত শ্রেণী সংগ্রাম চলছে। ফলে জীব-পরিবেশে ভারসাম্য সুনিশ্চিত করার মতো ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের একটি বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা এই যে সমাজতন্ত্রের আওতায় অর্থনৈতিক বৃদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করে এবং সমাজের স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থগুলোর মধ্যেকার পার্থক্য কমিয়ে আনে। অপ্রতুল জ্ঞানের অসুবিধাদির কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, সমাজ-

তান্ত্রিক দেশগুলোতে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতির জীব-পরিবেশগত অসঙ্গতি অর্থনৈতিক বিকাশের ফল নয়, অপ্রতুল অর্থনৈতিক বিকাশের ফল। অর্থনীতি এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে এই বৈষম্য দূর হয়ে যায়।

প্রঃ যে যে অবস্থায় বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতি মানবকল্যাণে ব্যবহার করা যায়, সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবেন কি?

উঃ বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতির নিয়ন্ত্রণ মূলত নির্ভর করে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সিদ্ধ করার ও গোটা সমাজের অগ্রগতির চাহিদা মেটাবার সার্বিক সামাজিক নীতির অংশ হিসেবে এটি অনুসৃত হবে কি না তার ওপর। অর্থাৎ আমি যা বোঝাতে চাই তা নিচে বলছি:

প্রথমত, বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতি সর্বদাই সমাজের মোট উৎপাদনী শক্তিগুলোর অগ্রগতির অংশ। অতএব এ উৎসারিত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই সমস্ত মোট উৎপাদনী শক্তির বিকাশ নিয়ন্ত্রণকারী বাস্তব নীতিগুলো অনুধাবন করা ও স্বীকৃত নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো চালিত করা। পক্ষান্তরে এ জন্য চাই সাধারণ স্বার্থ, বুনিয়াদী উৎপাদন উপকরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিক সম্পত্তির ভিত্তিতে সমবেত সামাজিক ইচ্ছা। এই শর্ত থাকলেই ইতিহাসের প্রক্রিয়া, সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অতএব কেবল ব্যক্তিগত বিজ্ঞান প্রয়াসই নয়, সামাজিক পূর্বশর্ত ও ফলাফল সহ গোটা বিজ্ঞানকেই নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা খুলে গিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতি নিয়ন্ত্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল বিজ্ঞানের উন্নতির নিয়মগুলোকে বুঝতে হবে। সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভয় দেশগুলো এদিকে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে মাত্র। কিছু দিন আগেও বিজ্ঞানের উন্নতি একটানা গবেষণার বিষয় হয় নি এবং এ ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান এখনও অপ্রতুল। কাজের পরিমাপের ব্যাপকতা এর থেকে বোঝা যায়। বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতি আজও প্রধানত পরিকল্পিত হয় সংখ্যাগত হিসেব ও আপেক্ষিকভাবে স্বল্পস্থায়ী পূর্বাভাসের ওপর ভর করে। আমার মনে হয়, জনগণের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসমূহ ও সমাজের অগ্রগতির স্বার্থসমূহ কেন্দ্রিক মূল্যবোধ ব্যবস্থার সঙ্গে তাল রেখে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতির বিকল্প নীতি বের করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র অধিকতর প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে।

শেষত বিজ্ঞান প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে মানবিক নীতিগুলো পরিচালিত হবে।

সামাজিক প্রগতির বিরুদ্ধে না ফিরে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত অগ্রগতিকে যদি আরো এগিয়ে নিতে হয় তাহলে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে কেবলমাত্র খাঁটি যুক্তিগ্রাহ্য মাপকাঠিতে ফেললেই চলবে না, পুঁজিবাদী মুনাফার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। অবশ্য অর্থনৈতিক যুক্তিগ্রাহ্যতা বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতির একটি শর্ত হতে পারে, কিন্তু এটি মানবিক লক্ষ্যসমূহের উদ্দিষ্ট হতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, জনগণের বৈষয়িক ও সংস্কৃতির মান উন্নীত করে তাদের জীবনযাত্রা উন্নত করা এই লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে। এই পারস্পরিক সংযোগ যেটি একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে, তা সমাজতান্ত্রিক সমাজে লক্ষণীয়। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক যুক্তিগ্রাহ্যতা (যা বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতির শর্ত ধর্তব্যে রাখে) মানবিক নীতিভিত্তিক সামাজিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। একারণেই বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতিকে থামিয়ে দেওয়ার মাঝে মাঝে যে দাবি ওঠে, তা সামাজিক প্রগতি ও মানবতা-বিরোধী।

আমরা দেখছি, আলোচ্য সমস্যা বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতি বন্ধ করে সমাধান করা যাবে না, কারণ তা একান্তই অবাস্তব। বরং সমাজের সামাজিক চাহিদাগুলো পূরণের লক্ষ্যে চালিত করে এ সমস্যার সমাধান করা যায়। সম্পদ সর্বদাই সীমাবদ্ধ। তাই বিজ্ঞান ও প্রকৌশলগত বিকাশের সম্ভাব্য ধারাগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকারের প্রয়োজন আছে। মূল ক্ষেত্রগুলোতে জনগণের অবস্থা উন্নত করতে পারে এমন গবেষণায় অগ্রাধিকার দিতে হবে। অর্থাৎ সবার আগে নজর দিতে হবে কাজের অবস্থা ও শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা (জ্বালানি, প্রাথমিক সরঞ্জাম, নতুন নতুন সরঞ্জাম, অটোমেশান ও অন্যান্য সমস্যা সহ)-র ওপর এবং তারপর জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা-গুলো, চিকিৎসা ও পরিবেশ সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন আছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বহু সমস্যারই সমাধান করা যায়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান জোরদার করতে হলে এবং রাজনৈতিক দাঁতাত সামরিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে হলে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতির ক্ষমতাকে নিঃসন্দেহে ব্যবহার করতে হবে। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুসারে, ১৯৪৫ সাল থেকে বিশ্বের গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়-বরাদ্দের ৪০ শতাংশ সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালেই এই ব্যয় সাড়ে ৩ লক্ষ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

বিশেষ করে ধ্বংসাত্মক কাজে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত সাফল্য ব্যবহারের

বিপজ্জনক সম্ভাবনায় বাধা দেবে নিরস্ত্রীকরণ। এর ফলে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান হবে যা বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতির অগ্রাধিকারমূলক ধারা বেছে নেওয়ার সুবিধা হবে। সহায়সম্পদের অভাবে এ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা সেই ধারায় বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে চাই যা ধ্বংসাত্মক শক্তি হিসেবে বিজ্ঞানকে মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে না, বরং একে ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ষ উৎপাদনী শক্তিতে পরিণত করবে। এর ফলে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতির ক্ষমতা যথেষ্ট বর্ধিত করার নতুন নতুন সুযোগ খুলে দেবে।

সামাজিক বৈর দ্বন্দ্বসমূহ গভীরতর হচ্ছে

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে শ্রেণীসংগ্রামের কয়েকটি প্রবণতা

তিমুর তিমোফিয়েভ
ইউ এস এস আর বিজ্ঞান আকাদেমির
আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টার ;
ইউ এস এস আর আকাদেমি অব সায়েন্সে-র পত্র সদস্য

শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের নতুন জোয়ার, শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং জনগণের গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি প্রভৃতি আজকের দিনের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের আমলে সমাজজীবনের একটি বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন দেশে এই প্রক্রিয়াগুলোর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং তাদের তীব্রতার বেগও সব দেশে সমানভাবে বৃদ্ধি পায় না কিন্তু এই প্রক্রিয়ার সূচনা ও সূত্র স্থল একটি এবং তা হলো পুঁজিবাদের সামাজিক দ্বন্দ্ব। বর্তমানে পুঁজিবাদী বিশ্বে সামাজিক উত্তেজনার ক্রমবর্ধমান জোয়ারের কথা শুধু মার্কস-বাদী পণ্ডিতগণই উল্লেখ করে থাকেন না ; এই সামাজিক উত্তেজনার কথা পশ্চিমী বিশ্লেষকগণও তাঁদের নিজের মতো করেই স্বীকার করেন যদিও তাঁরা বৈজ্ঞানিক 'কমিউনিজম'-এর ধারে কাছে অবস্থান করেন না।*

অবশ্য এই তথ্যের স্বীকৃতি দিয়েও বুর্জোয়া ও সংস্কারবাদী মুখপাত্ররা সাধারণত এই অবস্থাকে পুঁজিবাদের মৌলিক বিরোধ থেকে সম্পর্কহীন একটি ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের মতে এর কারণ হলো ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন-মুখী পরিস্থিতি। আবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্পষ্টভাবেই অবগত আছেন যে এই ব্যাখ্যা ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে অমিল রয়েছে এবং এ সম্পর্কে সাধারণ সংজ্ঞা-অন্তর্ভুক্ত কোনো মূল্যায়ন করা থেকে তাঁরা বিরত থাকা শ্রেয়

* উদাহরণ হিসাবে বলা যায় : ১৯৬৮ সাল থেকে পশ্চিম ইউরোপে শ্রেণী সংঘাতের পুনরুত্থান, খণ্ড ১ ন্যাশনাল স্টাডিজ ; খণ্ড ২ তুলনামূলক ব্যাখ্যা, ম্যাকমিল্যান প্রেস লিঃ ১৯৭৮, সম্পাদনা করেছেন কলিন ক্রাউস এবং এ্যালেসানড্রো পিজ্জরনো।

মনে করেন—দৃষ্টান্ত হিসাবে-বলা যায় যে, তাঁরা এটা দৃঢ়ভাবে দাবি করেন যে বর্তমান ধর্মঘট সংগ্রামের ঊর্ধ্বগতির কোনো বিশ্বাসযোগ্য কারণ দেওয়া যেতে পারে না এবং তাঁরা মনে করেন যে এই সংগ্রাম সম্পর্কে বহু ব্যাপক তথ্য ও উপাদানের সমষ্টির সঙ্গে সঙ্গে "এগুলোর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সংকট"-ও* বর্তমান।

এই বিভ্রান্তি বুঝতে পারাটা কঠিন কিছু নয়: শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে বর্তমান ধর্মঘট আন্দোলন শ্রেণী সংগ্রামের ঐতিহ্যগত কৈফিয়তমূলক ব্যাখ্যার সঙ্গে খাপ খায় না। বর্তমানে এই ধর্মঘট আন্দোলন পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের তীব্রতার সঙ্গে যুক্ত এক নতুন, দীর্ঘস্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী উপাদানের ব্যাপক বীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ধারায় প্রভাবিত হয়।

যখন কেউ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন তখন তিনি বিশ্বাস করার এক দৃঢ় ভিত্তি খুঁজে পান যে পুনরুৎপাদন অবস্থার অবনতি, মুদ্রা ও আর্থিক বিশৃংখলা এবং সামাজিক আলোড়ন প্রভৃতির ফলে ১৯৭০-এর মধ্যভাগের অর্থনৈতিক সংকট এক দীর্ঘস্থায়ী সংকটের সূচনা করে। পুঁজিবাদের কতকগুলো গভীর সংঘাত চক্রাকারে আবর্তনশীল কাঠামোর বাইরেও প্রসারিত হয়েছে এবং এর ফলে কাঠামোগত সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি হয়েছে এবং তা সৃষ্টি করেছে পুঁজিবাদী বিশ্ব-অর্থনীতিতে এক বিরামহীন উত্তেজনা। এই পরিস্থিতির মধ্যে চিহ্নিত হয়েছে আরও অনেক জড়িয়ে পড়া সংকটের প্রক্রিয়া: আবর্তনশীল, মুদ্রা, অর্থ, বিদ্যুৎ ও তেল, খনিজ বা আকরিক ও অন্যান্য মৌলিক পদার্থ। নয়া-উপনিবেশবাদের ক্রমবর্ধমান সংকটের ফলে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শোষণের মাধ্যমে সংকটের এই প্রক্রিয়াগুলোকে সহজতর করার সম্ভাবনা কিছু পরিমাণে সীমিত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণবিধি সংকটের এই প্রক্রিয়াগুলোকে সংযত করতে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এর সমস্ত যন্ত্রে গুরুতর বিশৃংখলা উপস্থিত

---

* এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে ইউ এস এস আর বিজ্ঞান একাডেমির আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান এবং ফ্রাঙ্কফুর্টে ইনস্টিটিউট অব মার্ক্সিস্ট স্টাডিজ-এর যুক্ত প্রকাশনীতে: পশ্চিম ইউরোপ: প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রাম, মস্কো, প্রগ্রেস পাবলিশার্স, ১৯৭৮।

হয়েছে। অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবে এটা প্রতিভাত হয় মুদ্রা-অর্থ ও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। গণবেকারির সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির একীভবন প্রাণচঞ্চল ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সংকট-পরবর্তী অধ্যায়ের পক্ষে একটি অস্বাভাবিক রূপ এবং এই একীভবন ক্রমে দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। একমাত্র ১৯৭৮ সালেই উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ভোগ্যপণ্যের দাম ৮ শতাংশ বৃদ্ধি হয় এবং বেকারির সংখ্যা বাড়ে ৫ শতাংশ। ক্রমবর্ধমান বেকারি ও মুদ্রাস্ফীতির ফলে শ্রমজীবী মানুষের অবস্থার অবনতি আরও ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে, যখন রাষ্ট্র "সংকট বিরোধী" ব্যবস্থা হিসাবে শ্রমজীবী জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আয়কর বৃদ্ধি করে, মজুরি ও বেতন কাটে, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে ট্যাক্স ও অন্যান্য সুবিধা-দানের ব্যবস্থা করে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যয়ভার হ্রাস করা হয়। উপরন্তু, অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও তার ফলাফল জনগণের অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

চক্রাকারে আবর্তনশীল সংকটের পরবর্তী অধ্যায়ে গণবেকারি একটি স্থায়ী ঘটনায় পরিণত হওয়ার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশ-গুলোতেই দেখা দেয়। উপরন্তু, এর কতকগুলো দেশে বেকারি বিপুলভাবে বৃদ্ধি হয়েছে এবং তা নিম্নলিখিত সারণীতে দেখানো হয়েছে:

অগ্রগামী পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে*
বেকারির গতি-প্রকৃতি
('০০০)

	১৯৭০	১৯৭৪	১৯৭৫	১৯৭৬	১৯৭৭	১৯৭৮	১৯৭৯ ফেব্রুয়ারি
ব্রিটেন	৬৪০	৬১৫	৯৭৮	১,৩৫৯	১,৪৮৪	১ ৪৭৫	১,৪৫২
ইতালি	৬০৯	৫৬০	৬৫৪	৭৩২	১,০৪৫	১,৫৭১	১,৬৩২
ফ্রান্স	২৬২	৪৯৮	৮৪০	৯৩৪	১,০৭২	১,১৬৩	১,৩৪২
এফ আর জি	১৪৯	৫৮২	১ ০৭৪	১,০৬০	১,০৩০	৯৯৩	১,১৩৪

১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে ই ই সি রাষ্ট্রগুলোর তালিকাভুক্ত বেকারির মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৬'৫ মিলিয়ন, আমেরিকাতে এই সংখ্যা হল ৬ মিলিয়ন

* সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, এপ্রিল, ১৯৭৯-র পরিসংখ্যানের মাসিক বুলেটিন।

এবং জাপানে ১২৪০,০০০। পূর্ণ বেকারির সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আংশিক বেকারির সংখ্যাবৃদ্ধির প্রবণতাও দেখা দেয়। বারোয়ারি বাজারভুক্ত রাষ্ট্রগুলোতে আংশিক কর্মরত কর্মীদের সংখ্যা মোট কর্মরত কর্মীদের থেকে ৪ শতাংশ (আয়ার্ল্যাণ্ড) থেকে ১৭ শতাংশ (ডেনমার্ক) ওঠানামা করে। আমেরিকায় এই ওঠানামার সংখ্যা মোট শ্রমশক্তির ২০ শতাংশ। এই স্তরের শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা স্থিতিশীল নয় ও তাদের কর্ম সংস্থানের গ্যারান্টি নিতান্তই ক্ষীণতর, তাদের মজুরিও অপেক্ষাকৃত কম, 'এবং স্থায়ী কর্মরত শ্রমিকদের চেয়ে তাদের সামাজিক তহবিলের উপর নির্ভর করার সম্ভাবনাও অনেক কম।

কর্ম-সংস্থানের ধরনের মধ্যে আগের চেয়ে অধিকতর সুস্পষ্ট একটি দিক রয়েছে—এই ধরনটি হচ্ছে দক্ষ শিল্প শ্রমিকদের সঙ্গে রয়েছে কায়িক শ্রম-বিহীন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, তাদের কারও কারও রয়েছে সর্বোচ্চ যোগ্যতা (ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, পরিচালকের কাজ সহ অফিস কর্মী প্রভৃতি)। যান চলাচল শিল্পে শ্রমিকদের চাহিদা কমে যাচ্ছে।

কর্ম-সংস্থানের সমস্যাটির তীব্রতা বহুলাংশে একচেটিয়া পুঁজির কার্যকলাপ ও অপপ্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত—এই একচেটিয়া পুঁজি শ্রমজীবী মানুষের শোষণ বৃদ্ধি এবং র‍্যাশনালাইজেশনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যগুলো ব্যবহার করার প্রয়াস চালায়। এফ আর জি-তে কর্ম-সংস্থানের সমস্যা সম্পর্কে গবেষকদের অভিমত সংক্ষেপিত করে পশ্চিম জার্মানির সাপ্তাহিক ডার স্পাইজেল-এ বলা হয়েছে যে জাতি এক বিপর্যয়ের মুখে। এই মূল্যায়ন হল, বিশেষ করে, শ্রমজীবী জনগণের এক বিরাট অংশের যুক্তিসঙ্গত আশংকার ফলশ্রুতি (বিশেষ করে ইস্পাত শ্রমিক ও মুদ্রণ শিল্প শ্রমিক)। এই আশংকা হল: "অতি ক্ষুদ্রাকার সম্পন্ন ইলেকট্রনিক কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি শিল্পে ও বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সূচনা করছে। সরকার অথবা ট্রেড ইউনিয়নগুলোও বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের এই ফলাফলগুলো কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তা জানে না।"* সুতরাং সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। এই সমস্যা সমাধানের প্রতিটি পথই বর্তমান রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে প্রসারিত। অথচ সোশ্যালিজমের আমলে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্য-

* ডার স্পাইজেল, এপ্রিল, ১৭, ১৯৭৮, পৃঃ ৮০।

গুলোকে জনগণ সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ হিসাবে বিবেচনা করে, অপরপক্ষে, পুঁজিবাদের আমলে এই সাফল্যগুলো নতুন নতুন চরম সামাজিক দুর্দশার সূচনা করে।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং জনসংখ্যার বিপুল অংশের সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্বের তীব্রতা কমানোর জন্য রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বিধি সামাজিক কলাকৌশল অবলম্বনের চিরাচরিত ধরন এবং সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যের ভিত্তিতে শ্রম সম্পর্ক সংগঠিত করার পদ্ধতি, উভয়ই শুধু-মাত্র পুরানো সামাজিক সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি করছে এবং নতুন সামাজিক সংঘাতের জন্ম দিচ্ছে।

শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে শ্রেণীসংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ে ধর্মঘট আন্দোলনের প্রসার এক অন্যতম দিক-নির্দেশক চিহ্ন। অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে এবং তার পরবর্তী বছরগুলোতে বেতন কাটা, পূর্বে অর্জিত কর্ম-সংস্থানের গ্যারান্টি বিলোপ এবং ধর্মঘট করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে পরিচালিত হয় এবং বহু ক্ষেত্রে এই আন্দোলন সরকার ও একচেটিয়াদের কাছ থেকে কনসেশন আদায়ে বাধ্য করতে সক্ষম হয়।

পূর্বে কতকগুলো, চক্রাকারে আবর্তনশীল সংকটের মধ্যে যে-ভাবে ঘটনার বিকাশ ঘটে তার চেয়ে পৃথকভাবে বিকাশমান এই ধর্মঘট আন্দোলনের কোনো কোনো দেশে ওঠানামা ও এমন কি হ্রাস সত্ত্বেও ১৯৭০-এর মধ্যভাগের সংকট-জনক পরিস্থিতিতে এই ধর্মঘট আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে বাড়তে থাকে। নিম্ন-লিখিত তথ্যগুলোতে দেখানো হয়েছে যে ১৯৭০-১৯৭৫ সালে অগ্রগামী পুঁজি-বাদী দেশগুলোতে ধর্মঘটকারীদের সংখ্যা ১২.৫ মিলিয়ন থেকে ৩৩.৫ মিলিয়নে বৃদ্ধি পায়। ক্রমবর্ধমান বেকারি, শ্রমজীবী জনগণের জীবনধারণের মানের অবনতি এবং পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা শ্রমজীবী মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য একচেটিয়াদের অপচেষ্টা প্রভৃতির ফলেই প্রধানত ধর্মঘট সংগ্রাম আজ পর্যন্তও তার উচ্চমান অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে* ধর্মঘট আন্দোলন

('000)

	১৯৭০	১৯৭৫	১৯৭৬	১৯৭৭	১৯৭৮**
ইউ এস এ					
ধর্মঘটকারী	৩,৩০৫	১,৭৪৬	১,৪২০	২,৩০০	১,৭০০
ধর্মঘটের দিন	৬৬,৪১৪	৩১,২৩৭	৩৭,৮৫৯	৩৬,০০০	৩৮,৮০০
কানাডা					
ধর্মঘটকারী	২৬২	৪৮২	১ ৫৮২	৩০০	১,০০০
ধর্মঘটের দিন	৬,৫৪০	১১,৪৮০	১০,৫২৪	৩,৪২০	৯,০০০
ব্রিটেন					
ধর্মঘটকারী	১,৭৯৩	৭৮৯	৬৬৬	১,১৫৫	৯৩৯
ধর্মঘটের দিন	১০,৯৮০	৬,০১২	৩,২৮৪	১০,১৪২	৯,৩০৬
ফ্রান্স					
ধর্মঘটকারী	১,০৮০	১,৮২৭	২,২২৩	৫৭৫	৬০০
ধর্মঘটের দিন	১,৭৪২	৩,৮৭০	৩,৭২৭	২,১১৩	২,২০০
এফ আর জি					
ধর্মঘটকারী	১৮৪	৩৬	১৬৯	৩৪	৪৮৮
ধর্মঘটের দিন	৯৩	৬৯	৫৩৪	২৪	৪,২৯০
ইতালি					
ধর্মঘটকারী	৩,৭২২	১৪ ১০৯	১১,৮৯৮	১৩,৮০৩	১৩,০০০
ধর্মঘটের দিন	১৯,৮৮৭	২৭,১৮৯	২৫,৩৭৯	১৬,৫৬৬	১৬,০০০
জাপান					
ধর্মঘটকারী	২,৩৫৭	৪,৬১৩	৩,৪০০	৪,০০০	৪,৫০০
ধর্মঘটের দিন	৩,৯১৫	৮,০১৫	৩,২৫৩	৫,০০০	৫,৫০০

* জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান থেকে নেওয়া আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত হিসাব। এই সারণীতে রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলের কোনো পরিসংখ্যান দেওয়া হয় নি—দৃষ্টান্ত হিসাবে ইতালি, ফ্রান্স এবং জাপানে এই মিছিলগুলিতে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ অংশগ্রহণ করে।

** ব্রিটেন ছাড়া আর সমস্ত দেশগুলোর পরিসংখ্যান প্রারম্ভিক।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এমনকি পুঁজিবাদী দেশগুলোর "শান্তিপূর্ণ অঞ্চল"-ও ধর্মঘট আন্দোলনে প্রভাবিত হয়েছে। যে সমস্ত দেশ অনেক বছর ধরে "সামাজিক অংশিদারিত্বের" ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে আসছে (সুইডেন, এফ আর জি, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে) এবং যে দেশগুলোতে (স্পেন ও অন্যান্য দেশ) বহু বছর ধরে ফ্যাসিবাদী শাসন চলেছে সে সব দেশগুলোকেও ধর্মঘট সংগ্রাম কাঁপিয়ে তুলছে।

১৯৭০-এর ধর্মঘট সংগ্রামের বিশেষত্ব হল শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিশাল ব্যাপ্তি। সাধারণ ধর্মঘট সর্বজনীন রূপ নেয়। ইতালিতে শ্রমজীবী মানুষের যে-বলিষ্ঠ সংগ্রামে প্রায় সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী অংশ গ্রহণ করেন সেই সংগ্রাম ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ঘটায়। ফ্রান্সে বিশাল শ্রেণী সংগ্রামের গতিবেগ সৃষ্টি হচ্ছে। ব্রিটেনে ১৯৭৭ সালে ১৩টি প্রধান প্রধান ধর্মঘটে যে কাজের দিনগুলো বন্ধ ছিল তা মোট ধর্মঘটের কাজের দিনগুলোর ২৬ শতাংশেরও বেশি। ১৯৭৯ সালের প্রথমে ধর্মঘট সংগ্রামের তীব্রতা সূচিত হয়েছিল সমগ্র শিল্পের ধারাবাহিক বন্ধ-এর মাধ্যমে। এই বন্ধ-এর ফলে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সরকার তাৎপর্যপূর্ণ কনসেশন দিতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যান্য বারোয়ারি বাজারভুক্ত রাষ্ট্রগুলোতে ১৯৭৮-৭৯ সালে কতকগুলো সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে পশ্চিম জার্মানি (এফ আর জি)-র কথা বলা যায়—এখানে অতি সম্প্রতি ধর্মঘট আন্দোলন প্রধানত, স্থানীয় পর্যায়ে এগিয়ে চলেছিল। আমেরিকায় ১১০ দিনব্যাপী খনি শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বিরোধ শুরু হয়।

পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রেণী সংগ্রামের অপর যে একটি সুস্পষ্ট প্রবণতার উদ্ভব ঘটছে তা হল: একচেটিয়া-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক গঠনবিন্যাস আরও দ্রুত বিভিন্নরূপে প্রসারলাভ করছে। বহুলাংশে এই প্রবণতার উৎস হল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলাফলগুলো। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের এই ফলাফলগুলোর ধাক্কায় এই শ্রেণীর কর্মীদের এক বিরাট অংশ তাদের পূর্বেকার বৈষয়িক ও "মর্যাদাপূর্ণ" সুবিধাদি হারাচ্ছে, অপরদিকে শ্রমের শর্ত ও সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে তারা শ্রমিকশ্রেণীর কাছাকাছি আসছে। শিল্পে শোষণের যে-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তা হল শ্রমের পুঁজিবাদী র‍্যাশনালাইজেশন প্রক্রিয়া এবং তা প্রয়োগ করা হয় বৃত্তিমূলক শিল্পে এবং প্রশাসনিক ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিভাগে। পুঁজি-

বাদ যে চরম সামাজিক দুর্দশার জন্ম দিয়েছে তা আরও সুস্পষ্টভাবে অফিস কর্মচারীদের অবস্থার উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

এই সব ঘটনাবলীর ফলে শ্রমজীবী জনগণ আরও বেশি বেশি একচেটিয়া-বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করছেন। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে অফিস কর্মচারীদের ধর্মঘট সংগ্রামের বৃদ্ধি থেকেই এটা বোঝা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে প্যারিতে ১৯৭৮ সালের গ্রীষ্মকালে পৌর কর্মচারীদের অন্যতম বিরাট আন্দোলন কয়েক বছরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। ইতালিতে পর্যটন-এজেন্সি, সিনেমা কর্মচারী এবং সরকারি পরিবহন কর্মীদের ধর্মঘট সংগঠিত হয়। বেলজিয়ামে ধর্মঘট সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির-ক্ষেত্রের কর্মীরা, বেতার, টেলিভিশন কর্মচারীরা এবং এমনকি সংসদীয় দপ্তরের কর্মীরাও। ১৯৭৮ সালে স্পেন ও ব্রিটেনে অনেক ডাকঘর তাদের কাজ বার বার বন্ধ রাখে। পর্তুগালে ৩০০,০০০ অসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী দেশ-ব্যাপী এক বিশাল ধর্মঘট সংগঠিত করে।

শ্রমজীবী জনগণকে তাদের দাবি পূরণে যে-উপাদানগুলো সাহায্য করেছে তার অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান হল শ্রেণীসংগ্রামে উন্নত ধরনের রণকৌশল-গত পথ ও পদ্ধতি প্রয়োগ। একদিকে উন্নত পুঁজিবাদের বিভিন্ন শাখার ক্রম-বর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং অন্যদিকে শ্রমজীবী জনগণের পেশাগত ও বিভাগীয় অংশের আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপকতর সংযোগ শ্রমিক সংগঠন-গুলোর ধর্মঘট সংগ্রামে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্ভাবনা এনে দিচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: অর্থনীতির এক মোক্ষম ক্ষেত্রে একটি ধর্মঘট ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে জাতীয় পর্যায়ে পুঁজি ও সরকারের উপর চাপ বৃদ্ধির কাজে সাহায্য করে। ১৯৭৮ সালের শেষে এবং ১৯৭৯ সালের প্রথম দিকে এফ আর জি তে ইস্পাত নির্মাতাদের ধর্মঘট এবং ১৯৭৯ সালে* ব্রিটেনে পরিবহন শ্রমিকদের ধর্মঘট এই ভূমিকা পালন করে।

---

* ধর্মঘট সংগ্রাম বহুবিধ আকারে বেড়ে চলেছে: "দাবা খেলার ছক কাটা" অথবা "পরিবর্তনশীল" ধর্মঘট (একটি কারখানার বিশেষ বিশেষ বিভাগগুলোতে ধারাবাহিক স্বল্পকালীন বন্ধ—এই বন্ধ সমগ্র কারখানার উৎপাদন চক্রকেই অসংগঠিত করে ফেলে), "আকস্মিক" ধর্মঘট (পরিচালকদের আগাম নোটিশ না দিয়েই ধর্মঘট সংগঠিত করা) "উদ্দীপক" এবং "নিয়ম মাফিক কাজ"-এর ধর্মঘট; "বিপরীতমুখী ধর্মঘট" (যখন ধর্মঘটী শ্রমিকেরা কারখানা দখল করে ও উৎপাদন চালিয়ে যায়) ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সংস্কার ধর্মঘট

শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়াপুঁজির নিয়ন্ত্রণবিধির বিরুদ্ধে এবং তার বিপরীত শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার আরও বেশি বেশি কার্যকরভাবে নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য তার নিজস্ব প্রলেতারীয় পদ্ধতি উপস্থাপিত করছে। ১৯৭০ সালে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে যে-অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তাতে ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে এই আন্দোলন যখন এক বিশেষস্তরে পৌঁছায় তখন এই ধর্মঘট সংগ্রাম রাজনৈতিক শ্লোগানে উদ্বুদ্ধ জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্তভাবে শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও বৈধ অবস্থার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ফলাফল লাভের পথে নেতৃত্ব দেয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে শ্রেণীশক্তিগুলোর বিন্যাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের পথে পরিচালিত করে এবং পরিশেষে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন নতুন সম্ভাবনাগুলো যত বাস্তবে রূপায়িত করে তত এই আন্দোলন সংখ্যার দিক দিয়ে বৃদ্ধি পায়, আন্দোলন আরও সক্রিয় হয়ে উঠে, সংগ্রামের ধরন ও পদ্ধতিগুলি পুনরায় নতুন করে গ্রহণ করে, আরও বৃহত্তর দাবি উপস্থিত করে এবং শ্রমজীবী জনগণ তাদের সংগঠন ও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। একটি বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে এই বিষয়গুলোর মধ্যে মুখ্য বিষয় হল: দাবি উপস্থিত করার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। এই দাবি আদায়ের অর্থ হল রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদকে দুর্বল করা।

শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সমস্ত মোক্ষম এলাকাগুলোতেই এই প্রবণতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। বেকারির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামে এক নতুন মর্মবস্তু অর্জিত হচ্ছে। তারা যেখানে স্থিতিশীল এবং শাসকচক্র তাদের বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে না সেখানে এই সংগ্রামগুলো বর্শা ফলকের মতো প্রত্যক্ষভাবে শুধুমাত্র বেকারির সুনির্দিষ্ট প্রকাশের বিরুদ্ধেই প্রসারিত নয়, এই সংগ্রাম সামাজিক অর্থনৈতিক হাতিয়ারগুলির বিরুদ্ধেও

আন্দোলন সংক্রান্ত দপ্তর কর্তৃক এই প্রশ্নটি বিশ্লেষিক-সমীক্ষা সহ সংকলিত ও আলোচিত হয়েছে এবং তা রাবোচি ক্লাশ-ই সোভরে-মেনি মির-এ (নং ২, ১৯৭৮, পৃঃ ৫৯-৬৯) "১৯৭০ এর অগ্রগামী পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ধর্মঘট আন্দোলন : রণকৌশলগত ক্ষেত্রে পরিবর্তন" শীর্ষক প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রসারিত—যে হাতিয়ার বার বার বেকারির সংখ্যাবৃদ্ধি করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে এক দারুণ ইঙ্গিতপূর্ণ দিক হল বিভিন্ন অঞ্চল ও শাখায় বিনিয়োগের অর্থ বণ্টন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সক্রিয় প্রবেশ ও হস্তক্ষেপের জন্য সংগ্রাম অর্থাৎ এটা এমন একটি দিক যেখানে অতি সম্প্রতিও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রবেশাধিকার ছিল না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ইতালিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলো বিনিয়োগকারীদের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করে আসছে যাতে করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে, নতুন বিনিয়োগের পথ খুলতে বাধ্য হয়, কারণ এই অঞ্চলেই চরম বেকার সমস্যা বিদ্যমান।

বর্তমান সামাজিক সমস্যা সমাধানের সংগ্রামে নিশ্চিন্ত না থেকে ফ্রান্স, ইতালি, ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী মানুষ এমন কতকগুলি দিকে ব্যবস্থা গ্রহণের উপর জোর দিচ্ছে; যে দিকটি হল কারখানা দখল করা, বিশেষ করে যে-কারখানার মালিকেরা উৎপাদন বাড়ায় ও মজুত করে এবং শ্রমিকদের বরখাস্ত করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারখানা দখলে রাখার এ-পথ শুধুমাত্র বরখাস্ত এবং অসুবিধাজনক কাজের অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনই নয় এ-পথ হল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন পরিচালনার জন্য শ্রমিকদের সংগ্রামের অভিব্যক্তি।* বিভিন্ন কারখানা ও সমগ্র শিল্প জাতীয়করণের জন্য বার বার যে-দাবি উত্থাপিত হয় সেই দাবির সঙ্গে এ-পথ যুক্ত।

সামাজিক-অর্থনৈতিক দাবির ব্যাপকতর ক্ষেত্রই হল আজকের দিনে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রামের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় জাপানে বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন সোহিও-র নেতৃত্বের ক্ষেত্রে—এই নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জোর দেওয়া হয়েছে যে জাপানি-শ্রমিকদের শুধু উচ্চতর মজুরির জন্যই সংগ্রাম করা উচিত নয়, সমস্ত দিকেই তাদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম চালাতে হবে—সামাজিক বীমা ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা উন্নয়নের

* বলাই বাহুল্য যে, পুঁজিবাদের আমলে এ-ধরনের এই পরীক্ষাগুলির সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অবশেষে প্রশমিত হয় ব্যক্তি-মালিকানায় এবং সমগ্র বুর্জোয়া জীবন ধারায়—এই বুর্জোয়া সমাজ শ্রমিকদের এই আত্মনিয়ন্ত্রণ বা নিজস্ব পরিচালনাকে সামাজিক দিক দিয়ে বিরোধী এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো গণ্য করে এবং এর অস্তিত্ব বিলোপ বা বাধা-দানের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যায়। তথাপি উৎপাদন পরিচালনা ও সমাজ প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতের ক্রমবর্ধমান উদ্যোগের আভাস হিসাবে দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন শ্রমিক পরিচালিত এই কেন্দ্রগুলির ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জন্য, পরিবেশের নিরাপত্তা বিধান এবং সরকারি পরিবহনের চলাচল ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা প্রভৃতির জন্যও তাদের দাবি করতে হবে।*

শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে শ্রমিকদের সংগঠন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সঙ্গে র‍্যাশনালাইজেশনকে যুক্ত করার দাবি উপস্থিত করছে যাতে বেকারি বৃদ্ধি রোধের ব্যবস্থা নেয়া যায়—এই ব্যবস্থা হল : বাড়তি শ্রমিকদের বিভিন্ন সংস্থায় স্থানান্তরিত করা তাদের প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি। আমেরিকা ও কতকগুলো পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলো কাজের সপ্তাহের সময়কাল অধিকতর হ্রাস করার দাবি জানাচ্ছে—এই সময়কাল হ্রাস করা হলে স্বয়ংক্রিয় শিল্পে বাড়তি শ্রমশক্তিকে কাজে নিযুক্ত করা যাবে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক দাবি উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে সংগঠিত শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন এই দাবিগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থির করতে চায়। অনেক দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর বিশেষজ্ঞ ও গবেষণা সংস্থা রয়েছে—এই বিশেষজ্ঞগণ ও গবেষণা সংস্থা জ্ঞানসম্মত উপায়ে সামাজিক প্রক্রিয়াগুলোর ব্যাখ্যা করে এবং উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপযোগী সমাজবিজ্ঞাগত, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য গবেষণাগুলো উপস্থিত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে জি সি এল-এর সাধারণ সম্পাদক জর্জ সেসুই ফ্রান্স জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার-এ এই ব্যাখ্যা-গুলোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন যে এই উদ্দেশ্য হল : "কাজের সংগঠনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে সে-সম্পর্কে উন্নততর ধারণা লাভ করা এবং আগামী দশ বছরের মধ্যে এই পরিবর্তনের ফলাফলগুলো নির্ণয় করা।"**

শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান সামাজিক-অর্থনৈতিক দাবিগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংযুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শ্রমজীবীগণের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের দাবিতে শ্রমিকশ্রেণীর তীব্র সংগ্রাম। জাতীয় পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক রূপায়ণের উপর নির্ভর করে শ্রমিকদের সংগঠনগুলো এই সংগ্রামে বিভিন্ন লক্ষ্য ও কর্মসূচী উপস্থিত করে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগ্রাম পরিচালনা করে। বুর্জোয়া মুখপাত্রগণ এবং দক্ষিণপন্থী সামাজিক সংস্কারবাদীরা অর্থ-নৈতিক পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি "সামাজিক অংশী-

---

* সোভিও নিউজ, সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৭৮, পৃঃ ১০-১১।

** ইকনমিক এট পলিটিক নং ২১, ১৯৭৯, পৃঃ ২৩।

দায়িত্বে" দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলো বুর্জোয়াদের এই প্রচেষ্টার পাল্টা তাদের নিজস্ব বিকল্প উপস্থিত করে—এই বিকল্পের মূল কথা হল: অর্থনীতি এবং সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিচালনামূলক কাঠামোর প্রকৃত গণতন্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা।

আমরা এখন শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের রাজনৈতিক দিকটির উপর ক্রমবর্ধমান তীব্রতা লক্ষ্য করছি—কিন্তু এ-সংগ্রাম সুনির্দিষ্ট সামাজিক দুঃখ-দুর্দশার (বেকারি, পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রভৃতি) বিরুদ্ধেই শুধু পরিচালিত নয় এ-সংগ্রাম বর্তমান রাজনৈতিক হাতিয়ারগুলোর বিরুদ্ধেও পরিচালিত হচ্ছে, কারণ এই রাজনৈতিক হাতিয়ারগুলো এই সব সামাজিক দুঃখ-দুর্দশার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে সমর্থ হচ্ছে না। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট ও সরকারের উপর প্রত্যক্ষ এবং ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করছে। এর আভাস পাওয়া যাবে ব্রিটেনে ১৯৭০ দশকের ঘটনাবলী থেকে—সেখানে (১৯৭৪) রক্ষণশীল সরকারের পতন ঘটল—তারপর (১৯৭৯) শ্রমিক সরকারেরও পতন হলো। এমন পরিস্থিতিতে এই ঘটনাবলী ঘটছে যখন শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বেড়েছে এবং প্রধানত এই পতনের কারণ হল: এই সরকার দুইটির নীতির সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠা।

এ-ধরনের প্রবণতা আজ এক বৃহত্তর তাৎপর্য বহন করে এনেছে, বিশেষ করে যখন রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের যে-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গভীরতর সামাজিক সংঘাত প্রতিফলিত হয় সেই ব্যবস্থা সংকটের উপসর্গগুলোর মোকাবিলা করে, যখন এই সংঘাত এমন পর্যায়ে ওঠে যেখানে সামাজিক জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক হাতিয়ারগুলো কম-বেশি নিজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং শ্রম জীবীজনগণের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক কার্যকলাপকে রুদ্ধ করতে পারে না।

মধ্যপন্থী নির্বাচক-মণ্ডলীর মধ্যে যে ভাঙন অবিচলভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে তা থেকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাই আত্মপ্রকাশ করছে। কয়েক দশক ধরে এই মধ্যপন্থী নির্বাচক মণ্ডলীরা "নরম-পন্থী" বুর্জোয়া দেশগুলোর প্রধান ঘাঁটি হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে। এই অবস্থাটি নির্বাচকমণ্ডলীর বিরাট অংশের রাজনৈতিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে আরও বেশি স্পষ্ট মেরুকরণ বা ভাগাভাগির পথে ঠেলে দিচ্ছে। আগের চেয়ে

আরও অনেক বেশি সুস্পষ্ট হয়েছে বাম ও দক্ষিণ ব্লকের মধ্যে এক অস্থিতিশীল ভারসাম্য—এই অবস্থার মধ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তিগুলোর পরিবর্তন নির্ভর করছে "গ্রে জোনে" মধ্যবর্তী স্থান গ্রহণকারী জনসংখ্যার অপেক্ষাকৃত এক ক্ষুদ্র অংশের দোদুল্যমানতার উপর। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই পরিস্থিতি বিভিন্নভাবে ইতালি ও ফ্রান্সে সামাজিক-রাজনৈতিক সংগ্রামের উলটপালটকে প্রভাবিত করছে এবং ব্রিটেন, এফ আর জি ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেও এটা অন্যভাবে অনুভূত হয়েছে।

এটা মনে রাখা উচিত যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিভিন্ন ঘটনা বিকাশের সম্ভাবনার পথ প্রসারিত করেছে। বিশেষ অবস্থায়, সাময়িক ভারসাম্য প্রতিক্রিয়াশীল-বুর্জোয়াচক্রের অনুকূলে পাল্টে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে অনুসৃত হতে থাকবে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ফলাফলগুলো। আবার রাজনৈতিক শক্তির এই ভারসাম্য শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন, বামপন্থী দল ও সংগঠনগুলোর পক্ষে ঝুঁকতে পারে। এই সম্ভাবনা ঘটানোর জন্য সংগ্রাম বর্তমানে অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এই সংগ্রামের প্রচেষ্টায় শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাই থাকে না, সেই সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের বর্তমান দাবি পূরণের মোক্ষম শর্ত হিসাবে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক সংস্থাগুলোকে গণতন্ত্রীকরণের দাবি আদায়ে অগ্রণী-বহু ট্রেড ইউনিয়নের প্রচেষ্টাও রয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি যে এটা উল্লেখ করার যুক্তি রয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে সামাজিক বিরোধের তীব্রতা শ্রমিকশ্রেণীকে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুখোমুখি হওয়ার নতুন স্তরে উঠতে সাহায্য করছে।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে যে এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে এই প্রবণতার উদ্ভব ঘটছে এবং তা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়: শ্রেণী শত্রুর ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ঐক্যের অভাব প্রভৃতি। অবশ্য, পুঁজিবাদের বিষয়গত নিয়মের প্রভাবে এবং বামশক্তিগুলোর উদ্দেশ্যপূর্ণ এক-চেটিয়া-বিরোধী কার্যকলাপের ফলে এই প্রবণতার বিকাশলাভ ঘটতে থাকে।

এই প্রবণতার উৎস শুধু সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের তীব্রতাই নয়, এই বিরোধগুলোর আন্তর্জাতিকতাকরণের মধ্যেও এই প্রবণতার সূচনা হয়

—এটা একটা প্রক্রিয়া যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশ এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলোর কাজের সংযোগ সাধনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করে। বর্তমানে এটা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, কারণ বিশ্ব-প্রগতির বিকাশ ও তার ভবিষ্যৎ ও সম্ভাবনা এবং যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন ও অন্যান্য বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের পথ ও উপায় প্রধানত নির্ভর করে সেই শ্রেণীশক্তিগুলোর উপর যে-শক্তিগুলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বাধিক শক্তিমান।

এই সামাজিক বিরোধের ক্ষেত্রেও শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের পক্ষে নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত হচ্ছে। এই সম্ভাবনাগুলো প্রধানত সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে বিশ্বে শ্রেণীশক্তি বিন্যাসে যে-পরিবর্তন ঘটে তার সঙ্গে যুক্ত হয়, বিশেষ করে যে-পরিবর্তনগুলো পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের ক্ষেত্রে অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সেই পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে এই সম্ভাবনাগুলো একাত্ম হয়।

এই দেশগুলোর প্রলেতারিয়েত বহুজাতিক কর্পোরেশন ও সরকারের আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বয়যুক্ত নীতির বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় সংহতির বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা প্রয়োগ করে জাতীয় সীমারেখার বাইরেও বেকারি-বিরোধী সংগ্রাম প্রসারিত হয়। এই সংগ্রামের লক্ষ্যের অস্ত্রাগার বৃদ্ধি ও শাণিত হয় আন্তর্জাতিক ধর্মঘটের মতো অস্ত্রের মাধ্যমে। এ-ধরনের ধর্মঘট সংগঠিত হয় ১৯৭০-এ সলভে এণ্ড সেন্ট গোবেইন বহুজাতিক ক্যামিকাল ট্রাস্ট, ডানলপ-পাইরেলি রাবার মনোপলি, আকজো বহু শাখা কর্পোরেশন এবং অন্যান্য কর্পোরেশনে।

আগের দিনের সংহতি অভিযান ছিল ভিন্ন ধরনের। তখন এক দেশের শ্রমিকদের সংগ্রামী উদ্যোগের পক্ষে অপর দেশের শ্রমজীবী জনগণের সমর্থন ছিল (স্বল্পমেয়াদী ধর্মঘট, মিছিল, কোনো একটি সাহায্য তহবিলে অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি)—এ গুলো ছিল যুক্ত আন্দোলন, তার প্রস্তুতি আগে থেকেই চলত এবং তা একই সঙ্গে একই পরিকল্পনা অনুসারে সংগঠিত হত। যে সমস্ত এলাকা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রধানত নতুন সেইসব এলাকায় আজকের এই ধর্মঘটগুলো হল শক্তির প্রথম পরীক্ষা। এই প্রথম অভিজ্ঞতার নির্দেশ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ; অত্যন্ত জরুরী দাবিগুলোর অন্যতম কর্মসংস্থানের গ্যারান্টির দাবিতে সংগ্রামের যুক্তিসম্মত ধারা অবশ্যম্ভাবী-রূপে শ্রমিক ও তার সংগঠনগুলিকে বহুজাতিক একচেটিয়াদের।* বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মুখোমুখি নিয়ে আসে।

---

* এই প্রশ্নগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের সংস্থা কর্তৃক প্রযোজিত প্রবন্ধ **আন্তর্জাতিক**

পুঁজিবাদ যে-ভাবে পশ্চিম ইউরোপে বহিরাগত শ্রমিকদের ব্যবহার করে তা শ্রমিক আন্দোলনের সামনে আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এক জটিল সমস্যা তুলে ধরেছে। এফ আর জি, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশে লক্ষ লক্ষ স্থায়ী ও অস্থায়ী বহিরাগত শ্রমিক প্রধানত কষ্টসাধ্য ও স্বল্প মজুরির কাজে নিযুক্ত হয়। শ্রমিকশ্রেণীকে বিভক্ত রাখার জন্য এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে জাতীয় সংস্কারগুলো উস্কিয়ে দিতে শাসক-চক্র পক্ষপাতিত্ব ও জাতি-বৈষম্যবাদকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। শ্রমিকদের সংগঠনগুলো আন্তর্জাতিক সংহতির আদর্শে এবং বহিরাগত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য সমন্বয়মূলক কাজের মাধ্যমে শাসকচক্রের এই নীতির মোকাবিলা করছে।

বর্তমানে শ্রমজীবী মানুষের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উপর বিভিন্ন রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি সম্পন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরিস্থিতির রূপ পরিগ্রহ করছে। এই আন্দোলনের সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে: গণ-বেকারির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বহুজাতিক কর্পোরেশনের স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্ব সংযত করা এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করা। বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের ৩০তম অধিবেশনে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলোর আন্তর্জাতিক কনফেডারেশন এবং জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার প্রভৃতি প্রধান আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি বহু বিষয়ে অভিন্ন।* এটা প্রমাণিত যে অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও শ্রমজীবী মানুষের জরুরী সমস্যা সমাধানের সংগ্রামে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যুক্ত আন্দোলন উদ্দীপিত করার ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা সূচিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আন্দোলন সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ও এক অভিন্ন মোর্চা সংগঠিত করার জন্য বহু ট্রেড ইউনিয়ন স্থায়ী সম্পাদকমণ্ডলী নিয়োগ করেছে। শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে উন্নততর সংগঠন এক ব্যাপক ও আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বয়মূলক আন্দোলনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৯৭৮ সালে শ্রমজীবী জনগণ বেকারির বিরুদ্ধে ও কাজ করার অধিকার

একচেটিয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীতে, মস্কো, নওকা পাবলিশার্স, ১৯৭৬ (রুশ ভাষায়)।

* ট্রেড, এপ্রিল ১২ এবং ১৪, ১৯৭৯।

রক্ষায় ট্রেড ইউনিয়নগুলির আহ্বানে একই সঙ্গে ১৮টি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে আন্দোলন পরিচালনা করে।

এই আন্দোলনগুলো অত্যন্ত আশা ব্যঞ্জক এবং দ্রুত এমন এক প্রবণতা সঞ্চারিত করে যার বৃহত্তর তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় যখন এই আন্দোলন পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের অপরাপর ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রবণতা নিয়ে বিস্তার লাভ করছে।

তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সংঘাতের তীব্রতা বর্তমানে শ্রেণী সংগ্রামে এমন এক প্রবণতা ও সম্ভাবনার শক্তির সঞ্চার করছে যা, কোনো কোনো পুঁজিবাদী দেশে দক্ষিণপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর কার্যকলাপ সত্ত্বেও পরিশেষে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলোকে অগ্রগতির নতুন সম্ভাবনা এনে দিতে পারে।

প্রগতির সংগ্রামে

সার্গিও ভেইরা

মোজাম্বিক মুক্তিফ্রন্ট (ফ্রেলিমো)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রেলিমোর তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক ঘটনা। এর কারণ প্রধানত, এই কংগ্রেস ফ্রেলিমোকে শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, বিপ্লবী, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের অগ্রণী পার্টি রূপে পুনর্গঠিত করল, সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শগত ও সাংগঠনিক নীতিগুলো এই পার্টির ভিত্তি হল।

পার্টি গড়ার বিষয়টি বলবার আগে এটা নিশ্চয়ই উল্লেখ করতে হবে যে তৃতীয় ফ্রেলিমো কংগ্রেসে মোজাম্বিকের শ্রমিকশ্রেণীর দীর্ঘ ও কঠোর বৈপ্লবিক সংগ্রামের ফলশ্রুতিকে একত্র করা হয়। ১৯৬৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর ফ্রেলিমো সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম শুরু করে এবং কয়েক বছরের মধ্যে কাবো ডেলগাডো ও নিয়াসার উত্তর প্রদেশগুলোতে মুক্তাঞ্চল গড়ে ওঠে। স্বভাবতই, এসব অঞ্চল থেকে ঔপনিবেশিকতাবাদীরা বিতাড়িত হওয়ার পর আমরা অনেকগুলো গুরুতর সমস্যার মুখে পড়ি। খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নানান জিনিসের অভাব ছিল। এসব সমস্যার মীমাংসা করতে আমাদের উৎপাদন গড়ে তুলতে হয়েছিল। কিন্তু যখন বৈষয়িক দ্রব্যাদি উৎপাদনের কথা ভাবা হয়, তখন সর্বদাই এই উৎপাদনের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তির বিষয়টি সামনে এসে দাঁড়ায়।

এটা কেবল একটা তত্ত্বগত ব্যাপার নয়, জরুরী বাস্তব সমস্যাও বটে। আমরা মুষ্টিমেয় একদল শোষকের হাতে পড়ি ও নতুন দাসত্ব বন্ধনে বন্দী-হই, এজন্য আমরা লড়ি নি ও ঔপনিবেশিকতাবাদীদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করি নি। ঔপনিবেশিক প্রশাসন ধ্বংস করা হয়েছিল। রাষ্ট্রক্ষমতা কিভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং এজন্য কী ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োজন? আমাদের দেশে এবং আমাদের জনসাধারণের মাঝে তখনও শোষকশ্রেণীগুলোর লোকজন

ছিল—যারা ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াদের একনায়কত্বের বদলে জাতীয় শোষকদের একনায়কত্ব চেয়েছিল।

১৯৬৮তে নিয়াসা প্রদেশে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় 'ফ্রেলিমো' কংগ্রেসে এসব প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেওয়া হয়েছিল। একটি জাতীয় অর্থনীতি ও জনগণের ক্ষমতা গড়ে তোলার নীতি নির্ধারণ করল ঐ কংগ্রেস। অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কংগ্রেসের নীতি নির্দেশগুলোর রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করা গেল, মুক্তাঞ্চলগুলোতে সমবায় গঠনের মধ্য দিয়ে। 'ফ্রেলিমো' সদস্যগণ, মুক্তি বাহিনীর সৈনিক ও সমবায়ী কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিগুলোর মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই কমিটিগুলো শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণী-একনায়কত্বের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল।

দ্বিতীয় ফ্রেলিমো কংগ্রেসের পর সঞ্চিত জ্ঞানকে একটা সাধারণ তত্ত্বগত রূপ দিতে নেতৃত্ব যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মীরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে তলিয়ে দেখতে, আমাদের পরিস্থিতি ও বিপ্লবের সূত্রকে অনুধাবন করতে সাহায্য করেছিল যাতে আমরা সমাজ পুনর্গঠন করতে পারি। এই নিবিড় ও কঠিন কাজে একটা বড় রকমের অবদান রেখেছিল ফ্রেলিমোর প্রচার-পুস্তিকা ও বেতার প্রচার।

এই সময়ের মধ্যে ফ্রেলিমোকে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী পার্টিতে পরিণত করার প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল। সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার বার্ষিকীতে ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে এক বার্তায় ফ্রেলিমোর সভাপতি সামেরা মাচেল উল্লেখ করেন যে এই পুনর্গঠনের শর্তগুলো প্রস্তুত করতে হবে। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে এই প্রশ্নটি বিবেচিত হয়। এই সভায় সব ফ্রন্টে—অর্থনৈতিক, আদর্শগত, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, উৎপাদন ও অবশ্যই সামরিক—বিপ্লবের অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার কাজগুলো স্থির হয়। পূর্ণাঙ্গ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে মোজাম্বিক পিপল্‌স লিবারেশন ফোর্স (এফ পি এল এম)-এ ১৯৭৩ সালে প্রথম পার্টি কমিটিগুলো গড়া হয়েছিল। ১৯৭৪-এর জানুয়ারিতে পার্টি স্কুল তৈরি হয়। এখানে ফ্রন্ট কর্মীরা তাদের তত্ত্ব-জ্ঞান বৃদ্ধি করে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করে এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করে।

তৃতীয় ফ্রেলিমো কংগ্রেসে অগ্রণী পার্টি গঠনের উপযোগী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য কাজের এভাবে ফল ফলল। পার্টি গঠনের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল খাঁটি বিপ্লবী কর্মীদের

একটি শাঁসালো অংশের অস্তিত্ব। এই কর্মী বাহিনী শ্রমজীবী জনগণের মধ্য থেকে অসংখ্য কর্মী টেনে আনতে সক্ষম হয়েছে যারা উৎপাদন ও শ্রমদক্ষতা বৃদ্ধিতে তাদের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছে। ওরা বিপ্লবের শত্রুদের অর্থ-নৈতিক ও আদর্শগত অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে লড়তে এবং গুপ্ত পুলিসের চরদের ফ্যাসিস্ট ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যান্য দমন-পীড়ন সংস্থা উদঘাটিত করার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে।

পার্টি গঠনের প্রচারাভিযান ৩রা ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ই নভেম্বর ১৯৭৮ পর্যন্ত চলে। ঐ প্রচার কেমনভাবে চলেছিল তার সম্পর্কে দু-চারটে কথা বলি।

এটা যেহেতু গণপার্টি বা ব্যাপক ভিত্তিক ফ্রন্ট নয়, এটা শ্রমজীবী মানুষের অগ্রণী পার্টি—যে-পার্টি মোজাম্বিককে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যাবে, তাই এর সদস্যপদ সুনির্দিষ্ট পরিষ্কার শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। প্রথম স্তরে স্থানীয় ফ্রেলিমো কমিটিগুলো পার্টি সদস্যপদের প্রার্থীদের ঝাড়াই-বাছাই করেছিল। পরবর্তী স্তরে জনসভাগুলোয় প্রার্থীদের নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি যে-কোনো একজন সম্পর্কে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারত। তারপর পার্টির প্রাদেশিক কমিটিগুলো অনুমোদিত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে।

এভাবে পার্টিতে হাজার হাজার মানুষ যোগদান করে। অগ্রণী রূপে তাঁরা তাঁদের স্থান করে নিতে পারলেন কারণ তাঁরা হলেন দৃষ্টান্ত-স্থানীয় শ্রমিক যাদের জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, তাঁরা দেখিয়েছিলেন তাঁরা আদর্শগত দিক থেকে অঙ্গীকারবদ্ধ যোদ্ধা এবং আচরণ দ্বারা তাঁরা তাঁদের বিশিষ্টতার প্রমাণ দিয়েছেন। এভাবে মোজাম্বিকের জনগণের সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে যোগ্য ও সবচেয়ে বিশিষ্ট মানুষগুলোকে নিয়ে পার্টি গড়া হয়। আজ আমাদের একটা রাজনৈতিক অগ্রবাহিনী আছে—যে বাহিনী দৃঢ়, অবিচল, ইস্পাতশাণিত, ওপর থেকে তলা পর্যন্ত সংগঠিত এবং সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম চালাতে তৈরি।

পার্টি গঠনের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলো গড়া ও জোরদার করা হল। যুব ও মহিলা সংগঠন গড়ার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কিছুটা এগোনো গিয়েছে 'কান্টিজুয়াডোর'দের—যে কিশোর বা বিপ্লব অগ্রসর করবে—সংগঠন ১৯৭৯ সালে গড়া হবে। শ্রমিক সংগঠনগুলো জোর পায়ে দাঁড়াচ্ছে। এই ধরনের উন্নতির জন্য প্রেরণা এল ১৯৭৬ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত এক সভা থেকে। এই সভায় ভাষণ দেন আমাদের প্রেসিডেন্ট সামোরা মাচেল।

উৎপাদন পরিষদগুলো তখন থেকে গড়া শুরু হল এবং এগুলো হয়ে উঠল শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করতে সক্ষম কর্মী গড়ার বিদ্যালয়। এভাবে আমরা এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছাব যেখানে সমগ্র জাতিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলো সম্পাদনে টেনে আনা যায়।

বিপ্লবের বর্তমান স্তরের আরেকটি মূল দিক হচ্ছে (যেটি ফ্রেলিমো কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলোতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে) একটি নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের সৃষ্টি। আমাদের বিজয়ের সময় জাতীয় ভূখণ্ডের এক তৃতীয়াংশে ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া শাসনকে ধ্বংস করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান-গুলো ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়েছিল নতুন প্রশাসন সংস্থাগুলো গঠন, জনগণতন্ত্রী রাষ্ট্র, শ্রমজীবী মানুষের একনায়কত্ব যার লক্ষ্য শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অর্জন। নতুন রাষ্ট্র গড়ার গুরুত্বপূর্ণ স্তর গণ-পরিষদগুলোর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উভয় স্তরেই জনগণের রাষ্ট্র ক্ষমতার দৃঢ় বনিয়াদ ও সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হল এই গণ-পরিষদ-গুলো। ১৯৭৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর আমাদের দেশের এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। নির্বাচনে এত দীর্ঘ সময় লাগার কারণ দেশের ভূখণ্ডের আকৃতি, পরিবহণের অভাব, ব্যাপক নিরক্ষরতা প্রভৃতি জাত অসুবিধাদি। উল্লেখযোগ্য রোডেশিয়া সীমানা সংলগ্ন অঞ্চল-গুলোতে নির্বাচনে দেরি হয়েছিল, কারণ সেখানকার সামরিক পরিস্থিতি ছিল উত্তেজনাকর।

নির্বাচনে কী দেখা গেল? তার ফলাফলই বা কী? মোট ১,০২৭ টি গণ-পরিষদের নির্বাচন হয় এবং সারা দেশে এগুলো কাজ করছে। গণপরিষদ গুলোতে ডেপুটির সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার—আরো উল্লেখযোগ্য এর মধ্যে ২৭ শতাংশ মহিলা (আফ্রিকায় রাষ্ট্র ক্ষমতার সংস্থাগুলোতে এটাই বোধ হয় মহিলাদের অংশগ্রহণের সবচেয়ে বড় অনুপাত)। গণ-পরিষদগুলোতে শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে বলা যায় গণ-পরিষদগুলোর ৩০ শতাংশ ডেপুটি শ্রমিক ২৫ শতাংশের বেশি সমবায়িকা-কৃষক ও কৃষি শ্রমিক ও ১৫ শতাংশের বেশি মুক্তি আন্দোলনের প্রবীণ কর্মী ও দেশের সশস্ত্রবাহিনী ও নিরাপত্তা কৃত্যকের প্রতিনিধি। বাকিরা সরকারি কর্মচারী ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী।

এই পরিসংখ্যান দেখিয়ে দেয় কারা ক্ষমতার অধিকারী, কোন্ কোন্ শ্রেণী আমাদের দেশে একানায়কত্ব প্রয়োগ করে। আমরা এখন নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি এবং জনগণের বিচারপতি নির্বাচনের

জন্য তৈরি হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রেও শ্রমিকশ্রেণী ও সমবায়িক-কৃষক প্রাধান্য বিস্তার করবে।

১৯৭৭ সালের ফ্রেলিমো কংগ্রেসের নির্দেশগুলো রূপায়ণের ক্ষেত্রে তৃতীয় ও শেষ উপাদানটি হল অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ। আমাদের সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো—বিশেষ করে নিয়ন্ত্রণ অধিগ্রহণ, বড় বড় কারখানা, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি জাতীয়করণ, জমিতে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা, সমবায় ও গ্রাম-কমিউন গঠন এবং সার্থক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ফলে মোজাম্বিক সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক উদ্ভব ও প্রসারের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

সমাজতন্ত্র উৎপাদনী শক্তিগুলোকে বন্ধনমুক্ত করে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে চালিত শ্রমজীবী জনগণই কেবল উন্নয়নের মূল সমস্যাগুলো, সামাজিক কল্যাণ কার্যের সমস্যাগুলো সমাধান করতে সক্ষম। আমাদের জনগণ খুব বেশি দিন স্বাধীনতা অর্জন না করলেও যুদ্ধাবস্থা, সাম্রাজ্যবাদী চাপ ও সাবোতাজ, উস্কানি ও অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাত সত্ত্বেও কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। এছাড়া আমরা খরা প্রভৃতির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিলাম। এতৎ সত্ত্বেও, জোর দিয়ে একথা বলা যায় যে জনগণের সামাজিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, শিক্ষাব্যবস্থার দ্রুত প্রসার ঘটছে। ১৯৭৫ সালে মোজাম্বিক যখন স্বাধীন হয়, ৬ লক্ষের কম শিশু বিদ্যালয়ে যেত আজ এই সংখ্যা ১৮ লক্ষে পৌঁছেছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষি আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি। বর্তমানে প্রায় ১০ শতাংশ কৃষক গ্রাম-কমিউন ও সমবায়ে রয়েছে বা রাষ্ট্রীয় খামারে কাজ করে। কিন্তু আমাদের কৃষকদের এক তৃতীয়াংশ কোনো না-কোনোভাবে সমবায় উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের প্রধান কৃষিপণ্য ধান ও শস্যের ভালো ফলন হয়েছে। চায়ের ফলন ১৯৮০ সালের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বিদেশী চিনি উৎপাদকদের অন্তর্ঘাতের ফলে চিনি উৎপাদনটা তত ভালো হয় নি। অবশ্য এই সমস্ত কোম্পানির কাজ বর্তমানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং আশা রাখি পরিস্থিতির শীঘ্রই উন্নতি ঘটবে।

আমাদের পার্টি কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ ও শিল্পের সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আশাবাদী। লিম্পোপোতে একটি কৃষি শিল্প প্রকল্প এখন চালু হয়েছে। বুলগেরীয় কমরেডদের সহযোগিতায় এদেশের

সেচসেবিত অঞ্চল গাঙ্গা প্রদেশের ৩ লক্ষ হেক্টর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হবে। নিয়াসা, টেটে, মানিকা ও কাবো ডেলগাডো প্রদেশগুলোতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিল্পকে আমরা অর্থনৈতিক উন্নতির সজীব ও চূড়ান্ত উপাদান বলে মনে করি। এক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। শিল্পের কিছু কিছু শাখা ১৯৮০ সালের জন্য নির্ধারিত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে গেছে এবং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি অন্যান্য শাখাও অনুরূপ সূচক স্পর্শ করবে। বিশেষ করে এই বিশ্বাসের ভিত্তি হল কয়লা শিল্পের বিকাশ। অতীতে বিদেশী পুঁজি এই শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করত। স্বাধীনতার পর প্রাক্তন মালিকরা বড় রকমের প্ররোচনায় লিপ্ত ছিল। অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাতের আশ্রয় নিয়ে তারা খনির কাজকে বানচাল করার চেষ্টা করে। এর ফলে সেখানকার উৎপাদন ব্যাহত হয়, কিন্তু খনি শ্রমিকরা এই অন্তর্ঘাতের ফলাফল দূর করার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেছিল এবং কয়লার উৎপাদন এখন আগের স্তর ছাড়িয়ে গিয়েছে। এটি আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ়তা, রাজনৈতিক সচেতনতা ও বৈপ্লবিক সংকল্পবোধের জ্বাজল্যমান দৃষ্টান্ত।

অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে আমাদের দল উন্নয়নের নিয়ামক উপাদান হিসেবে ভারী শিল্প নির্মাণের ওপর বিরাট তাৎপর্য আরোপ করে। কয়লা (যার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে) ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভিত্তিতে আমরা রসায়ন শিল্পের অগ্রগতি ঘটাবার চেষ্টা করছি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বিশেষ করে কৃষি যন্ত্রপাতি ও পরিবহন যান তৈরির প্রকল্প গড়ার পরিকল্পনা করছি। আমাদের অর্থনীতির জন্য ধাতু শিল্পের ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য মনোনিবেশ করা হচ্ছে। অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের সম্ভাবনা আমরা খতিয়ে দেখছি। এজন্য প্রয়োজনীয় সহায়-সম্পদ আমাদের আছে। লঘু শিল্প, বিশেষ করে খাদ্য ও বস্ত্র উৎপাদন প্রসারের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মোটের ওপর আস্থাভরে একথা বলা যায় যে বর্ণবিদ্বেষী স্মিথ শাসকগোষ্ঠী আমাদের ওপর কার্যত যুদ্ধ চাপিয়ে দিলেও আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ভিত্তি নির্মাণে আরো অগ্রগতি লাভে সমর্থ হব।

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে গণ-প্রজাতন্ত্রী মোজাম্বিক মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিগুলোর দ্বারা অগ্রসর হয়। শান্তি, স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে

দাঁতাত গভীরতর করতে ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বুনিয়াদী প্রবণতায় পরিণত করার জন্য আমরা আমাদের প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ বিধৃত করেছি।

আমাদের অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও দাঁতাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর বিশ্বের অন্যান্য অংশের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন অর্থ আছে। ইউরোপ, এশিয়া এবং এমন কি আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অস্তিত্বকে অবহেলা করতে পারে না: শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও দাঁতাতের প্রবণতাকে তাদের ধর্তব্যে আনতে হয়। কিন্তু আমাদের এ-অঞ্চলে তারা কিছুতেই মোজাম্বিক ও অ্যাঙ্গোলার অস্তিত্বকে মানিয়ে নেয় নি এবং আমাদের ধ্বংস করতে তারা কৃতসংকল্প। আমাদের এ-অঞ্চলের প্রথম দুটি দেশ যেখানে জন গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম হয়েছে এবং যারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতিসমূহের ভিত্তিতে সমাজকে ঢেলে সাজাতে সংকল্পবদ্ধ তাদের উৎসাদনে সাম্রাজ্যবাদ আদর্শগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক উপায় প্রয়োগ করেছে। তাই আফ্রিকা মহাদেশে আমাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও দাঁতাতের সংগ্রাম নানান অসুবিধার মুখে পড়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বাড়িয়েই আমরা এই সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারি। আমরা জাতির নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার অবস্থায় এলেই কেবল শত্রুকে আফ্রিকা মহাদেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, দাঁতাত ও শান্তি সংগ্রামের বাস্তবতা অনুধাবন করাতে বাধ্য করব।

তৃতীয় ফ্রেলিমো কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহে ও গণপ্রজাতন্ত্রী মোজাম্বিকের সংবিধানে সমস্ত কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার ওপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, কারণ এরা ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়, কারণ মোজাম্বিকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য এরাই নির্ভরযোগ্য দৃঢ় অবলম্বন। একটি কথা জোর দিয়ে বলতে হবে যে একাধিক সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন, বুলগেরিয়া, কিউবা, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, জনগণতান্ত্রিক কোরিয়া ও গণপ্রজাতন্ত্রী অ্যাঙ্গোলার সঙ্গে ইতিমধ্যেই মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গেও স্থায়ী মৈত্রী সম্পর্ক প্রসারিত হচ্ছে।

একই সঙ্গে মোজাম্বিক, সমাজব্যবস্থা যা-ই হোক বিশ্বের সব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক চায়। নিম্নলিখিত নীতিগুলির ভিত্তিতে আমরা রাজনৈতিক,

কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা গড়তে আগ্রহী :—পরিপূর্ণ সমতা, সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা দান ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না-করা এবং পারস্পরিক সুবিধা। মোজাম্বিক বহু পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে এই সম্পর্ক বজায় রাখে।

দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি একটা বিশেষ ব্যাপার। এক দিকে আমাদের মহাদেশে এটি সাম্রাজ্যবাদের প্রধান দুর্গ। কিন্তু অন্যদিকে অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিকে গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা হওয়ার পর এটি আফ্রিকায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দুর্গে পরিণত হয়েছে। আজ দক্ষিণ আফ্রিকায়, অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের সীমান্ত কেবল বর্ণবিদ্বেষী ও ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা সূচিত করে না, এই সীমান্ত সামাজিক বিকাশের পথের বিশিষ্টতাও নির্দেশ করে। আমাদের দেশগুলোতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিজয়ের ফলে বিশ্বের এই অংশে শক্তিসমূহের ভারসাম্যের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। এই মহাদেশের দক্ষিণে, বিশেষ করে জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ায় ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেও মুক্তি আন্দোলন তখনই যথেষ্ট জোরদার হয়েছে যখন এই আন্দোলনের পেছনে বিশ্বস্তভাবে দাঁড়িয়েছে আমাদের দেশগুলি, যারা প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে একটি নীতি অনুসরণ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় তার আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিপদ দূর করতে সাম্রাজ্যবাদ কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সন্ত্রাস, প্ররোচনা ও আগ্রাসন নীতি আঁকড়ে থাকার সঙ্গে সঙ্গে এরা যুধ্যমান জাতিগুলোকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আজ এরা কি মুখোশ পরেছে? সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বন্ধু সাজতে ও তাদের সাফল্যের সাহায্য করার উপযোগী শক্তি হিসেবে নিজেদের দেখাতে বৃথা চেষ্টা করছে। কখনও কখনও এরা কণ্টার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের সাবেকী মিত্র—রোডেশিয়া, নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী শাসকদের সমালোচনা ও নিন্দা করে থাকে, অন্যদিকে আবার তাদেরই আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দান অব্যাহত রাখে। অবশ্য, এ থেকে একটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায় যে দক্ষিণ আফ্রিকায় শক্তির ভারসাম্যের বদল হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদীদের এই সব ছলা-কলার নানান লক্ষ্য আছে। একটি হচ্ছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে তার বিশ্বস্ত ও স্বাভাবিক মিত্র, প্রধানত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করা। আরেকটি লক্ষ্য হচ্ছে এই

আন্দোলনকে 'নরম' ও প্রগতিশীল অংশে বিভক্ত করা, তারপর শেষোক্তটিকে ধ্বংস করে পূর্বোক্ত অংশকে পুরোপুরি বশে এনে নয়া-ঔপনিবেশিক বন্দোবস্ত সুনিশ্চিত করার কাজে তাকে ব্যবহার করা। এর ফলে পুঁজিবাদী কাঠামো বজায় রাখা এবং আমাদের মহাদেশের দক্ষিণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে।

অবশ্য, এই ধরনের ছলাকলা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সোয়াপোর নেতৃত্বে নামিবিয়ার ও দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের নেতৃত্বে জিম্বাবোয়ের মুক্তি আন্দোলন যথেষ্ট গতিবেগ লাভ করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট দেশের রাজধানী শহরেও সামরিক অভিযান শুরু করেছে। বস্তুত তারা সমগ্র জিম্বাবোয়েতে তৎপর এবং দেশের একটি অংশ তাদের নিয়ন্ত্রণে। ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস, ভীতি প্রদর্শন, উৎপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকাতেও গণ-মুক্তি আন্দোলন দৃঢ়তর হচ্ছে। এসব কারণে আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হচ্ছি। নিঃসন্দেহে বলা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিগুলো বর্ণবিদ্বেষ ও উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামে নতুন নতুন সাফল্য সূচিত করতে করতে পরিপূর্ণভাবে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে।

প্রতিটি বছরই শিশুদের বছর

প্রাথমিক রিপোর্ট

১৯৭৮ সালের শেষে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী মঙ্গোলিয়ায় যাই এবং সেখানে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের ব্যাপক প্রস্তুতি লক্ষ্য করি। যাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি, তিনি এ-বিষয়ে একমত যে এটা দেশের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পার্টি ও সরকারের পদস্থ ব্যক্তিদের রিপোর্ট ও বক্তৃতায়ও এর উল্লেখ আছে। আই, ওয়াই, সি-র (আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ) সমগ্র কর্মসূচী সরকার পরিচালিত এবং এম পি আর পি-র সি সি-র প্রথম সম্পাদক ও মহান জনগণের খুরালের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি ইউমজাগিন সেডেনবালের সূত্রায়িত নীতির দ্বারা সমস্ত কাজকর্ম করা হবে। তিনি বলেছেন, "কোনো সংগঠন বা কোনো ব্যক্তি শিশুদের লালনপালন ও তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার মহান যজ্ঞ থেকে দূরে থাকতে পারবেন না।" আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে, মঙ্গোলিয়ার এই বিশাল এলাকা জুড়ে শিশুদের জন্য ভাবা হচ্ছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আই ওয়াই সি সংক্রান্ত জাতিসংঘের প্রস্তাবের আগে শিশুদের যত্ন কম নেওয়া হতো। মঙ্গোলিয়ার বিপ্লবের বিজয়ের ঠিক পরেই শিশুদের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারটা রাষ্ট্রের একটি প্রাথমিক কার্যক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গোলীয় মহিলা সমিতির চেয়ারম্যান এস উদভাল জনগণের শাসনের বছরগুলোতে কি কি করা হয়েছে, তা আমায় বলেন।

১৯২০ সালের পর বহু বছর অতিবাহিত হয়েছে, যখন আরাতরা (পশুপালন) ও তাদের শিশুরা "রেড ইয়ার্টে" (ভ্রাম্যমান ক্লাব) লেখাপড়া শেখার জন্য হাজির হতো, তখন কৃষক ও শহরের গরিবদের সন্তানসন্ততির পড়াশুনার জন্য প্রথম স্কুল খোলা হলো। বিপ্লবের আগে রাষ্ট্রপরিচালিত কোনো স্কুল ছিল না, এবং লেখাপড়া জানা মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই স্বল্প। শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের জন্য রাষ্ট্র-পরিচালিত স্কুলের বিষয়টা মঙ্গোলিয়ায় এ-পর্যন্ত অজানা ছিল।

জনশিক্ষার পথপ্রদর্শকদের শুধুমাত্র বাস্তব অসুবিধাই কাটিয়ে উঠতে হয় নি। প্রতিক্রিয়াশীল যাজক সম্প্রদায় ও শোষকশ্রেণীর যারা অবশিষ্ট ছিল তারা বিপ্লবী পরিবর্তনে বাধা দিতে লাগল এবং প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান

সংগঠিত করল ও স্কুলগুলোর ওপর আক্রমণ চালাল। শিক্ষকেরা রাইফেল হাতে ক্লাসে শিক্ষা দিতেন। আর খাংগাই গ্রামে পার্ভে নামে এক প্রাথমিক শিক্ষকের স্মৃতিতে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক এবং প্রতিবিপ্লবীদের দ্বারা তাঁর স্কুল যখন আক্রান্ত হয়, সেটাকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি নিহত হন।

এসব অসুবিধা সত্ত্বেও জনশিক্ষা বেশ প্রসার লাভ করল। ১৯২৪ সালে ১৩টি সাধারণ ও ২টি বৃত্তি শিক্ষার স্কুল ছিল। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ১৫ বছরে কিণ্ডারগার্টেন থেকে উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি কোর্স-সহ শিক্ষাসংক্রান্ত একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ সালের মধ্যে প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সাকুল্যে তখন ৩৩০টি সাধারণ শিক্ষার ৩৭টি মাধ্যমিক বিশেষ স্কুল ছিল। এইসব স্কুলে ১০০০ শিক্ষক ও ২৬০০০ ছাত্র ছিল। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল বিশেষভাবে প্রসারলাভ করে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক ট্রেনিং কলেজ, উচ্চতর ও মাধ্যমিক বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০-এর মধ্যে বয়স্ক মানুষের মধ্যে মাধ্যমিক সাধারণ স্কুলে যাওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়।

পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৭৮ সালে ৩৫০০০০ শিশু (জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশেরও বেশি) ৫৭৩ সাধারণ শিক্ষার স্কুলে পড়ে এবং সহস্র সহস্র ছাত্র উচ্চতর শিক্ষা, টেকনিক্যাল ও বৃত্তিগত স্কুলে নাম লেখায়। অর্থাৎ মঙ্গোলিয়ার প্রতি চতুর্থ নাগরিক পড়াশুনা করছেন।

বর্তমান ষষ্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনায় সার্বিক আট বৎসর সাধারণ শিক্ষার বিষয়টা শেষ ক'রে সার্বিক বাধ্যতামূলক মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মতো রাষ্ট্রীয় সাহায্যে শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিশুদের জামাকাপড় ও সস্তায় স্কুলের পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র লক্ষ লক্ষ তুগরিক ধার্য করেছে।

মঙ্গোলিয়ায় ভ্রমণ করতে গিয়ে দেখা যাবে যে, কৃষকদের সন্তানেরা কিভাবে স্কুলে যাচ্ছে। কারণ তারা কমিউনিটি সেন্টার ও এমন কি গ্রাম থেকে বহু দূরে কাজ ও বসবাস করে। মঙ্গোলিয়া ১৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার জুড়ে ও ১৫ লক্ষ জনসংখ্যা সমন্বিত। অর্থাৎ প্রতি বর্গকিলোমিটার পিছু

১ জন। এই সমস্যা নিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারের ব্যবস্থাপকেরা বিশেষভাবে আলোচনা করছেন। বর্তমানে ৯৪% সমবায় ও রাষ্ট্রীয় খামারের নিজস্ব মাধ্যমিক সাধারণ শিক্ষার স্কুল আছে। গ্রাম এলাকায় বোর্ডিংসহ স্কুল আছে বিশেষ করে যেসব শিশুর মা বাবারা শহর ও গ্রাম থেকে দূরে কাজ করেন তাদের জন্য (আমি কয়েকটি স্কুলে যাই)। এই বছর পশুপালকদের ৫৭% শিশু এই ধরনের বোর্ডিং স্কুলে থাকতে পারবে। আরও ৩০০০০ শিশুর জন্য নতুন স্কুল তৈরি হচ্ছে।

বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য—উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা—মা ও শিশুদের প্রতি যত্নের আর একটি দিক। সামন্তবাদী অতীতের জেরও ছিল—একটি ডাক্তার নেই, হাসপাতাল নেই, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রোগ, বিশেষ করে ছোঁয়াচে রোগ জনসংখ্যা বিশেষভাবে কমিয়ে আনে। বর্তমানে প্রজাতন্ত্রের হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডিসপেনসারী, চিকিৎসা সাহায্য কেন্দ্র-সহ এক বিরাট ও ঐক্যবদ্ধ স্বাস্থ্য দপ্তর আছে। মঙ্গোলীয় স্বাস্থ্য দপ্তর মা ও শিশুদের প্রতি আগে যত্ন নেয়। জীবনযাত্রার উন্নতমান, ভালো পথ্য, সুগৃহ, শিশুদের নিয়মিত মেডিক্যাল চেক-আপ, শিশু পুষ্টি কেন্দ্র এবং প্রতিষেধক ঔষধের ফলে শিশু মৃত্যু হ্রাস পেয়েছে এবং জন্ম হার প্রতি হাজারে ৪০ জন হয়েছে।

আনাসতাসিয়া, সেডেনবাল-ফিলাটোভার নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শিশু তহবিল কমিশন প্রাক্-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের বৈষয়িক-ভিত্তি বাড়ানোর জন্য বিশেষভাবে সাহায্য করছে। রাষ্ট্রীয়, সমবায় ও জনসংগঠন এবং ব্যক্তিগত দানের দ্বারা এই কমিশনের তহবিল গড়ে ওঠে। শিশুদের রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক দিবসের প্রাক্কালে দেশব্যাপী রবিবারগুলো কাজ করে অর্জিত অর্থ শিশু তহবিলে দান করাটা মঙ্গোলিয়ায় একটি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই তহবিল থেকে শতশত কিণ্ডারগার্টেন, ক্রেশ, যুব টেকনিক্যাল ক্লাব, রাজধানী উলানবাতোরের নিকট আন্তর্জাতিক যুব পাইওনীয়ার হলিডে ক্যাম্প, শিশু হাসপাতাল ও পলিক্লিনিক তৈরি হয়েছে। অন্যান্য প্রকল্পগুলো তৈরি হচ্ছে।

শিশুদের জন্মের আগেই তাদের সম্পর্কে ভাবা হয়। পূর্ব ও উত্তর প্রসব সংক্রান্ত যত্নের মধ্যে ১০১ দিন সবেতন প্রসবসংক্রান্ত ছুটি, বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও মাতৃসদনে ভর্তি পর্যন্ত করা হয়। জন্মের পর হলিডে হোমে মা ও শিশুকে বিনা মূল্যে থাকতে দেওয়া হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে শ্রমজীবী মায়েরা ছয়

মাসের প্রসব সংক্রান্ত ছুটি পান এবং সে-সময়ে তাঁদের মজুরির একটা অংশ দেওয়া হয়।

মঙ্গোলিয়ায় আমি শিশুদের প্রতি অপূর্ব যত্ন নিতে ও ভালো খাওয়াতে দেখেছি। শুধুমাত্র তাদের বাবা-মা নন, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান সমবায়গুলো, বাস্তবে সমগ্র সমাজটা শিশুদের লালনপালনের জন্য সচেষ্ট। সমাজতান্ত্রিক মঙ্গোলিয়ায় একটিও অবহেলিত শিশু নেই।

আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষে মঙ্গোলিয়ায় শিশুদের প্রতি আরও যত্ন নেওয়া হবে। সকলেই এই কাজটি খুব আন্তরিকতার সাথে নিয়েছে। একাজে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমস্ত ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশের সমর্থন ও সাহায্য পাবে।

জুলিও ল্যাবোর্ড
আর্জেন্টিনার সাংবাদিক

প্যালেস্টাইনের আন্দোলনের উৎস

ডঃ এমিলি তৌমা, সিটুনা আমান আলা আল-হরাবী আল কোমিয়া আল আরাবিয়া আল-ফিলাসতিনিয়া। মাটবা আ আল সারক আলটা আউনিয়্যা। জেরুজালেম, ১৯৭৮ পৃঃ ২৭৪।

আরবের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে ডাঃ এমিলি তৌমার বহু গ্রন্থের মধ্যে তাঁর "প্যালেস্টিনীয় আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ষাট বছর" শীর্ষক গ্রন্থটি হচ্ছে প্রথম নির্দিষ্ট গবেষণামূলক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে প্যালেস্টাইনের ওপর বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে (বস্তুত তারও আগে থেকে) সত্তর দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই সময়ের ঘটনাবলী আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থ হচ্ছে ঔপনিবেশিকতা ও উগ্র ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে এবং মুক্তি ও স্বাধীনতা ও প্যালেস্টিনীয় আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। এই ঐতিহাসিক গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তব তথ্য ও ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্যালেস্টাইনে আরব জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও অন্যান্য আরব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের মুক্তি আন্দোলনের উৎস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক পাঠককে উনবিংশ শতকে নিয়ে যায়, যখন বৃটিশ উপনিবেশবাদী হলিংওয়ার্থ প্যালেস্টাইনের মাটিতে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছিলেন; কারণ তিনি আশা করেছিলেন যে এর ফলে ভারতবর্ষে যাবার স্থল পথকে রক্ষা করা যাবে এবং এর ওপর বৃটিশ শাসনকে শক্তিশালী করা যাবে। বৃহৎ ইহুদী বুর্জোয়াদের আশা আকাঙ্ক্ষা বিচার করেও এই আহ্বান দেওয়া হয়েছিল এবং এটা ছিল উগ্র ইহুদীবাদ, তার প্রতিক্রিয়াশীল জাত্যভিমানী মতাদর্শ ও প্রয়োগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

লেখক জোর দিয়ে বলেন যে উগ্র ইহুদীবাদীদের কাজকর্ম ও নীতিগুলোর লক্ষ্য ছিল প্যালেস্টাইনের আরবদের তাদের জাতীয় রাষ্ট্র থেকে বঞ্চিত করা।

তিনি দেখিয়েছেন যে উনবিংশ শতকের শেষ দিকে যখন বৃহৎ পুঁজিপতি এডমণ্ড ডি রথচাইল্ড ও অন্যান্য বৃহৎ পুঁজিপতিদের সহায়তায় প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের বসবাস ও জমি ক্রয় শুরু হল, তখন থেকেই উগ্র ইহুদীবাদীদের কার্যকলাপ অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল। কার্যত যে বৃটেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্যালেস্টাইন দখল করেছিল এবং পরে বেলফোর ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছিল সেই বৃটেনই এই কার্যকলাপ অনুমোদন করেছিল। এই বৃটেনই আগে থেকে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্তা করেছিল। কিন্তু ঐ সময় আরবেরা ছিল জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (৯১-৯৩ শতাংশ), এ সত্ত্বেও আরব রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো কথা তারা বলে নি পর্যন্ত। পরবর্তীকালে প্যালেস্টাইনে বৃটিশ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করার বিধানে ইহুদীদের জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরিবেশ রচনা করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং ইহুদীদের চলে আসার ব্যাপারে বৃটিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করা হয়েছিল; এই বিধান ১৯২২ সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্র সংঘের অনুমোদন লাভ করে।

লেখক বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতি ও উগ্র ইহুদীবাদীদের আগ্রাসী ও প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে বৃটেন উগ্র ইহুদীবাদের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় উগ্র ইহুদীবাদী নেতাদের সুবিধে হয়। যাতে উগ্র ইহুদীবাদীরা বালফুর ঘোষণাপত্রের ধারাগুলো কার্যকর করার শক্তিতে পরিণত হতে পারে, তার জন্য উগ্র ইহুদীবাদী নেতারা এস. নরডু-র মতো তাদের ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করে (পৃঃ ১২)। যে সব আরব প্রতিক্রিয়াশীল বৃটিশ উপনিবেশবাদের দৃঢ় সমর্থক ছিল তারাও এই নীতিকে সমর্থন দান করেছিল। একই সঙ্গে এই নীতির বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের প্রতিবাদ ও সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। আরবদের পত্রপত্রিকায় উগ্র ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম চালানোর ওপর জোর দেওয়া হয়; এই সংগ্রাম প্যালেস্টাইনের দেশপ্রেমিক ও প্যালেস্টাইনের বাইরে আরব জাতীয়তাবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত মধ্য প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। এই আন্দোলনের মধ্যে প্রতিটি রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়।

লেখক বলেছেন যে বিশ্বের ঘটনাবলীর ওপর মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলেই আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এক নতুন জোয়ার আসে।

১৯২০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি ৪০,০০০ আরব প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত ও দখল করার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে জেরুজালেমের রাস্তা দিয়ে মিছিল করে (পৃঃ ২২)। এই মিছিলকে সংগঠিত প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের আন্দোলনের সূচনা বলে মনে করা হয়।

১৯২০ সালের ১৪ই জানুয়ারি হাইফা-য় তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে প্যালেস্টাইনের আরবদের জাতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার দিকে এক প্রধান পদক্ষেপ। লেখক দেখিয়েছেন যে এই আন্দোলনের বেশির ভাগ নেতাই এসেছেন সামন্ত প্রভুদের পরিবার থেকে এবং এর ফলে বৃটিশ উপনিবেশ-বাদীদের সাথে এদের বোঝাপড়ার সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না। লেখক বলেছেন যে এর পরিণতি হচ্ছে এই যে বিশ দশকের প্রথম দিকে যে সব শক্তি সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস করতে চায় সেইসব শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে সৃষ্টি হয়। ফলে, এই আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে মধ্যপন্থী প্রবণতা ও আমূল পরিবর্তনকামী প্রবণতা সৃষ্টি হয়। প্যালেস্টাইনের কমিউনিস্ট পার্টি ইহুদী ও আরব শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে; পার্টি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, উগ্র ইহুদীবাদ ও আরব সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।

বিশ দশকের শেষদিকে উগ্র ইহুদীবাদী সংস্থাগুলো বৃটিশ শাসকদের নীরব সমর্থন নিয়ে প্যালেস্টাইনে দেশত্যাগী ইহুদী জনগণের ব্যাপক আগমন, আরবদের জমি কিনে নেওয়া, কৃষকদের উচ্ছেদ করা ও তীব্র অর্থনৈতিক সংকট কেন্দ্র করে ইহুদী ও আরব জনগণের মধ্যে সংঘাত উসকিয়ে তোলে। লেখক এই ঘটনার ওপর জোর দেন যে জনগণের ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী আন্দোলন ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে পুরানো জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে আপসকামী প্রবণতা তীব্র হয়ে ওঠে।

ত্রিশ দশকে প্যালেস্টাইন জনগণের সংগ্রাম বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামে পরিণত হয়। বৃটিশ সরকার বর্বরোচিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এর মোকাবিলা করে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে যে বিভিন্ন গ্রামকে ধ্বংস করার ও ঘিরে ফেলার চক্রান্তের ফলে নিহত ও আহত ব্যক্তিরা ছাড়াও ১,০০০ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে (পৃঃ ১৬৭)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইনের আরব জনগণ তাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের সংগ্রাম আবার শুরু করে। এই সময় আরব

কমিউনিস্ট সংগঠনগুলোর ঐক্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় মুক্তিলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে এই লীগ বিভিন্ন পার্টি ও সংগঠন নিয়ে গঠিত আরব ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করে। এই লীগ বৃটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য প্যালেস্টাইনের আরব-দের দেশপ্রেমিক আন্দোলন গড়ে তোলার কর্তব্য স্থির করে কিন্তু ফ্রন্ট দাবি করে যে রাষ্ট্র সংঘের নিরাপত্তা পরিষদের উচিত প্যালেস্টাইন সমস্যাটি বিবেচনা করা। লেখক বলেন যে যুদ্ধের শেষ দিকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্যালেস্টাইন সমস্যা সহ মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখাতে থাকে।

১৯৪৭ সালের ২৯শে নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় প্যালেস্টাইন প্রশ্নটি আলোচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এই সিদ্ধান্তে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশটাকে বিভক্ত করে আরব ও ইহুদীদের দুটো স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই পরিকল্পনার পক্ষে ভোট দেয়, কারণ এর ফলে আরব ও ইহুদী জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্প্রসারিত হত ও তাদের নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হত। রাষ্ট্রসংঘের এই সিদ্ধান্তকে প্রগতিশীল শক্তিগুলো ও জাতীয় মুক্তিলীগ সমর্থন করে। কিন্তু প্যালেস্টাইনের জাতীয় নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্ত বর্জন করে; এবং আরব লীগ-ভুক্ত দেশগুলোও এর বিরোধিতা করে। লেখক বলেন যে প্রতিক্রিয়াশীল আরব দেশগুলো উপনিবেশবাদীদের সায়ে চক্রান্ত করেছিল; উপনিবেশ-বাদীরা চেষ্টা করছিল যাতে প্যালেস্টাইনে আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং ইস্রায়েল ও জর্ডানের মধ্যে যে অংশটা বন্টন করা হয় সেই অংশটিকে ভাগ করতেও চেষ্টা করেছিল। ১৯৪৮ সালের ১৫ই মে যখন বৃটিশ শাসনের মেয়াদ শেষ হয়ে এল, তখন ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হল এবং ১৫ই মে-র রাত্রিতে প্রথম আরব-ইস্রায়েল সংঘর্ষ বেধে গেল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো, তাদের মিত্র উগ্র ইহুদীবাদী ও আরব প্রতিক্রিয়ার সহযোগিতায় এই সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়।

এর ফলাফল সবারই ভালোমতো জানা আছে। প্যালেস্টাইন জনগণের প্রতিরোধ, ধর্মঘট ও প্রতিবাদ বিক্ষোভ হওয়া সত্ত্বেও জর্ডান নদীর* পশ্চিম তীরকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। প্যালেস্টাইনকে রাজ্যের যে অংশটি বন্টন করা হয় ইস্রায়েল সেই অংশটিও দখল করে নেয়। লেখক এই ঘটনার

* ১৯৬৭ সালের জুন মাসে ছয় দিন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল এই রাজ্যটিকে দখল করে—সম্পাদক।

ওপর জোর দিয়েছেন যে "ইস্রায়েলের শাসকেরা ন্যায়ের ভিত্তিতে প্যালেস্টাইন সমস্যা ও আরব-ইস্রায়েল সংঘর্ষের সমাধান করার প্রতিটি সম্ভাবনার পথ বন্ধ করে দেয়…। ইস্রায়েলের সরকার যদি এই অঞ্চল ভাগ করার সময় যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরবদের মধ্যে বণ্টিত অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে দিতে স্বীকৃত হয়, তাহলে আরব দেশগুলো ইস্রায়েলকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিতে রাজী আছে, এই মর্মে আরব দেশগুলো যে প্রস্তাব দেয় তারা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে (পৃঃ ১০৮)।

ইস্রায়েলের আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী নীতির ফলে প্যালেস্টাইনের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় ও তাদের নিজেদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এই সব সংগঠন পরে প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার ভিত্তি রচনা করে। ১৯৬৪ সালে জেরুজালেমে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্যালেস্টাইন কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে পি এল ও হবে প্যালেস্টাইন জনগণের প্রতিনিধি।

লেখক সমগ্র প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের জঙ্গী সংগ্রামের মান উন্নত করার ও ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থন অর্জন করার ক্ষেত্রে পি এল ও-র প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করেছেন, এবং যে সব স্তরের মধ্য দিয়ে এই সংগঠনের বিকাশ ঘটেছে সেই সব স্তর বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে এর অবস্থান ও নীতির সাফল্য ও ত্রুটির দিকগুলো লক্ষ্য করেছেন। ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে রাবাতে অনুষ্ঠিত আরব শীর্ষ সম্মেলনে পি. এল.-ও-কে প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের একমাত্র ন্যায়সম্মত প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করা এবং রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ পরিষদের ঊনত্রিশতম সভায় পি. এল. ও-কে দর্শকের মর্যাদা দেওয়া সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করার ঘটনা এই ন্যায়-সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এই সব সিদ্ধান্ত পুনর্ঘোষণা করে যে "মধ্য প্রাচ্যের সংকটের মূলে রয়েছে প্যালেস্টাইনের সমস্যা। এই সমস্যা হচ্ছে আরব-ইস্রায়েলের সংঘাতের মূল সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধান না হলে এই সংকটেরও কোনো সমাধান হবে না (পৃঃ ২৭৭)।

লেখক প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের ন্যায়সংগত অধিকারের জন্য পি এল-ও-র সংগ্রামের এক পটভূমিকা তুলে ধরেন এবং পি. এল ও ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ, উগ্র ইহুদীবাদ ও আরব প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বহু তথ্যের উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে লেখক প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য পি. এল. ও-র তৎপরতার ওপর জোর দেন। জর্ডানের পশ্চিম

তীর, গাজা অঞ্চল ও জেরুজালেমের যে অংশ আরব অধ্যুষিত সেই অংশ এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে, এবং এই রাষ্ট্র ইস্রায়েল রাষ্ট্রের পাশে থাকবে।

ডঃ তোমা আশাবাদ নিয়ে তার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন: "প্যালেস্টাইন আরবদের জাতীয় আন্দোলনের ষাট বছর, এর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, ১৯৩৬-এর বিপ্লবের সময় প্যালেস্টাইন পাহাড় পর্বতেই হোক, বা লেবাননে টেল জাটার-এর সংকীর্ণ রাস্তায় হোক—সর্বত্র যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে, সেই সংগ্রাম প্যালেস্টাইনের জনগণকে এক কঠিন ইস্পাতে পরিণত করেছে, যা দৃঢ়তা দেখাতে ও এর জঙ্গী সংগঠিত অগ্রণী বাহিনীকে সুরক্ষিত করতে ও বিজয় নিরাপদ করতে সক্ষম" (পৃঃ ২৮২)।

জাহি কারকাবি

পশ্চিম জার্মান বহুজাতিক সংস্থা

পুঁজিবাদী বহুজাতিক সংস্থা সম্পর্কে আমাদের প্রবন্ধগুচ্ছ প্রকাশ করছি (ডব্লু এম আর-এর ১৯৭৮ সালের আগস্ট ও ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যা দেখুন)।

বিশ্বের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে এফ আর জি-র বহুজাতিক সংস্থাগুলোর পাল্লা ক্রমেই ভারি হচ্ছে। উৎপাদন ও পুঁজির অবিরাম কেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৭ সালে সরকারিভাবে রেজিস্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের মিশ্রণ ৫৫৪তে দাঁড়ায়। ১৯৭৮ সালের প্রথমার্ধে আরও ২১৩টি শিল্পের একীকরণ রেজিস্ট্রীকৃত হয়। এফ আর জি-র শাসক কোয়ালিশনের শরিক সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃত্ব, শিল্প ও ব্যাংকের কেন্দ্রীভবন, ফিনান্স-পুঁজি রপ্তানি ও পশ্চিম জার্মান বহুজাতিক সংস্থাগুলোর আন্তর্জাতিক কাজকর্ম বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট করেছে। এই সংস্থাগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। এই ধরনের কোম্পানীর সংখ্যার দিক থেকে ব্রিটেন, ইটালী ও ফ্রান্সকে পিছনে ফেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই এফ আর জি দ্বিতীয় স্থানে।

দেশের কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে পশ্চিম জার্মান বহুজাতিক সংস্থাগুলো সামনের সারিতে আছে। তাদের হাতে রয়েছে প্রচুর সম্পদ এবং কয়েকজনের (৫০ শতাংশের) বৈদেশিক লেনদেন মার্কিনী সংস্থাগুলোর কাছাকাছি।

(৯৬ পৃষ্ঠায় সারণি দ্রষ্টব্য)

বিশেষত্বটা এইখানে যে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে যুক্ত শিল্পগুলোর সাথেই বহুজাতিক-সংস্থাগুলো মূলতঃ যুক্ত। এফ আর জি-র এই শিল্পগুলো রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী ইস্পাত, ইলেকট্রনিকস, ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে, প্রত্যেকেরই সংশ্লিষ্ট একচেটিয়া গোষ্ঠীর বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য আছে। রাসায়নিক শিল্পে বি.এ.এস.এফ, হেক্সট ও বায়ার হচ্ছে তিনটি বড় কোম্পানী একসময়ে একচেটিয়া আই.জি ফারবেন-এর ভিত্তিতে এই তিনটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। পুঁজিবাদী দুনিয়ার রাসায়নিক শিল্পে

এফ আর জির মার্কসবাদী গবেষণা কেন্দ্রের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত।

একচেটিয়াপতিদের মধ্যে এরা যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়। সত্তরের দশকের প্রথমদিকে হেক্‌সটের ৩০০ টি কোম্পানী ও কারখানা ছিল, বি এ এস এফের ১১৯টি কারখানা ছিল এবং বায়ারের ৩০০টি প্রতিষ্ঠান এফ আর জি ও অন্যত্র আছে।

থিসেন, হেশ্‌, ক্রুপ ও সালৎসগিটার—এই চারজন একচেটিয়াপতি শতকরা ৯০ ভাগ ইস্পাত উৎপাদন করে (দশ বছর আগে শতকরা ৫০ ভাগ করত)।

১৯৭৭ সালের ১০টি বড় পশ্চিম জার্মান বহুজাতিক সংস্থা

কর্পোরেশন	শিল্প	মোট লেনদেন ('০০০ মি. মার্ক)	বৈদেশিক লেনদেন (%)	শ্রমিক সংখ্যা (হাজার)	বিদেশে নিযুক্ত কর্মচারী (শতকরা)
সিমেন্স	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও ইলেকট্রনিকস	২৫'২	৫১'০	৩১৯'০	৩১'০
ডাইমলার বেন্‌ৎস	মোটর গাড়ী	২৪'৭	৫৪'৪	১৬৯'২	১৮'০
ফল্‌কস্‌ ভাগেন	মোটর গাড়ী	২৪'২	৫৯'৯	১৯১'৯	৩১'০
হেক্‌স্‌ট্‌	রাসায়নিক, ঔষধপত্র	২৩'৩	৬৬'৯	১৮০'৯	৪৪'০
বি এ এস এফ	রাসায়নিক, পেট্রোলিয়াম	২২'৩	৫০'২	১১৩'৮	২২'০
বায়ার	রাসায়নিক, ঔষধপত্র	২১'৪	৬৮'১	১৭০'৪	৩২'০
থিসেন	ইস্পাত	২১'০	৩৭'৬	১৩৪'৩	—
এ ই জি টেলিফুংকেন	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	১৪'৩	৪৯'০	১৫৮'৪	১৯'০
গুট্‌স্‌হফ নুৎস্‌হুটে	ইঞ্জিনিয়ারিং, অলৌহধাতু	১২'১	৩৯'০*	৮৪'২	—
মানেস্‌মান	ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং	১১'৭	২৩'০	১০৫'৬	২৪'০

* ১৯৭৫

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায় অর্দ্ধেক হচ্ছে সিমেন্স্, এ ই জি টেলিফুংকেন, বশ্ ও আই বি এম ডয়েশ্লাণ্ডের দ্বারা। থিসেন, মানেস্মান, ক্রুপ সিমেন্স্ হেক্স্ট্, বি এ এস এফ, বায়ার এবং এ ই জি টেলিফুংকেন সহ পৃথিবীর বড় বড় বহুজাতিক সংস্থাগুলো সামরিক উৎপাদনও নিযুক্ত। যুদ্ধের আগে এই কর্পোরেশনগুলো হিটলার ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা গড়ার কাজে সক্রিয় ছিল, এবং বর্তমানে তারা এফ আর জি ও ন্যাটোভুক্ত অন্যান্য দেশের অস্ত্র-শস্ত্র ও সামরিক যন্ত্রপাতির প্রধান সরবরাহকারী।

সংকট সত্ত্বেও পশ্চিম জার্মাণীর একচেটিয়াপতিরা বিশাল মুনাফা অর্জন করছে আর সংকটের বোঝা শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপছে। ফলস্বরূপ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেকারত্ব অভূতপূর্ব হারে বেড়েছে এবং একচেটিয়াপতিদের চাপে দাম বেড়েছে। ভল্ক্স্ভাগেনের বিষয় থেকেই এটা পরিষ্কার। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে তারা ৩৬,০০০ শ্রমিককে বরখাস্ত করে এবং মোটর গাড়ীর দাম ৩০% বাড়িয়েছে (১৯৭৩ সাল থেকে কমপক্ষে সাতবার দাম বাড়িয়েছে) অন্যান্য কোম্পানীর অবস্থাও একই।

এফ আর জি-র বড় বড় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর লেনদেন ও নিয়োগ (১৯৭৩-৭৭)

	লেনদেন বৃদ্ধি (শতকরা)	শ্রমিকসংখ্যার বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (−)* (শতকরা)
ফল্ক্স্ভাগেন	৫০.৩	—২২.৮
ডাইমলার বেন্ৎস	৪৮.৪	—০.১৬
হেক্স্ট্	৪০.১	—০.৫
ক্লকনার	৩৩.৭	—১৫.৪
সিমেন্স্	২৯.২	—৬.৩
সাল্ৎস্গীটার	২২.৫	—৪ ০
ক্রুপ	২২.০	—৩.০
এ ই জি টেলিফুংকেন	১৬ ৫	—১২.০
হেংকেল	১৩.৩	—৬.৪
গুটেহফনুংস্হুটে	১১.০	—৫.০
ফেবা	১১৭.০	+১১.৪
বাস্ফ্	৪৪.৬	+২.৩

* বৈদেশিক সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বাদ দেওয়া হয়েছে।

১৯৭৪-৭৫ সালের সংকটের সময়ে বেশিরভাগ একচেটিয়াপতিরা হাজার হাজার কর্মচারী ছাঁটাই করে। অবস্থা পরিবর্তনের পর কোনো কোনো কোম্পানী বেকারদের কাজে নিল এবং ক্রমবর্ধমান শোষণের মাধ্যমে আগের চেয়ে অনেক বেশি মুনাফা অর্জন করল। বাস্‌ফ্‌ ২·৩% অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ করে ৫০% লেনদেন বাড়ালো এবং ফেবা তা বাড়ালো যথাক্রমে ১১·৪% ও ১০০%।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পশ্চিম জার্মান বহুজাতিক সংস্থার শাখাগুলো আরও নৃশংসভাবে শ্রমিকদের শোষণ করে। এ ই জি টেলিফুংকেনের বিদেশী শাখাগুলোয় কোম্পানীর মোট কর্মচারীর ১৯% কে নিয়োগ করে, কিন্তু সেখান থেকে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ আসে। ক্রুপ্‌ ১০% এরও কম শ্রমিক বিদেশে নিয়োগ করে, কিন্তু সেখান থেকে ৪৪% আসে।

ষাটের দশকের শেষদিক থেকে পশ্চিম জার্মান বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বাইরে প্রসার দ্রুত ঘটেছে। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে তাদের বিনিয়োগ আগের ২০ বছরের সমান। যেহেতু তারা তাদের বিদেশী প্রতিযোগীদের চেয়ে বিশেষভাবে পিছিয়ে আছে (তাদের মোট রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশ তাদের শাখাগুলোর লেনদেন; যেখানে মার্কিনী কোম্পানীর শাখাগুলোর লেনদেন চারগুণ); সেহেতু পশ্চিম জার্মান বহুজাতিক সংস্থাগুলো এটা পূরণের আপ্রাণ চেষ্টা করছে। গত দশ বছরে তারা তাদের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রায় পাঁচগুণ বাড়িয়েছে। এই সূচকের বৃদ্ধি হারে এফ. আর. জি. পুঁজিবাদী দেশগুলোর চেয়ে এগিয়ে আছে।

ই ই সি-র দেশগুলো বর্তমানে এই বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র। পশ্চিম জার্মান শিল্প কোম্পানী ও বড় বড় ব্যাংকগুলোর ক্ষমতা তাদের নয়জনের মধ্যে প্রাধান্যকারী অবস্থানে রেখেছে। পুরোনো দুনিয়ায় তার প্রভাব বাড়ানো ও বাইরের শক্তিশালী প্রতিযোগীদের ওপর নিজের অবস্থান শক্তিশালী করার আশায় সংহতিকে জোরদার করার জন্য পশ্চিম জার্মান পুঁজি অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে।

পশ্চিম জার্মানীর বহুজাতিক সংস্থাগুলো মার্কিনী বাজারে উত্তরোত্তর প্রবেশ করছে। ৩০০ এরও বেশী পশ্চিম জার্মান কোম্পানীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক বা একাধিক শাখা আছে। তাদের মধ্যে প্রথম হল বাস্‌ফ্‌ বায়ার ও হেক্‌স্‌ট্‌ রাসায়নিক কোম্পানী। বিগত দশ বছরে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কারখানা নির্মাণের জন্য ৩৫০০ মিলিয়ন মার্ক খরচ করেছে। ফল্‌ক্‌স্‌ভাগেন,

থিসেন ও সীমেন্‌স্‌ও ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে। সীমেন্‌স্‌ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০০০০ কর্মচারী সমন্বিত ১০টি কোম্পানী, ১৮টি কারখানা ও ৬০০ মিলিয়ন ডলারের ওপর লেনদেন করে।

পশ্চিম জার্মান পুঁজির একটি ভালো অংশ কাঁচামালে সমৃদ্ধ ও একচেটিয়া-পুঁজি প্রসারের উপযোগী শাসনব্যবস্থা সম্বলিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রপ্তানি করা হচ্ছে। পশ্চিম জার্মান বহুজাতিক সংস্থাগুলোর প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের প্রায় একতৃতীয়াংশ এই সব দেশগুলোতে যায়। যে-সব দেশ শিল্পায়নে নিযুক্ত এবং সেইহেতু অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন সে-সব দেশকেই আগে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিম জার্মানীর বহুজাতিক সংস্থাগুলো ব্রাজিলে তাদের প্রসার ঘটাচ্ছে। ব্রাজিল লোহা, ম্যাঙ্গানীজ, টিন, দুষ্প্রাপ্য ধাতু ও নিকেল ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ একটি পুঁজিবাদী দেশ। সেখানে তাদের বিনিয়োগ ৪০০০ মিলিয়ন মার্ক। সবকটি পশ্চিম জার্মান একচেটিয়াপতিই ব্রাজিলে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে। ফল্‌ক্‌স্‌ভাগেন ও ডাইম্‌লার-বেন্‌ৎসের শাখাগুলো ঐ দেশে পশ্চিম জার্মান শিল্পের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। এই দুটো কোম্পানী কারখানা নির্মাণের জন্য ২৫০০ মিলিয়ন মার্ক খরচ করেছে। ১৯৭৭ সালে ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বাজারে ফল্‌ক্‌স্‌-ভাগেনের কারখানা থেকে ৫ লক্ষেরও বেশি মোটর গাড়ী সরবরাহ করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পশ্চিম জার্মান কোম্পানীগুলো নয়া উপনিবেশবাদী নীতি চালাচ্ছে এবং বর্ণবৈষম্যবাদী শাসকদের সাথে খোলাখুলি গাঁটছড়া বেঁধেছে, যারা তাদের প্রসারে ও আরও মুনাফা অর্জনে সাহায্য করছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ফল্‌ক্‌স্‌ভাগেন, বি এম ডব্লু ও সাল্‌ৎস্‌গীটার কাজ করছে। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার কোম্পানীগুলোতে পশ্চিম জার্মানীর অপ্রকাশ্য শেয়ার আছে—এই বহুজাতিক সংস্থাগুলো ঐ সব কোম্পানীর মাধ্যমে গোপনে লুক্সেমবুর্গ, লিস্টেনস্টাইন বা পানামায় তাদের শেয়ারপুঁজি পাঠাচ্ছে।

সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, পশ্চিম জার্মানীর শিল্পপতিরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ২৫০০ মিলিয়ন মার্ক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিজ্ঞ রাজনীতিকরা এই বিনিয়োগের পরিমাণ ১২০০০ মিলিয়ন মার্ক হিসেব করেছেন।

পশ্চিম জার্মান বহুজাতিক সংস্থাগুলোর কাজকর্ম এফ. আর. জি. ও পুঁজিবাদী দুনিয়ায় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের মৌল দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করছে।

বিষ্ণু দে'র ৭০তম বয়ঃক্রম জয়ন্তী

বাঙ্গালী কবি-পুরোধা বিষ্ণু দে গত ১৭ জুলাই সত্তর পূর্ণ করে একাত্তরে পড়েছেন। ১৯০৯ সালে তাঁর জন্ম হয়েছিল কলকাতায়। ২২ বছর বয়সে, ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরে গত প্রায় অর্ধশতক ধরে তিনি পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। কখনও সম্পাদকমণ্ডলীতে, কখনও পরিচালকমণ্ডলীতে, কখনও-বা শুভানুধ্যায়ী হিসেবে। পরিচয়ে তিনি লিখেছেন বহু কবিতা, নিবন্ধ, মন্তব্য। সেই পরিচয় পত্রিকার ৪৮ বর্ষের ১০-১২ সংখ্যাটি (মে—জুলাই ১৯৭৯) 'বিষ্ণু দে'র সপ্ততিবর্ষ পূর্তি সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হয়েছে। পরিচয় পত্রিকার এই সংখ্যাটির বিষয়বস্তু বিষ্ণু দের ব্যক্তিত্ব, তাঁর কাব্য প্রতিভা, তাঁর রচনাপঞ্জী এবং তাঁর কবিতা সম্বন্ধে গত ৫০ বছরে বিশিষ্ট কবি ও নিরীক্ষাকারদের বক্তব্য। সাথী, বন্ধু ও সতীর্থদের এই ভালবাসার অর্ঘ্য পরিচয় পত্রিকার পক্ষে যথোপযোগী হয়েছে। আমরা বিষ্ণু দে'র এই জয়ন্তীতে যোগ দিয়ে তাঁর প্রতি শান্তি স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী সকল সংগ্রামীর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমরা তাঁকে অনেক অনেক বছর আমাদের মধ্যে চাই। বিষ্ণু দে যেমন আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম নির্মাতা, তেমনি আমাদের উপমহাদেশের প্রগতি সাহিত্যেরও অন্যতম ধারক বাহক। ১৯৪২ সালে ফ্যাসিবিরোধী শিল্পীসাহিত্যিক সংঘ গঠিত হলে তিনি তাঁর সম্পাদক নিযুক্ত হন। হিটলারের নাৎসী বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নকে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন আক্রমণ করেছিল। শিল্পীসাহিত্যিকদের প্রতিরোধে যোগ দেবার ডাক দিয়ে তিনি ২২শে জুন নাম দিয়ে কবিতা-পুস্তিকা লেখেন। চল্লিশের দশকে দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের এবং স্বাধীনতার জন্যে গণ-অভ্যুত্থানের ডাক রয়েছে তাঁর 'সাতভাই চম্পা' এবং 'সন্দ্বীপের চর' কাব্য-গ্রন্থদ্বয়ে। তিরিশের দশকের শেষের দিকেই অবশ্য তিনি বিশুদ্ধ আধুনিক রীতি থেকে বৈপ্লবিক আধুনিক রীতিতে তাঁর কবিতার ধারাকে প্রসারিত করেছিলেন। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থে সেইসব কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

তিরিশের দশকে বিষ্ণু দে বাংলা কাব্যে টি এস এলিয়টের রীতির প্রয়োগ করেছিলেন আধুনিকতার উৎকর্ষ হিসেবে। তিনি বাংলায় 'টি এস এলিয়ট' অনুবাদ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের স্নাতক বিষ্ণু দে শেকস্‌পীয়র থেকে শুরু করে অডেন পর্যন্ত যুগন্ধরদের নিয়ে কাজ করেছেন বাংলায়।

চল্লিশের দশকে আধুনিক রীতিকার, ফ্যাসিবিরোধী ফ্রান্সের মুক্তি যুদ্ধের কবি এলুয়ার ও আরাগঁকে বিষ্ণু দে বাংলা কাব্যের সত্তায় শরিক করে নেন। মূল ফরাসী থেকে তিনি বাংলায় আরাগঁ ও এলুয়ারের অনুবাদ করেছেন। বিশেষ করে এলুয়ারের সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের পরিচয় করিয়ে দেবার পথিকৃৎ বিষ্ণু দে। তিনি হাইনে ও নেরুদার কবিতার সঙ্গে বাংলা কাব্যের রাখি বাঁধবার কাজেও অগ্রণী। পঞ্চাশের দশকে বিষ্ণু দে বার্টোল্ড ব্রেখ্‌ট্‌, বদলেয়ার, ওয়াল্টহুইটম্যান, মালার্মে ও এরেনবুর্গের কবিতার বাংলা অনুবাদ করেন। এই পঞ্চাশের দশকেই বিষ্ণু দে মাও সেতুং'এর কবিতারও অনুবাদ করেন।

বিষ্ণু দে 'সাত ভাই চম্পা' এবং 'সন্দ্বীপের চর' কাব্য-গ্রন্থদ্বয়ের কবিতার মাধ্যমে যখন পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার চাষী ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন "মৌভোগ"এর মতো উদাত্ত বিদ্রোহী কৃষক-স্তোত্র লিখে, প্রায় তখনই আদিবাসী সাঁওতালদের জীবন-সঙ্গীত ছড়িয়েছেন বাংলায় তর্জমা করে তাঁর 'ছত্তিশগড়ী গান' গ্রন্থের মারফত। দুই বাংলা ও বিহারের মানুষের মর্মকথা জানা আছে তাঁর। তিনি তাঁর কাব্যে জানিয়েছেন এদের কথা।

সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশৎ-বার্ষিকী উপলক্ষে মণীষা কর্তৃক প্রকাশিত 'রুশতী পঞ্চাশতী' কাব্য-সংকলন গ্রন্থে মুখবন্ধ লিখে আনন্দ প্রকাশ করেন বিষ্ণু দে। এই গ্রন্থে বিষ্ণু দের 'জল দাও' আংশিক এবং মৌভোগ ('লাল নিশান' নাম দিয়ে) অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন তাঁকে আচার্য বলে স্বীকার করে।

বিষ্ণু দে ধ্রুপদী, আধুনিক ও অতি আধুনিক আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বিশাল সমুদ্র-সৈকতে স্বচ্ছন্দচারী। তিনি বহু ভাষাবিদ। বহুত্বের মধ্য দিয়েই প্রগতির যে ধারা মানবসমাজের মুক্তির সংগ্রামে উদ্দীপিত ও নির্দেশিত, সেই পথের তিনি যাত্রী। তাড়া নেই, তাঁর পদক্ষেপ শান্ত।

ভারতের কোণারক থেকে শুরু করে উপনিষদ ও ঋগ্‌বেদ তাঁর জীবন-

দর্শনে সৌন্দর্য ও বিশ্বদর্শনের একটা মহাকালের ব্যাপ্তি দিয়েছে। তাঁর "স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ" কাব্যগ্রন্থ এর স্মারক। তিনি 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার পেয়েছেন। এ তার দেশপ্রেমের প্রতি স্বীকৃতি। বিষ্ণু দে'র চিন্তা ও কাজের ব্যাপ্তির এটাও একটা দিক।

যে পূর্ববাংলা বাংলাদেশ হয়েছে তার অভ্যুত্থানকে বিষ্ণু দে একান্ত আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রগতিবাদী লেখকলেখিকারা বিষ্ণু দেকে গুরু এবং বন্ধু বলে মনে করেন। বাংলাদেশের বাংলা কাব্যচর্চায় বিষ্ণু দে আবশ্যিক।

বিষ্ণু দে এইভাবে শুধু যে বাণীর সাধনা করেছেন তা নয়। তিনি যামিনী রায়ের আঁকা ছবিকে স্বদেশ ও বিশ্ববাসীর সামনে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন এলুয়ার পিকাসোর ছবির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে একটা সংযোগসূত্র উল্লেখযোগ্য। পিকাসো সম্বন্ধে এলুয়ারের লেখাটি বিষ্ণু দে বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিষ্ণু দের স্নেহের পাত্র। দীপেনের মৃত্যুর পর বিষ্ণু দের লেখাটি আমাদের সামনে রয়েছে প্রগতির আদর্শের প্রতি তাঁর গভীর সংযোগ হিসেবে।

'পরিচয়' পত্রিকার বিষ্ণু দে জয়ন্তী সংখ্যায় বিশেষ করে অরুণ সেন যে 'রচনাপঞ্জী' তৈরী করে দিয়েছেন, প্রধানত তার থেকে উপাদান নিয়ে আমরা বিষ্ণু দেকে, তাঁর চিন্তা এবং কাজকে সর্বসমক্ষে রাখছি।

পরিচয় পত্রিকার এই সংখ্যাটির জন্যে সম্পাদক থেকে শুরু করে অন্যান্য যে সমস্ত কর্মী খেটেছেন, তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ।

আমাদের আশা, দুই বাংলার পাঠকপাঠিকারা পরিচয়ের এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করবেন।

রণেশ দাশগুপ্ত

Vol. 7, No. 8 SANTI SWADHINATA Reg
August, 1979 SAMAJTANTRA WB/

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র পত্রিকার নিয়মাবলী

MENDED-2008

10 SEP 19

গ্রাহক সংক্রান্ত

প্রতি সংখ্যা এক টাকা।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : দশ টাকা।
বছরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া
ডাক খরচ আমাদের।

এজেন্সি সংক্রান্ত

৫ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া সম্ভব নয়।
কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা।
পত্রিকা ভি. পি-তে পাঠানো হয়।
ডাক খরচ আমাদের।

যোগাযোগ করুন :

ক
শান্তি স্বাধীনতা সমা
৪/৩এ, ওয়ারে
কলকাত
ফোন : ৪৪-